ইতিহাসে দেগঙ্গা

দিলীপ কুমার মৈত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ—
মে, ১৯৮৮

মুদ্রক ঃ—
দত্ত প্রিণ্টার্স, হৃদয়পুর, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগণা

ব্লক নির্মাণ ঃ—
দেবব্রত দাশগুপ্ত

ব্লক মুদ্রণ ঃ—
সাধনা প্রেস, ৭৬ বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ—
বাবুয়া ঘোষ, নিউ ব্যারাকপুর

প্রাপ্তিস্থান ঃ—
সুবর্ণরেখা
৭৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯
ফার্মা কে. এল. এম
২৫৭/বি, বি. বি. গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
দে বুক ষ্টোর
২৯, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
ও অন্যান্য দোকানে

প্রকাশিকা ও সত্ত্ব ঃ—
শিবানী মৈত্রে
গ্রাম ও পোঃ—দেবালয়, বেড়াচাঁপা, উত্তর ২৪ পরগণা

সূচীপত্র

প্রসঙ্গ ঃ ইতিহাসে দেগঙ্গা

সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে কিছু কিছু নতুন প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ঐতিহাসিক তথ্য সন্ধানের অভিযান আজ মূল কান্ড থেকে ব্যাপ্তি লাভ করেছে শাখা প্রশাখায়। এটি দৃষ্টি সঙ্কোচনের নির্দেশক নয়, বরং এর মধ্যে পাওয়া যায় দৃষ্টি সম্প্রসারণের ইঙ্গিত।

বনস্পতির বিরাটত্ব অবশ্যই অনুভবযোগ্য; অনুভূতির স্তর থেকে বিরাটত্বকে সাক্ষ্য প্রমাণের সাহায্যে যুক্তি তর্ক অবতারণা করে ইতিহাসের দরবারে হাজির করানোর প্রচেষ্টা যেমন অভিনন্দনযোগ্য, তেমনি সেই বনস্পতির অবয়বের বিভিন্ন অংশ শাখা, প্রশাখা, ফল, পাতার উপর যখন নিক্ষিপ্ত হয় ঐতিহাসিকের রহস্য সন্ধানী দৃষ্টি, আর সেই দৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত হয় অজানা অথচ প্রাসঙ্গিক বহু তথ্য তখন আবিষ্কৃত এই অপেক্ষাকৃত সীমিত ক্ষেত্রের গুরুত্বকে কোনো মতেই অস্বীকার করা যায় না।

বিশ্বের ইতিহাস, মানব জাতির ইতিহাস, কোনো একটি দেশের সামগ্রিক ইতিহাস অবশ্যই নিত্যকাল ইতিহাস চর্চার উপজীব্য হয়ে থাকবে। কিন্তু সেই প্রসঙ্গে আঞ্চলিক জনপদ ও জনপদবাসীর ইতিহাসের দাবীও অপ্রতিরোধ্য হয়ে থাকবে। নানা কারণে অঞ্চল বিশেষের ইতিহাস চর্চায় আমরা অন্যান্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর ছিলাম। সম্প্রতি অঞ্চল ভিত্তিক ইতিহাস গ্রন্থ যে পরিমানে রচিত হচ্ছে তা দেখে মনে হয় অনগ্রসতার অভিযোগ আমরা অচিরেই কাটিয়ে উঠতে পারবো।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ধরে বিদেশী লেখকেরা প্রাধান্য ভোগ করে এসেছেন। তাদের কাছে আমাদের ঋণ অনেকখানি। বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে তাদের কেউ কেউ নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ। কিন্তু তাদের গুরুত্ব কিছুমাত্র ক্ষুন্ন না করেও একথা বলা যেতে পারে ইতিহাসের সব উপকরণ তাদের অধিগত হয়নি; হওয়া সম্ভবও ছিল না। আঞ্চলিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে District Gazetter এর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। বহু বিষয়ে এদের প্রামন্যতা আমরা স্বীকার করি। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মেনে নিতে বাধা নেই যে গেজেটিয়ারের লেখক বা সন্ধান করা একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল এবং অঞ্চলবাসীদের

জীবনযাত্রা সম্পর্কিত সকল জিজ্ঞাসার অবসান তারা ঘটাননি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা নির্ভর করেছেন সরকারী অথবা আধা সরকারী সূত্রে পাওয়া উপকরণের ওপর স্থানীয় জনশ্রুতি, কিংবদন্তী লোকগাথা একম কি বেসরকারী দলিলপত্র, পুঁথি ইত্যাদির সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ট পরিচয় গড়ে ওঠেনি। গড়ে ওঠার অবকাশও তেমন ছিল না। দেশবাসীও ছিলেন সাধারণভাবে অনুৎসাহী।

এ ছাড়া আর ও একটি আসল কারণ গত চল্লিশ, পঞ্চাশ বছর ধরে নতুন পুরাতাত্ত্বিক তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যার সন্ধান তারা পাননি। হাল আমলেরত থ্যানুসন্ধানীরা এদের তুলনায় ভাগ্যবান। তারা শুধু নতুন তথ্যের সন্ধানই পাননি তাদের মধ্যে অনেকেই আলোচ্য জনপদের বাসিন্দা। এখানকার জনপদবাসীদের সঙ্গে তাদের নাড়ির সম্পর্ক। এঁরা একটি বিশেষ অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে এর লোকাচার এবং লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আহরণ করেছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। এদের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তই নির্ভুল অথবা সবকটি বক্তব্য বিনা দ্বিধায় সকলে মেনে নেবেন এটা প্রত্যাশা করি না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা বিশেষ অঞ্চলের যে পরিচয় উদ্‌ঘাটন করেছেন তার ফলে আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার দৈন্য থেকে আমরা পরিত্রাণ লাভ করতে চলেছি এটা খুব সহজেই ধরে নিতে পারি।

শ্রী দিলীপ কুমার মৈতে বেড়াচাঁপার অধিবাসী। চন্দ্রকেতুগড়ের মহা মূল্যবান প্রত্ন-দ্রব্য সংগ্রহ করে শ্রী মৈতে গ্রামে গড়ে তুলেছে চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা। চন্দ্রকেতুগড় নিয়ে কিছুদিন আগে তার লেখা বই সযত্নে পড়েছি। এবার তিনি তুলে ধরেছেন দেগঙ্গার আঞ্চলিক ইতিহাস—ভৌগলিক পরিচয়, ঐতিহাসিক পটভূমি, যোগাযোগ, পুঁথিপত্রের উপাদান, লৌকিক দেব-দেবী, দরবেশ, আউলিয়া, নানা লোকশ্রুতি, এই অঞ্চলের কৃতী পুরুষ, সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিতজন, গ্রাম নামের কারণ—সব কিছুই ধরা পড়েছে ইতিহাসে দেগঙ্গায়। এর কোনো কোনো অংশ থেকে শুধুমাত্র চব্বিশ পরগণার নয় বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সূত্র সংগ্রহ হতে পারে। অঞ্চলভিত্তিক ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে।

সল্টলেক, কলকাতা
২১শে মে, '৮৮।

নিশীথরঞ্জন রায়

সবিনয় নিবেদন

একটা অভিযোগ মাঝে মধ্যে শোনা যায়, নিজস্ব এলাকার কোন ইতিহাস থাকলে রচনাকার উৎসাহবশতঃ সে সম্পর্কে একটু বেশি করেই বলেন। না, চিরাচরিত অভিযোগটি বর্তমান গ্রন্থ বা গ্রন্থকারের ক্ষেত্রে একেবারেই প্রযোজ্য নয়। প্রসঙ্গক্রমে একটা কথা প্রথমেই উল্লেখ করতে চাই—'ইতিহাসে দেগঙ্গা' গ্রন্হে লেখা ঘটনাগুলি দেগঙ্গারই কোনো না কোন গ্রামের কথা বা কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত। বেশি তো বলিইনি বরং আক্ষেপ রয়ে গেল, আরও কিছু বলার থাকলেও বিভিন্ন কারণে বলতে পারলাম না বলে, কারণ অতীতের এত কথা, এত কাহিনী এত কিংবদন্তী জড়িয়ে চব্বিশ পরগণাতে তো বটেই পশ্চিমবাংলাতেই বিরল গ্রাম গুচ্ছ আছে।

ইতিহাস-বাচস্পতি রমেশচন্দ্র মজুমদার একবার বলেছিলেন—আঞ্চলিক ইতিহাস লেখা না হলে সমগ্র বাঙলাদেশের ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গ রূপ দেওয়া সম্ভব নয়।

আমি ঘুরেছি আমার জন্মভূমির চারপাশের অঞ্চল, সংগ্রহ করেছি তার প্রাণের কথা, তার মনের কথা।

আর সে কথা তুলে ধরার আগে একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখি। লৌকিক দেবদেবী ও উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে সংক্ষেপে বলেছি তাদের উৎস বৃত্তান্ত। এ কথা ঠিক যাঁরা এসব নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের কাছে এগুলি প্রায় অপ্রয়োজনীয় এবং অযথা বাহুল্য বলে পরিগণিত হতে পারে। কিন্তু সাধারণ জন এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন জনেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ যাঁরা পুরুষানুক্রমে সেই লৌকিক দেবদেবীর বেদীমূলে পূজা নিবেদন করে আসছেন অথচ তাঁদের সুযোগ ঘটেনি সেই সকল দেবদেবীর উৎপত্তিগত বৃত্তান্ত জানার। সে কারণেই তুলে ধরেছি সেগুলির পশ্চাৎপট।

গ্রন্থের ভূমিকা লিখেছেন বহু সম্মানে ভূষিত প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায়। আমি ঋণী তাঁর কাছে, ঋণী ভাষাচার্য পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ সুকুমার সেন, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের রীডার সন্তোষ কুমার বসু, 'উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত' গ্রন্হ প্রণেতা একান্ত সুহৃদ কমল চৌধুরী,

ঐতিহাসিক ডঃ গৌরীশঙ্কর দে, অগ্রজ সত্যেন রায় প্রমুখ পণ্ডিতজনের জ্ঞানগর্ভ পরামর্শের জন্য।

আমি ভুলিনি তাঁদের কথা যাঁরা কয়েক মাস আগেই গ্রাহক মূল্য দিয়ে তালিকাভুক্ত হয়ে প্রকারান্তরে আমাকে উৎসাহিতই করেছেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই ; কৃতজ্ঞ কয়েকটি প্রাচীন পরিবারের কাছেও যাঁরা নানা সূত্র ও উপাদানের সন্ধান দিয়ে ইতিহাস রচনার কাজকে সুগম করেছেন।

গ্রন্থ রচনা কালে সর্বশ্রী হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, রাঘবভবন পাণিহাটি ; চঞ্চল পাল, সত্যদুলাল মন্ডল, বারীন বিশ্বাস, গোপাল দাস, ডঃ সমীর পাল, দুর্গা মুখার্জী, মহাদেব বিশ্বাস, দীনেন রায়, সুধীর মুখার্জী, সুনীতি দত্ত, প্রাণতোষ ঘোষ, শিবচন্দ্র রায়, অসীম কর্মকার, কাশীনাথ মিস্ত্রী, হিমাংশু গাইন, সন্তোষ কুমার মণ্ডল, আলোক চিত্রশিল্পীত্রয় রামচন্দ্র মাইতি, রূপশ্রী স্টুডিও; নীতিন বিশ্বাস, সমরেশ মৈতে, মাওলানা মহঃ ফজলুল অহিদ, ভাই পান্নালাল, অবলুপ্ত প্রায় লোকসংঙ্গীত সংগ্রাহক 'চন্ডীমন্ডপ'-এর অন্যতম পরিচালক শুভময় মণ্ডল, আমার পুত্র দীপন, বেড়াচাঁপাস্হিত 'সেন ইলেকট্রিক' এর তরুণ পরিচালক দিলীপ কুমার সেন ও পশ্চিমবাংলার ক্ষুদ্র শিল্প ক্ষেত্রে সপরিচিত চন্দনা ও নির্মল গেঞ্জী এবং হোসিয়ারী দ্রব্য প্রস্তুত কারক সংস্থা ধান্যকুড়িয়া কুটির শিল্পের কর্ণধার পরমভক্ত বিধুভূষণ মণ্ডল ও তৎ পুত্র নিতাইদাস মণ্ডল প্রমুখের সহযোগিতা ভোলবার নয়।

পন্ডিত পোলে পন্ডিত কবি লেখাটিতে "আমাকে ডেকো না কেহ" কবির চারটি লাইন কিশোর কালের স্মৃতি থেকে গ্রহণ করা। দু একটি শব্দ নিয়ে বিভ্রাট ঘটতে পারে। আর সব সময়েই যাঁরা ইতিহাসের ঘটনাগুলোকে ইতিহাসের পৃষ্ঠার সাথে মিলিয়ে নিয়ে পড়তে চান তাঁরাও অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে খুশি নাও হতে পারেন। ভুল ত্রুটি থাকলে সমালোচনার জন্য সমালোচনা না করে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁর প্রতি ঋণী থেকে ও পুস্তকে থাকা মুদ্রণ ত্রুটি গুলো চেষ্টা করবো পরবর্তী প্রকাশনে সংশোধন করার।

আমার প্রয়াস ও প্রচেষ্টার সাথে জড়িত—

সর্বশ্রী শ্যামাদাস ভট্টাচার্য,
গোবিন্দ পাল,
রীতা সেনগুপ্তা,
অলোক চ্যাটার্জী,
পরাগ রঞ্জন ঘোষ,
নরেন্দ্র নাথ মিত্র, লক্ষ্মী দা, (ঝিকরা)

এঁদের নিরবিচ্ছিন্ন উৎসাহ ও আন্তরিক সাহায্য না পেলে বঙ্গ সংস্কৃতির এই অন্বেষণ প্রকাশিত হতে আরো বিলম্ব ঘটতো, এঁরা প্রত্যেকেই আমার শুভাকাঙ্ক্ষী। এঁদের প্রতি জ্ঞাপন করলাম আমার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

পরিশেষে বলি যদিও সময়ের সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পর্যায়ে বিভিন্ন গ্রামগুলির সাথে জড়িত কিছু কিছু কথা হারিয়ে ফেলেছে তাদের নির্দিষ্ট পথ রেখা, আশ্রয় নিয়েছে লোককথার অন্তরালে, আর চলমান ছায়ার মত তারা আজ গতিশীল লোক সংস্কৃতির আঙিনায় কিম্বা উৎসবের আল্পনায়। ঠিক এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়েছে রবীন্দ্রভাষ্যে—

"দেশের লোক সংস্কৃতির মধ্যে অতীত যুগের সংস্কৃতির এমন সব নিদর্শনাদি সংগুপ্ত আছে যেগুলি আমাদের জাতীয় পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মূল্যবান উপকরণ হতে পারে। ঐ নিদর্শনগুলি গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংগ্রহ করা একান্ত প্রয়োজন।"

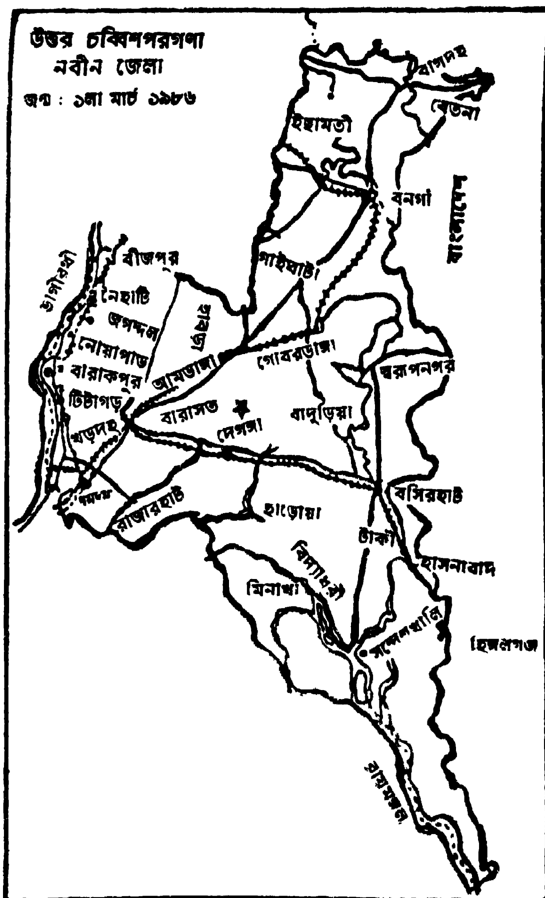
দেশ ও কালের সামগ্রিক ইতিহাস রচনার জন্য গ্রামের বা আঞ্চলিক ইতিহাসের অপরিহার্যতার কথা প্রত্যয়িত করলেন রবীন্দ্রনাথ। তাছাড়া একথা ভীষণভাবে সত্য বৃহত্তর ইতিহাস যদি আঞ্চলিক ইতিহাসের মাটিকে আশ্রয় না করে রচিত হয় তাহলে ইতিহাসের মূল ভিত্তিটাই বাদ চলে যায়। দেগঙ্গার পথে প্রান্তরে ছড়ানো বর্ণময় উপকরণ একত্রিত করে বাংলা ও বাঙালির কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। বাধিত ও কৃতার্থ হব যদি ভাল লাগে এই ব্যাপারে যাঁদের অনুসন্ধিৎসা প্রবল, তাঁদের কারও কারও।

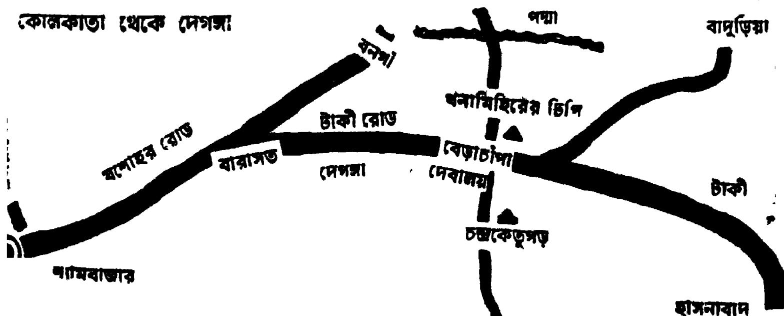
দিলীপ কুমার মৈত্তে

চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালা
গ্রাম ও ডাকঘর—দেবালয়
উত্তর চব্বিশ পরগণা
২৭শে মে '৮৮।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরী-সম
অতীত জীবন রেখা,
অস্ত রবির সোনার কিরণে
নূতন বরণে লেখা।
যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া
চাহে নি কখনো ফিরে,
নবীন আভায় দেখা দেয় তারা
স্মৃতি সাগরের তীরে।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর


উত্তর চব্বিশপরগণা
নবীন জেলা
জন্ম : ১লা মার্চ ১৯৮৬
বাগদহ
বেতনা
ইছামতী
বনগাঁ
বাংলাদেশ
বীজপুর
গাইঘাটা
ভাগীরথী
নৈহাটি
জগদ্দল
নোয়াপাড়া
ব্যারাকপুর
টিটাগড়
খড়দহ
রাজারহাট
আমডাঙ্গা
গোবরডাঙ্গা
স্বরূপনগর
বারাসত
বাদুড়িয়া
দেগঙ্গা
বসিরহাট
হাড়োয়া
টাকী
হাসনাবাদ
বিদ্যাধরী
মিনাখাঁ
সন্দেশখালি
হিঙ্গলগঞ্জ
রায়মঙ্গল


কোলকাতা থেকে দেগঙ্গা
বনগাঁ
পদ্মা
বাদুড়িয়া
খনামিহিরের ঢিপি
যশোহর রোড
টাকী রোড
বারাসত
বেড়াচাঁপা
দেগঙ্গা
দেবালয়
টাকী
চন্দ্রকেতুগড়
শ্যামবাজার
হাসনাবাদ

প্রচ্ছদ পরিচিতি

কাঠে তৈরী রথের গায়ে ভাস্কর্য। রথ সজ্জায় রয়েছে হাতির পিঠে টুপী মাথায় সাহেব, অশ্বোপরি সৈন্য, হাতে তার বর্শা ; সিংহের ওপর নারী—তারও হাতে বর্শা জাতীয় অস্ত্র ; দেখে মনে হয় যেন একটি চলন্ত মিছিল। কাঠটি বহন করছে দুশো বছর আগেকার বাংলার দারু শিল্পীদের শিল্প প্রতিভার পরিচয়। এটি সংগৃহীত হয়েছে গ্রাম কলসুর থেকে। কলসুরের অনুরূপ অনুপম অলঙ্করণে অলঙ্কৃত কাঠের ফলক রয়েছে গুরুসদয় মিউজিয়মে।

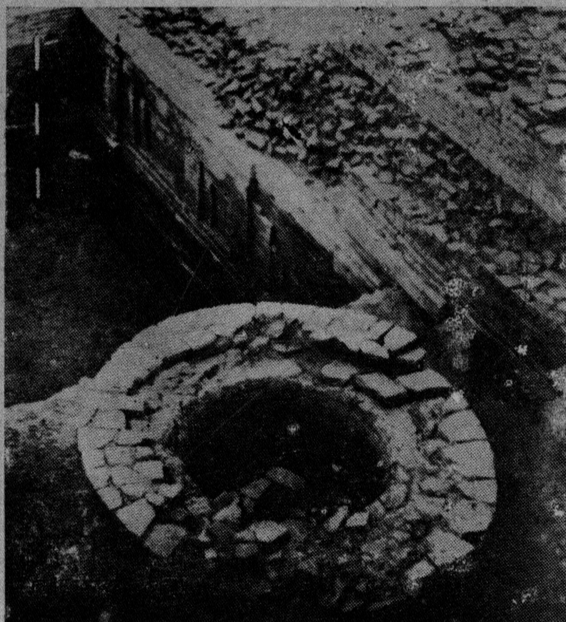
ও

দেগঙ্গার

স্মৃতিময় অতীতের মৌন নিদর্শন

চিত্র ১ : পদ্মা। আজ শুষ্ক ; একদা প্রবাহিতা হোত মহাকল্লোলে ; জীবনপুর

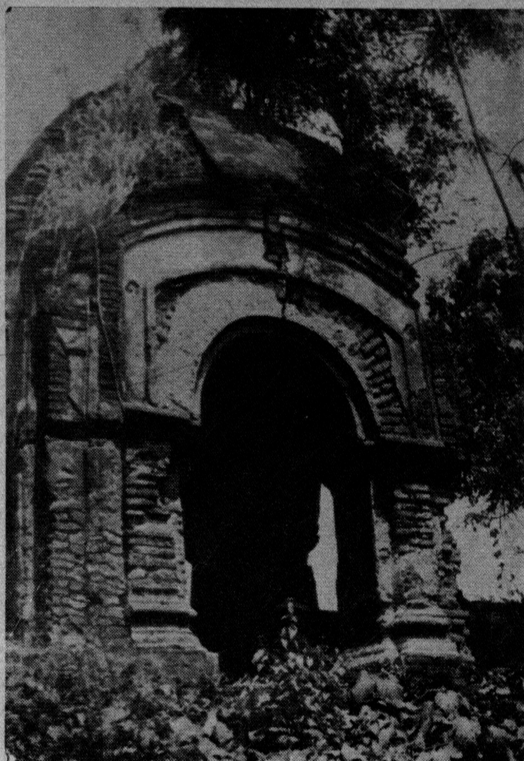
চিত্র ২ : প্রাচীন পুঁথি। উদ্ভাসিত হয়েছে হারিয়ে যাওয়া দিনের কথাকলি ; কলসুর



চিত্র ৩ : চূণ তৈরীর ভাটা

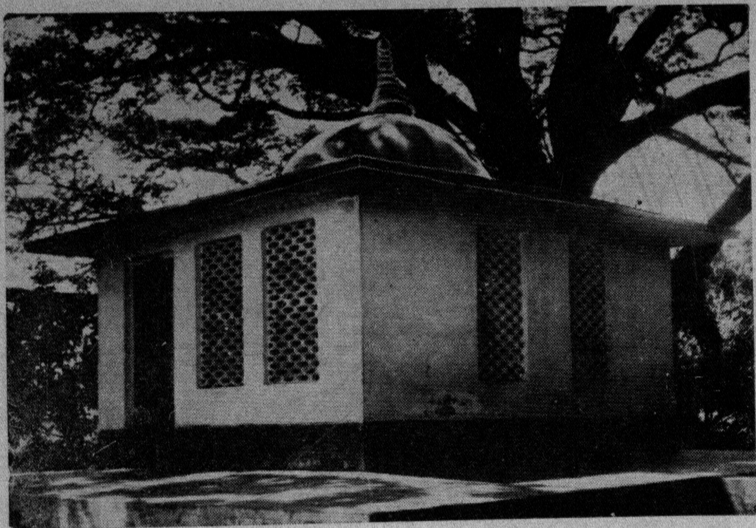


চিত্র ৪ : সাঁইত্রিশটি ধাপযুক্ত আশ্চর্য এক গহ্বর



চিত্র ৫ : রাজা চন্দ্রকেতু নির্মিত দোলমঞ্চের গায়ে ফাটল ; পানিহাটি





চিত্র ৭ : সমাধি। সৈয়দ আকবর পীর—ভক্তকুল নোয়ায় শির ; সোহাই



চিত্র ৮ : কারুকলা-সমন্বিত পাত্র—প্রশংসা অর্জন করেছে বিদেশীদেরও ; শ্বেতপুর



চিত্র ৯ : শিবস্তোত্রে মুখরিত জোড়া শিবমন্দির ; আজিজনগর



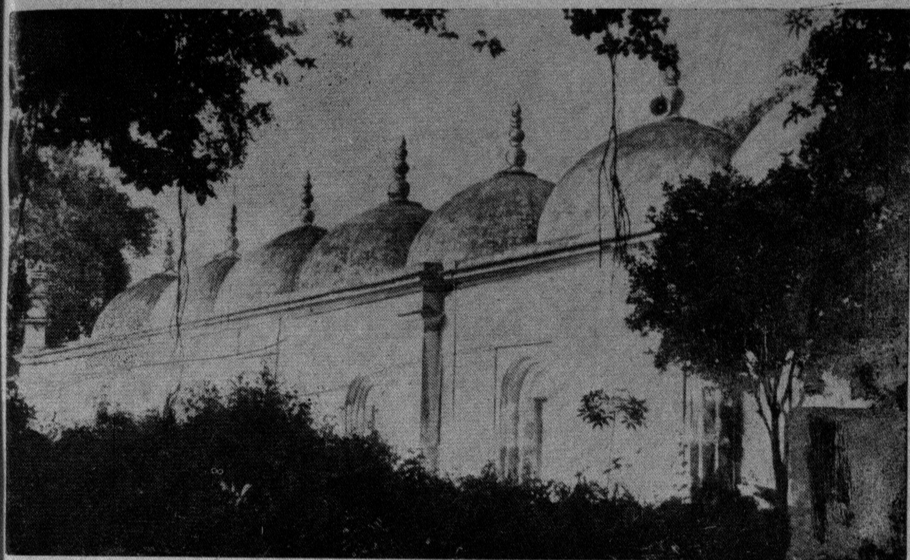
চিত্র ১০ : সাতটি হাতি বাঁধা থাকার গল্প নিয়ে গ্রাম সাতহাতিয়াতে সাতশো বছরের কাছাকাছি সময়ের ধ্বংসাবশেষ



চিত্র ১১ : 'মানসসুন্দরী
দুটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি।'



চিত্র ১২ : সুখসম্ভোগে লিপ্তযুক্ত দেড়হাজার বছর আগেকার মৃৎফলক ; চন্দ্রকেতুগড়

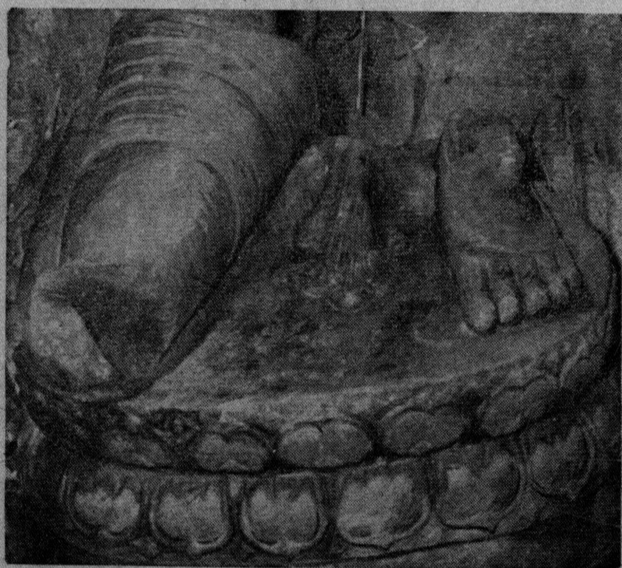


চিত্র ১৩ : স্থাপত্য ইতিহাসের এক অপূর্ব নজীর—সাত গম্বুজ মসজিদ ; রায়কোলা



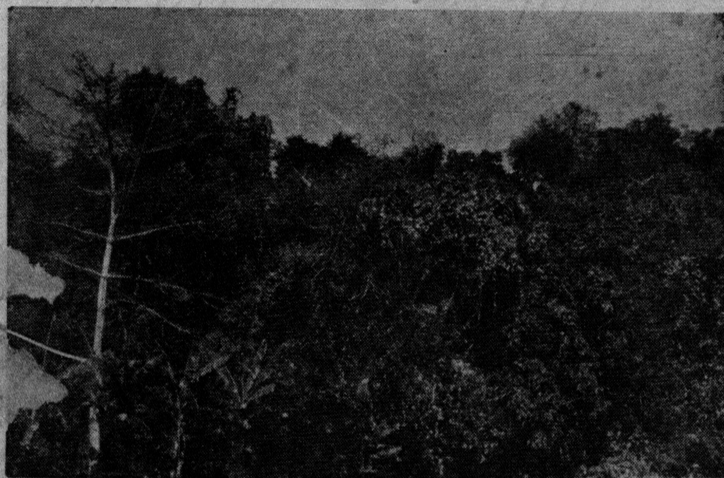
চিত্র ১৪ : কয়েক শতাব্দী পূর্বের ধাতবনির্মিত
শ্রীদাত্রী দেবী লক্ষ্মী ; সিংহের আটি

চিত্র ১৫ : রাসমঞ্চ প্রাঙ্গণ যাত্রীস্রোতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে রাসোৎসবে ; কলসুর



চিত্র ১৬ : ... পদ—সংগৃহীত হয়ে... মানসিংহখনি... জলাশয় 'হা... সোহাই

চিত্র ১৭ : বিদ্যাসাগর বান্ধব নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের বাটি ; ঝিকরা



চিত্র ১৮ : হিংস্র বাঘও এক সময় মাথা নোয়াতো 'বনবিবির' কাছে ; রায়কোলা

চিত্র ১৯ : নিস্তব্ধ ভূমি আজো গুঞ্জন তোলে
বাইশ আউলিয়ার স্মৃতি ; রায়কোলা



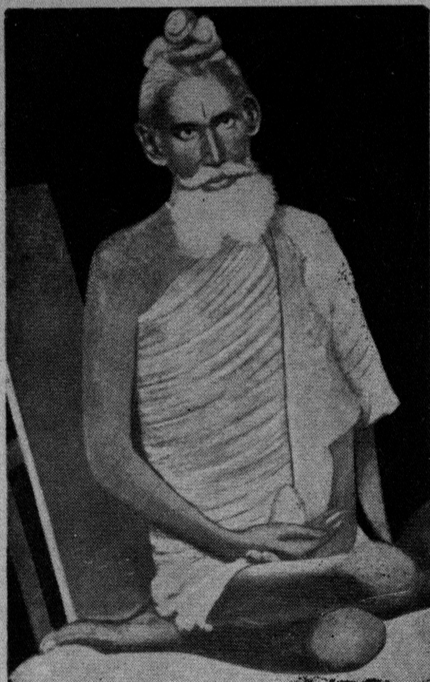
চিত্র ২০ : বীভৎস রাক্ষস
যার গল্প শুনে শিশুরা
এখনও চোখ বোজায় ;
দেবালয়, বেড়াচাঁপা



চিত্র ২১
রাধাকৃষ্ণ; পানিহাটি। চৌরাশী!
গ্রাম থেকে আনা বিগ্রহ দর্শনে
প্রীত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব



চিত্র ২২ : নীলকুঠি ; নীলকর সাহেবদের দৌরাত্ম্যের শেষ চিহ্ন ; কেয়াডাঙ্গা—চাঁদপুর



চিত্র ২৩ : লোকনাথ ব্রহ্মচারী ; জন্মগ্রহণ করেছিলেন গ্রাম চাকলাতে—ধন্য চাকলা !



চিত্র ২৪ : মহারাজ প্রতাপাদিত্যের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন সন্ত ঠাকুরবর। ঠাকুরবর স্মরণে নির্মিত নজরগাহ ঠাকুরবরহাট পড়ে আছে সকলের নজরের বাইরে।



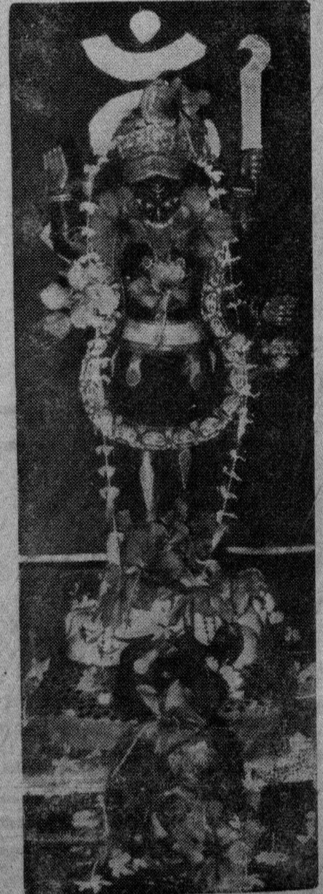
চিত্র ২৫ : অবলুপ্তপ্রায় লোকশিল্প
—শিশুখেলনা—চড়কের মেলা



চিত্র ২৬ : দু'হাজার বছর আগেকার রূপসীর খোঁপার বাঁধন—
আধুনিককালের মানুষদেরও মুগ্ধ করে। দেউলিয়া



চিত্র ২৭. তারা-মার মন্দির



চিত্র ২৮ : মন্দির ও তারা-মা ; পানিহাটি। মন্দির-অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত তারা-মা একদা পূজিতা হোতেন দেগঙ্গার রাজার গৃহে।



চিত্র ২৯: হাজরা রাজার মঠ; ইতিহাসের এক অজানা তথ্য নিয়ে মঠ দাঁড়িয়ে রয়েছে জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে*



চিত্র ৩০
*মঠে প্রাপ্ত ইট ও থালা





চিত্র ৩১: বিচারসভা; খুঁড়লে বার হতে পারে রাজার সিংহাসন।* দক্ষিণ কলসুর

শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দজীঠাকুর

সেবাতি শ্রীরামপ্রসাদশর্ম্মাস্য চরিতেষু —

দেবত্তর ভূমি ৩১/৩ একত্রিংশাবিঘা

বিঃ তিনকাঠা

বিশ্বনাথপুর

২১/৩ একবিংশ

বিঘা তিনকাঠা

চিত্র ৩২ : মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ দানপত্র ; বিশ্বনাথপুর

দেগঙ্গার জন্ম উৎস

বৈচিত্র্যময় প্রাচীন কাহিনী সমৃদ্ধ নবীন দেগঙ্গার দূরত্ব কোলকাতার এসপ্লানেড বা শ্যামবাজার থেকে যথাক্রমে উনচল্লিশ ও একত্রিশ কিলোমিটার। অবশ্য বিভিন্ন দিক দিয়ে পেঁছানো যায় এর যে কোন প্রান্তরে। শত স্মৃতি ঘেরা ৭৮ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ডের কথা তুলে ধরার আগে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন তার জন্ম-রহস্য। কোন্ সুদূর সময় কালে প্রথম সন্ধান মেলে 'দেগঙ্গা' নাম, তার উৎসই বা কি—শুরু করি সে বর্ণময় বৃত্তান্ত দিয়ে।

পলাশী যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটেছিলো ২৩শে জুন, ১৭৫৭। তার কয়েক দিন পরেই এলো ২০এ ডিসেম্বর, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ। মীরজাফর সিংহাসনে বসার পর ইংরাজকে খুশি করার জন্য উপঢৌকন দেন নীচের ২৪টি পরগণা। কোলকাতা, আজিমাবাদ, আকবরপুর, আমিরপুর, উত্তর ২৪ পরগণা, খাসপুর, শাহপুর, শাহানগর, দক্ষিণ সাগর, বালিয়া, বারিদহাটি, বসনধেয়াব, গড়, হাতিয়াগড়, দক্ষিণ সাগর, ইখতিয়ারপুর, খড়িবাড়ি, মেদন মল্ল, মাগুরা, ময়দা, মুড়াগাছা, পাইকান, পেচাকুলি, শতল। চব্বিশটি পরগণার ৮৮২ বর্গ মাইল এলাকা মীরজাফর তুলে দেয় ধুরন্ধর ক্লাইভের হাতে। দেগঙ্গার অদূরে দমদমে 'ক্লাইভ হাউস'-এ রাতের অন্ধকারে ঘটেছিল এ ঘটনা। বিনিময়ে ইংরাজরা ২ লক্ষ ২২ হাজার ৯ শো ৫৮ টাকা খাজনা দেওয়া শুরু করে। পরে কোলকাতা পৃথক হয়ে যায় এবং ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ২৪ পরগণার বিভাজন ঘটে ৮টি মহকুমাতে। মহকুমাগুলি হলো বারাসাত, বসিরহাট, সাতক্ষীরা, আলিপুর, বারুইপুর, দমদম, ব্যারাকপুর, ডায়মণ্ডহারবার। সাতক্ষীরা আবার চলে যায় খুলনা জেলার সাথে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে। আর তার পরের বছর ১৮৮৩ খ্রীস্টাব্দে তুলে দেওয়া হয় বারুইপুর

মহকুমা। ১৯০৪ এ দমদম যুক্ত হয় ব্যারাকপুরের সাথে। জেলা ২৪ পরগণার ভাঙ্গা গড়ার ইতিহাস এ রকমই।

২৪টি পরগণার সাথে তখন ছিল না আনোয়ারপুর ও বালাণ্ডা পরগণা। পরগণা দুটি ছিল নদীয়ার অধীন। আজ থেকে ১৭২ বছর আগে অর্থাৎ ১৮১৬ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া জেলা থেকে বালান্ডা ও আনোয়ারপুর যুক্ত হয় ২৪ পরগণার সাথে। অন্যত্র দেখা যায় ১৮১৬ নয় ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে নদীয়া থেকে চলে এসে বালান্ডা পরগণা যুক্ত হয় ২৪ পরগণার সাথে। ১৮৩৪ এ ২৪-পরগণা একবার ভাগ হয়েছিল, আলিপুর ও বারাসাত নামে।

এ বছরই অর্থাৎ ১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে স্থাপিত হয় দ্বিগঙ্গ থানা। তখন অবশ্য ফাঁড়ি বলতো। বিরাট এলাকা নিয়ে ছিল মাত্র ৪টি ফাঁড়ি। সেগুলি বারাসাত, তাবিরিয়া (বর্তমান নাম টাবাবেড়িয়া), নৈহাটি ও দেগঙ্গা। আবার ১৮৭৪'র দলিলে দেখা যায় দেগঙ্গার চৌরাশী, চাকলা তখন ছিল হাবড়া থানার অন্তর্গত।

১৯৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা মার্চ জন্মগ্রহণ করে নতুন জেলা উত্তর ২৪ পরগণা।

নিবিড় গ্রামোন্নয়নের স্বার্থে দেগঙ্গা ব্লক ডেভেলপমেণ্ট অফিস স্থাপিত হয় ২।১০।৫৭ এ। প্রথমে ছিল ভাড়া বাড়িতে। পরে চলে আসে সরকার নির্মিত আবাসে। বর্তমান অঞ্চল পঞ্চায়েতের স্থানে ছিল ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ড প্রথম গঠিত হয় ইংরাজ জমানায় ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে। দেগঙ্গায় ছিল ১০টি ইউনিয়ন বোর্ড। ইউনিয়ন বোর্ডগুলি হলো কলসুর, চৌরাশী, চাকলা, দেউলিয়া (বর্তমান নাম বেড়াচাঁপা) হাদিপুর-ঝিকরা, চাঁপাতলা, দেগঙ্গা নূরনগর, আমুলিয়া, সোহাই শ্বেতপুর। মহাত্মা গান্ধীজীর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে শুরু হয় বর্তমান পঞ্চায়েতী ব্যবস্থা। ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইউনিয়ন বোর্ডগুলি ভাঙগা গড়া করে ১০টির স্থলে হয় ১৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত। মাঝখানে ছিল গ্রামসভা। বর্তমানে সে ব্যবস্থা অবলুপ্ত। পঞ্চায়েত সমিতি ১টি। দেগঙ্গার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি হোল—(১) কলসুর (২) চাকলা (৩) চৌরাশী (৪) আমুলিয়া (৫) সোহাই-শ্বেতপুর (৬) নূরনগর (৭) বেড়াচাঁপা-১ (৮) বেড়াচাঁপা-২ (৯) দেগঙ্গা-১ (১১) দেগঙ্গা-২ (১২) হাদিপুর-ঝিকরা-১ (১৩) হাদিপুর-ঝিকরা-২। ১৯৮১ তে এখানকার জনসংখ্যা ছিল ১,৭২,৫৭৪।

কিন্তু না, চব্বিশ পরগণার ভাঙা গড়ার প্রেক্ষাপটে দেগঙ্গা দর্শন মাত্র কয়েক দশক আগে ঘটলেও সেইই শেষ নয়। প্রাচীনের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে দেগঙ্গা গ্রহণ করেছে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ, গুপ্ত, মোগল, সেন যুগের সুবাসিত ঘ্রাণ। বিভিন্ন সময়কালের নানা রমণীয় কাহিনী জড়িয়ে রয়েছে এখানকার মাটির সাথে। সে সব কথা আলোচনা করেছি পরবর্তী অধ্যায়সমূহে। আনুমানিক প্রায় আড়াই হাজার বছর পুর্বেকার কথা। নন্দ বংশ তখন ধ্বংস। সম্রাট অশোকের মৌর্য সাম্রাজ্য তখন স্থাপিত হয়েছে। স্থাপন করেছেন মৌর্য চন্দ্রগুপ্ত।

তাঁর রাজধানী পালিবোথরাকে সবাই জানেন পাটলিপুত্র নামে। সে সময়ে বাঙলার ২৪ পরগণা, যশোহর, খুলনা, প্রভৃতি অংশ নিয়ে ছিল 'গঙ্গারিডি রাষ্ট্র'। অনেকে বলতেন 'গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গা রাষ্ট্র'। এখানকার অধিবাসীরা নিঃসন্দেহে ছিলেন বাঙালী, একথা লেখা রয়েছে পন্ডিত ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'বাংলার ইতিহাস (প্রাচীন)' গ্রন্থে। তারা ছিল পরাক্রমশীল, তেজস্বী— এ কথাও বলা হয়েছে ঋষি বঙ্কিম চন্দ্রের 'বাঙলার কলঙ্ক' ও 'বাঙলার ইতিহাস' প্রবন্ধে।

সে সময় গঙ্গারিডি, গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গারাষ্ট্রের রাজধানী বা প্রধান নগরের নাম ছিল 'গাংগে' বা 'গঙ্গা'— স্মৃতিপট থেকে আজ সে কথা মুছে গেলেও তখন 'গঙ্গা' নগরীই ছিল সবচেয়ে কর্ম চঞ্চল। রোম ও গ্রীসের ইতিহাসে উল্লিখিত আছে 'গঙ্গ' নগরীর কথা।

"আজকের দ্বিগঙ্গ তথা চন্দ্রকেতুগড়ই সেই হাজার হাজার বছর আগের গঙ্গা নগরী"—দেগঙ্গা তথা চন্দ্রকেতুগড়ে আবিষ্কৃত আশ্চর্য সব নিদর্শন ও মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা জনবসতির চিহ্ন সমূহ গবেষণা ও অনুসন্ধানের পর এ অভিমত দিয়েছেন প্রত্ন বিজ্ঞানীরা।

কেন হলো দেগঙ্গা নাম? ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রয়েছে নানা ব্যাখ্যা। সেগুলি উল্লেখ করার আগে দূরকাল থেকে যে উপভোগ্য কিংবদন্তী চলে আসছে সেটি বলে রাখি—

কল্পনার গল্প বলে—গঙ্গাদেবী আসছিলেন দেউলিয়ার রাজার বাড়ি। রাজা চন্দ্রকেতুর পুত্রের অন্নপ্রাশন। সেখানে দেবী গঙ্গারও নিমন্ত্রণ। কিছুদিন আগে থেকেই রাজার সাথে পীর গোরাচাঁদের ধর্ম নিয়ে চলছে মন কষাকষি। পীরের ইচ্ছা গঙ্গাদেবী যাতে

উপস্থিত না হন রাজার বাড়ির নিমন্ত্রণে। কারণ গঙ্গা না গেলে অন্যান্য অতিথিরা খাদ্য গ্রহণ করবেন না। রাজা অপমানিত হবেন। দেউলিয়া থেকে দূরে এসে পীর সাহেব দেবী গঙ্গার সাথে সাক্ষাৎ করে বললেন, আপনি ধর্মভীরু নারী। সেখানে ভোজসভায় রান্না হচ্ছে আপনার অনুপযোগী মাংসাদি। আপনি কি যাবেন সেখানে ?

একথা শুনে ধর্মপ্রিয় গঙ্গাদেবী দুঃখ পান। লজ্জায় তিনি আর এগোলেন না। ফিরে গেলেন এখান থেকে। সে কথা লেখা রয়েছে লোকছন্দে—

"একথা শুনি গঙ্গা দুঃখ তাপ পাইল।
সাজানো কাহিনী গঙ্গা বুঝিতে না পারিল ॥
গঙ্গাদেবী ফিরে যান আপনার ধাম !
সেই হইতে লোকে কয় দ্বিগঙ্গা নাম ॥"

লোককল্প ব্যতীত বেশ কিছু পুঁথিপত্তরে গঙ্গা তথা দেগঙ্গার আরো কিছু ভিন্ন নামের ও দেগঙ্গা নাম কিভাবে হলো তার সন্ধান মেলে। নাম তার এক, ব্যাখ্যা তার ভিন্ন, গঙ্গা ছিল দীর্ঘ—তার তীরে অবস্থিত হওয়ার জন্য এ নগরীর নাম দীর্ঘগঙ্গা, দ্বীপের ওপর সৃষ্টি তাই দেগঙ্গার অন্য নাম দেখি দ্বীপগঙ্গা, একদা এখানকার মাটি ছিল পবিত্র, দেবতা রূপে কল্পনা করতো এ জনপদকে সে কারণে আদর করে অনেকে ডাকতো দেবগঙ্গা ; গঙ্গার দুটি ধারা স্রোতস্বিনী ভাগীরথী ও চঞ্চলা পদ্মা সচল করে রেখেছিল দেগঙ্গার জনজীবনকে, তাই দেখি দো-গঙ্গা ও দ্বিগঙ্গা নামও। এসব নামগুলির মধ্যেই উঁকি দেয় অতীতের সমৃদ্ধ নগরী 'গঙ্গার' ছবি। বাংলার আর এক প্রাচীন ঐশ্বর্যপীঠ তমলুক। তারও দেখা যায় ভিন্ন ভিন্ন নাম ! তার মধ্যে রয়েছে তাম্রলিপ্ত, তাম্রলিপ্তব, দামলিপ্ত, টামালিটেস, তামালিনী প্রভৃতি নামগুলি।

আপন মাধুর্যে প্রকাশিত দেগঙ্গার 'গঙ্গা'র উজ্জ্বল কথা ধরা রয়েছে ঐতিহাসিকদের লেখনীতে ও বিভিন্ন নিদর্শনে। অধুনালুপ্ত পূর্ববঙ্গ রেলপথের (১৯৪০) উদ্যোগে প্রকাশিত 'বাংলায় ভ্রমণ', পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে সংস্কৃত জনের প্রশংসাধন্য লেখক বিনয় ঘোষের 'পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি', কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালার প্রাক্তন অধ্যক্ষ প্রত্ন-পণ্ডিত দেবপ্রসাদ ঘোষের দেগঙ্গা নিয়ে গবেষণা, সভ্যতার বৈচিত্র্য ভূমি মোহেনজো-দারো হরপ্পায়

হাতে কলমে কাজ করার মত দুর্লভ সম্মানের অধিকারী কে, জি, গোস্বামীর "চন্দ্রকেতুগড় এণ্ড ইটস আর্কিওলজিক্যাল ইমপরটান্স" প্রভৃতি পণ্ডিতজনের আলোক সম্পাতকারী মূল্যবান লেখাগুলিতে অনুমিত হয়েছে যে খ্রীঃপূঃ ৩য়-৪র্থ শতাব্দীর গঙ্গারেজিয়া বা গঙ্গারাষ্ট্রের কর্মচঞ্চল নগর 'গঙ্গে' বা 'গঙ্গাই' ছিল আধুনিক কালের দেগঙ্গা।

নিঃসংশয়ে গর্বিত করে এমন কথাও রয়ে গেছে পৌরাণিক কাব্য সীমানায়। পুরাতত্ত্ব বিশারদ, গবেষক প্রয়াত ধনঞ্জয় দাস মজুমদারের পৌরাণিক কাব্যসমূহ মন্থন করে লেখা অমূল্য গ্রন্থ "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস"-এ (দ্বিতীয় খণ্ড) উল্লিখিত আছে— "মহাভারতীয় যুগে প্রবঙ্গের রাজধানী ছিল তদানীন্তন পূর্ব সাগরের মধ্যে ও পরবর্তী পদ্মানদীর তীরে অবস্থিত সমবঙ্গ দ্বীপে। .... মহারাজ বলীর উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার রাজলক্ষ্মীর অংশভাগী হয়ে এই পূর্বসাগরে সমুত্থিত দ্বীপপুঞ্জের রাজা হন সমুদ্র সেন। তাঁর বংশধরগণ সমুদ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া খ্যাত। সমুদ্রসেনের অন্যতম রাজধানী ছিল ২৪ পরগণার বেড়াচাঁপার নিকট চন্দ্রকেতুগড় দ্বীপে"।

পণ্ডিত এইচ. বিভারীজ, যিনি ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন পূর্ববাংলার 'বাখরগঞ্জ জেলার ইতিহাস', 'বরিশালের ইতিহাস' রচনা করে, তিনিও সুদীর্ঘ গবেষণা শেষে বলেছেন, দ্বিগঙ্গা ছিল এক প্রাচীন নগরী।

আর একজন উদ্যোগী মানুষ প্রয়াত সতীশ চন্দ্র মিত্র যিনি ইতিহাসের সন্ধানে দুর্গম সুন্দরবনসহ চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনার মাঠে, গ্রামে, নদীতে, জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছেন সেই নমস্য গবেষক সাধকের অমূল্য অমর গ্রন্থের নাম "যশোহর খুলনার ইতিহাস"। স্বদেশ প্রেমিক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অর্থ ও উৎসাহে ১৩২১ সালে প্রকাশিত উক্ত গ্রন্থ দলিলে লিপিবদ্ধ রয়েছে—"হাজার হাজার বছর আগে গঙ্গারিডী রাজ্যের একটি প্রধান নগর ছিল গঙ্গে বা গঙ্গারেজিয়া, দ্বিগঙ্গাই ছিল 'গঙ্গারেজিয়া' বা 'গঙ্গে' বন্দর।"

ভাল লাগে একথা ভেবে এমন এক সমৃদ্ধ জনপদের অধিবাসী আমরা, যার কথা সাক্ষ্য দিচ্ছে অতীত ইতিহাসের পৃষ্ঠা ও নিদর্শন। রোমাঞ্চিত হই একথা ভেবে যে এ নাম চিহ্নিত রয়েছে হাজার হাজার বছর আগের মানচিত্রে।

সেদিনের জলপথ

মানব সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই প্রায় একশো বছর আগে পর্যন্তও যাতায়াতের পথ বলতে বোঝাতো জলপথ। গিরিপথ সে তো ছিল সংসার বাসনা ত্যাগী সাধক ও শ্রেষ্ঠীদের জন্য। জনপদবাসী ব্যবহার করতো জলপথ। পণ্যসম্ভার নিয়ে পাল তুলে নৌযান ছুটতো এক জনপদ থেকে অন্য জনপদে। সেদিন নগর সভ্যতার বর্ণচ্ছটার প্রকাশ ঘটেছিল এসব নদীতীরকে কেন্দ্র করেই। গর্বিত হওয়ার মত বাঙলার বহু প্রাচীন নগরীর সাথে দেগঙ্গা তথা চন্দ্রকেতুগড়ের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশও ঘটেছিলো তটিনী তরঙ্গ প্রবাহে। পদ্মা, ভাগীরথী, বিদ্যাধরীর সম্মিলিত প্রবাহ দেগঙ্গাকে করে রেখেছিল উজ্জীবিত। তার মধ্যে পদ্মার ভূমিকা ছিল প্রধান। উদ্দাম গতিতে পদ্মা এক সময় গাংআটি, অনন্তপাড়া, শিমুলিয়া, নিরামিশা, চৌরাশি, ঢালীপাড়া, নসীমপুর, কলসুরের মধ্য দিয়ে গোবরডাঙ্গার অদূরে 'টিপি'তে যমুনার সাথে একাকার হোত। গভীর সমীক্ষায় দেখা গেছে সে সময় পদ্মার প্রশস্ততা ছিলো তিন কিলোমিটারের অধিক। "পদ্মার জল নিয়ে ইছামতী গভীর খাতে প্রবাহিত হয়েছে।" বিদ্যাধরী শ্বেতপুরের দিক থেকে এসে বেলেঘাটার পাশ দিয়ে গাংনিয়া, গাংধূলাট হয়ে হাড়োয়ার ওপর দিয়ে মিশেছে দূরের বিশাল স্রোতে। ভাগীরথীর কথা পাই মধ্যযুগীয় পুঁথি "দিবগঙ্গা রাজ বংশম"-এ—

"ভাগীরথী নদী তীরে দীর্ঘ গঙ্গা গ্রাম
সর্ব্বস্থানে দিবগঙ্গা বলিয়া ঘুষে নাম
অন্য স্থানে দেখা যায়
—"ভাগীরথী পাইয়া দিবগঙ্গারে"......

ভাগীরথীর অবস্থান ঠিক মত নির্ণয় করা সম্ভব না হলেও শুষ্ক খাত দেখে অনুমান করা যায় দিবগঙ্গার উত্তর দিক দিয়ে একটি জলধারা প্রবাহিত ছিল। সেটি চন্দ্রকেতুগড়ের পশ্চিমদিকের নগরায়ণ যেখান থেকে শুরু হয়েছে সে পর্যন্ত এসে উত্তরমুখী হয়ে মিশেছে পদ্মার স্রোতে। এসব পথে দেখা গেছে বালুকাস্তর ও নৌযানের ভাঙা অংশ। এ বিষয়ে তুলে ধরছি অধ্যাপক কুঞ্জ গোবিন্দ গোস্বামীর অভিমত যিনি অতীত সংস্কৃতির লীলাক্ষেত্র মোহেনজো-দারো ও হরপ্পায় খোঁড়াখুড়িতে অংশ নিয়েছিলেন, যাঁর দায়িত্ব ছিল চন্দ্রকেতুগড়, পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় উৎখননের। ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বুলেটিনে তাঁর মূল্যবান মন্তব্য থেকে জানতে পারি—

The police station situated in the village Deganga which is about 5 or 6 miles to the West of Chandraketugarh has a chain of marshes intervened by dried up lands running between the above two places along the north side of the Calcutta.—Basirhat Road. This proves that a river was flowing by Deganga and Chandraketugarh, and the latter was an important town or a port maritime of activities.

মূল গঙ্গা থেকে ভাগীরথী, পদ্মা নামে দুটি শাখা দিবগঙ্গার অভ্যন্তর দিয়ে প্রবাহিত ছিল বলা চলে। পদ্মা ও ভাগীরথীকে গঙ্গা নামেও ডাকা হোত অতীতে। কোনো কোনো লেখায় দেখা যায় দ্বিগঙ্গার গঙ্গার তীরে অবস্থানের কথা। তারও যথেষ্ট কারণ আছে। বক্তব্যকে দৃঢ় করার জন্য তুলে ধরছি পণ্ডিতজনের মন্তব্য। লিপিবিশারদ প্রত্নবিদ্ ডঃ ব্রতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ১৭।৬।৮৭-এর আনন্দবাজার পত্রিকাতে 'গঙ্গা' প্রবন্ধে বলেছেন— "অষ্টাদশ শতাব্দীর এক ইওরোপীয় বিববণে পদ্মাকে বড় গঙ্গা এবং ভাগীরথীকে ছোট গঙ্গা রূপে বলা হয়েছে।" ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদারের 'বাঙলার ইতিহাস' গ্রন্থে দেখি—"সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে যে পদ্মা নদী ছিল তার বিশিষ্ট প্রমাণ আছে।" ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায় 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে ভাগীরথী বা ছোটগঙ্গা, বড়গঙ্গা বা পদ্মার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "পদ্মাকে রেণেল সাহেব গঙ্গা নামে চিহ্নিত করেছেন" এবং "রেণেল ও ফান্ ডেন ব্রোকের নকসায় পদ্মা বেগবতী নদী"।

কিছু খাল বা উপনদীকে প্রবাহিত হতে দেখা যায় দেগঙ্গার অভ্যন্তর দিয়ে। এগুলি আবার মিশেছে বড় নদীর সাথে।

একদিকে মনসাদহ, রায়কোলার পদ্মা, অপর দিকে ঝিকরা, সিংহের আটি, আজিজনগর, আনুয়াদহের পাশ দিয়ে গোবিন্দের খাল। এখনও আছে সেনামে যদিও তার কোনো চিহ্ন নেই। এক সময় এর তীরে সপ্তাহে একদিন হাট বসতো। সম্প্রতি এরই একস্থানে পাওয়া গেছে বিশাল আকারের মানুষের মাথা। দেগঙ্গা, চাঁদপুরের দিক থেকে আসা আর একটি খাল মিশেছে গোবিন্দের খালে।

প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃত করছি তাম্রলিপ্ত ও চন্দ্রকেতুগড় উৎখননে যাঁর ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ তাঁর স্মরণযোগ্য মন্তব্যটি। প্রয়াত পরেশ চন্দ্র দাশগুপ্তের লেখা "প্রাগৈতিহাসিক চব্বিশ পরগণা" প্রবন্ধে বলা আছে—

"চন্দ্রকেতুগড়, গোপালপুর, হরিনারায়ণপুর, আটঘরা ইত্যাদি স্থান বিস্ময়করভাবে প্রমাণিত করে যে আজ থেকে দু'হাজার বছরেরও আগে চব্বিশ পরগণায় ছিল সুরম্য নগরী ও নৌবন্দর যেখানে নিয়মিত আসতো দেশ বিদেশের বাণিজ্য তরণী।"

এখনও পদ্মার শুষ্ক বুকে যৌবনের স্রোতস্বিনী রূপ কিছুটা কল্পনা করা যায় বর্ষাকালে নসীমপুর থেকে দক্ষিণ কলসুর পর্যন্ত দেখলে। দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ এলাকায় বর্তমানে মৃত বা মৃতপ্রায় খাত দেখে বিশ্বাস করানোই কঠিন যে এসব পথ দিয়েই একদা স্রোতপূর্ণ জলধারা প্রবাহিত ছিল। এমন মানুষের সংখ্যা কম হলেও বেঁচে আছেন যাঁরা দেখেছেন ষাট সত্তর বছর আগেও পদ্মার দুর্বার স্রোতে বিশাল আকারের পালতোলা নৌকা আগিয়ে যেতো দেশ-দেশান্তরে। কয়েক বছর আগের ঘটনা দক্ষিণ কলসুরের মুনশী পাড়ায় মৃত পদ্মার খাতে পুষ্করিণী খনন করতে গিয়ে দেখা গেছে ভাঙা নৌকার কাঠের তলে মানুষের কঙ্কাল। নিশ্চয়ই মনে করা যেতে পারে কোনো নৌযাত্রী কিম্বা মাঝি তরণীতলে চাপা পড়ার ফলে ঘটে এমন মর্মন্তুদ দুর্ঘটনা।

মানুষের চরম অবহেলা ও প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে একদা সভ্যতার জয়যাত্রা যে জলপথগুলিকে কেন্দ্র করেই সূচিত হয়েছিল আজ তা পরিণত হয়েছে মরায়। যুগ-যুগান্তর ধরে জমা পলিমাটির ওপর কোথাও কোথাও ফসলগুচ্ছ মাথা নাড়াচ্ছে কোথাওবা মানুষ নিজ দখলে রেখে আপন করে নিয়েছে জলাধারকে। বর্ষণ মুখরিত ঋতুতে পদ্মা কোথাও ফিরে পায় তার যুবতী রূপ। কিন্তু সে অতি সামান্য সময়ের জন্য। এমনিভাবে ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে জনজীবনের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রাচীন পথরেখা।

পথ কথা - টাকী রোড: গুমা গুড়দহ: গোড়গাছা: মার্টিন ট্রেন

কোন্ কাল থেকে মানুষ পায়ে হাঁটা পথে যাতায়াত শুরু করেছে তা বলা কঠিন। তবে একথা বলা যায় দূরতম অতীতে দুরধিগম্য পার্বত্য-পথে বিচরণ করতো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীরা। আর বাণিজ্যিক কারণে ভয়ঙ্কর এ সড়ক ব্যবহার করতো বণিক দল। আধুনিকতার আলোয় সে পথ আজ ঠাঁই নিয়েছে পুস্তকের পৃষ্ঠায়। নির্মিত হয়েছে পাকা রাস্তা। তবে সেও তো বেশি দিনের নয়। "১৮৩৪ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়ান রোড্স কংগ্রেস" নামে একটি সংস্থা সৃষ্টি হয়। অতঃপর বেশ কিছু রাস্তা পাকা করা হয় ও নতুন পথ নির্মিত হয়।" (প্রাক্-বৈদিক ও বৈদিক যুগে ভারতের পথ গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত 'দেশ' ৩০।৫।৮৭)।

"ধুলিপটে আঁকা পথের কথাও লিখে রাখো"—মনীষীদের এ বাক্যকে স্মরণ করে আগিয়ে গেলে খুঁজে পাই বেশ কিছু কথা যা স্মরণ করার মতো।

শুরু করি টাকী রোড দিয়ে। যদিও দীর্ঘ এ রাস্তার মাত্র কয়েক কিলোমিটার বেলেঘাটা, বিশ্বনাথপুর, কার্তিকপুর, দেগঙ্গা, অম্বিকানগর, বেড়াচাঁপা, কাউকেপাড়া প্রভৃতি এলাকার মধ্য দিয়ে পেঁৗছেছে টাকী, হাসনাবাদ কিংবা ইটিণ্ডাঘাটে তবুও এর কথা বলছি এ কারণে এখানকার জনজীবনে এ সড়কের ব্যবহার সর্বাধিক বলে।

তখন দেশ চলছে ইংরাজদের শাসনে। বারাসাত তখন ২৪ পরগণা জেলার সদর। এ ব্যবস্থা ছিল ১৮৩৪ থেকে ১৮৬১ পর্যন্ত। ১৮৩৩ এ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট একটি সভা ডাকেন বারাসাতে। তাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় বর্তমান বাংলাদেশের সাতক্ষীরা সহ স্থানীয় সকল জমিদারদের। সে সভায় ইংরাজ

ম্যাজিস্ট্রেট বারাসাত থেকে টাকী সোলাদানা পর্যন্ত একটি সড়ক নির্মাণের কথা উল্লেখ করেন। বিশাল রাস্তা, বিরাট ব্যয় সেই মুহূর্তে বহন করবার মত অবস্থাও তাঁর কোষাগারের ছিল না। তাই জমিদারদের নিকট থেকে আর্থিক সাহায্য কামনা করেন। তখন টাকীর জমিদার ছিলেন কালীনাথ মুন্শী। পরম শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। তিনি ছিলেন রাজা রামমোহন রায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। সতীদাহ-প্রথা নিবারণসহ দেশের ও দশের বহু কল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে ইতিহাসে অমর হয়ে রয়েছেন। ভাই বৈকুণ্ঠনাথ উপস্থিত ছিলেন সভাতে। কালীনাথ মুন্শী রাস্তা নির্মাণের সাহায্যে আগিয়ে আসতে সম্মত হলেন বটে কিন্তু একটা সর্তে, যা ব্যয় হবে তিনি একাই দান করবেন অন্য কেউ নন। সবাই সাধুবাদ জানালো প্রস্তাবকে। দান করলেন এক লক্ষ টাকা। মাটি কেটে নির্মিত হলো জনবহুল রাস্তা বারাসাত—টাকীরোড। অনেকে আবার কালীনাথ মুন্শীর রাস্তাও বলেন।

টাকী রোড পাকা হয় ১৮৫৯ সালে। শ্যামবাজার থেকে বসিরহাট পর্যন্ত প্রথম বাস চলে ১৯২৫-এ। বাস চালিয়ে বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসার বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতায় নামার জন্য দেশ গৌরব সুভাষ চন্দ্র বসুর উপদেশ ও সক্রিয় ভূমিকার কথা ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় ঘটনা।

আর একজনের দানের কথাও ভোলবার নয়। আনোয়ারপুর পরগণার জমিদার দে-বিশ্বাসেরা। খড়দহে ছিলো তাঁদের বাড়ি। রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনে তাঁরা ছেড়ে দেন জমি। নিত্য যার ব্যবহার তাকে জানার মধ্যে বোধ হয় বিশেষ একটা আনন্দ আছে। তাই টাকী রোড নির্মাণের পশ্চাৎপট কাহিনী দিয়ে শুরু করলাম। কাঁচা রাস্তার পরিমাপই বেশি। তবে সব রাস্তারই কিছু না কিছু বলার থাকে, নিত্য তাকে দলিত মথিত করে গেলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথ' কবিতাটি স্মরণে আনলে বোঝা যাবে সে কথা।

"আমি পথ......................
ভিতরেতে গাঁথা চলে নানা সূত্রে রচনার ধারা
* * * * * * * *

আমি পাই ক্ষণে ক্ষণে তারি ছিন্ন অংশ অর্থ হারা।
আমি মালা গেঁথে চলি শত শত জীর্ণ শতাব্দীর
বহ বিস্মৃতির।"

এমনি এক বিস্মৃত কাহিনী-বিজড়িত "গুমা-গুড়দহ" রোড। বারাসাত বনগাঁ রাস্তার 'গুমা' থেকে বার হয়ে দেগঙ্গার বিস্তৃত অঞ্চলের মানুষের ভরসাস্থল হয়ে এ রাস্তা পড়েছে গৌড়বঙ্গতে। রাস্তাটি পাকায় পরিণত হচ্ছে। ধূলিকণায় জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাসের একটুকরো ঘটনা। পাশের নারকেলবেড়িয়াতে হয়েছিল ইংরাজদের সাথে তিতুমীরের যুদ্ধ। সে কথা আজ থেকে দেড়শো বছরের কিছু আগের অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের। বিভিন্ন সময়ে গোরাদল পৌঁছেছে বাদুড়িয়া এলাকাতে লক্ষ্য তিতুকে দমন করা। মূলতঃ গৌড়বঙ্গ রাস্তা তাদের ব্যবহার করতে হয়েছে। পাশাপাশি গুমা গুড়দহ রাস্তাতেও শোনা যায় গোরাদলের পদধ্বনি। চাকলা, চৌরাগী, জীবনপুর, সুবর্ণপুর, নসীমপুর, কলসুর প্রভৃতি এলাকাতে ছিল নীলকুঠি। তিতুমীরের আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্যও ছিল নীলকরদের বিরুদ্ধে। গুমা গুড়দহ পথকে ব্যবহার করেছে ইংরাজ কর্তারা। কারণ, এ পথ দিয়ে গেলে তারা দ্রুত গৌড়বঙ্গতে পৌঁছোতে পারতো। তখন এ পথ এতই প্রশস্ত ছিল যে বারোজন অশ্বারোহী ইংরাজ গোরা পাশাপাশি যেতে পারতো, গিয়েও ছিল। সে কাহিনী শোনালো অশীতিপর বৃদ্ধ-পুত্র। পুত্রকে পিতা শুনিয়েছিলেন এ কথা। পিতার স্বচক্ষে দেখা এ দৃশ্য সবিস্তারে বর্ণনা করেছিলেন পুত্রের কাছে। পুত্র সযত্নে সে কথা গচ্ছিত রেখেছিল আপন মনের অলিন্দে। জীবন সায়াহ্নে এসে পড়ন্ত সূর্যের এক বিকেলে সে কথা শুনিয়ে তিনি যেন হাল্কা হলেন বলে মনে হলো।

দেগঙ্গার একটা পুরানো রাস্তার হদিস মেলে হান্টারের লেখা 'স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাকাউন্ট অব বেঙ্গল' গ্রন্থে। তাতে লেখা আছে—
The roads in the Parganas in 1857 were stated to consist one from Harua to Chowrashi and Crossed by the road from Barasat to Taki

"১৮৫৭ সালে পরগণার রাস্তা ছিল হাড়োয়া থেকে চৌরাশী, যেটি বারাসাত থেকে টাকী যাওয়ার পথের ওপর দিয়ে চলে গেছে।"

"গ্রামছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ আমার মন ভুলায় রে"—না রাঙামাটির পথ নয়, তবে মন ভুলবে এখানকার পরিত্যক্ত প্রায় আর এক পথের জীবন কাহিনী শুনে। গৌড়বঙ্গ রাস্তাটির সাথে সবাই পরিচিত। কিন্তু কম মানুষই জানেন গৌড়গঙ্গার বিষয়, অনেক পুরাতনজন গৌড়গঙ্গাকে আবার প্রতাপাদিত্যের রাস্তাও বলেন।

লক্ষণীয় ব্যাপার হলো বসিরহাটের সীমানা অতিক্রম করে পূর্ব দিক দিয়ে এ পথ প্রবেশ করেছে দেগঙ্গার সীমানায়। সিংহেরআটি, শানপুকুর, ঝিকরা, চন্দ্রকেতুগড়ের গা দিয়ে হাদিপুর, যাদবপুরের মধ্য দিয়ে এর সমাপ্তি ঘটেছে এ ভূখণ্ডেরই একটি অংশ। কোনো কোনো স্থানে রাস্তার চিহ্ন নেই, কোথাও কোথাও গৌড়গঙ্গাকে ব্যবহারও করেন না গ্রামবাসী তবুও পুরানো নামেই তারা আজো ডাকেন। কথিত আছে পথটি নির্মাণ করেছিলেন প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্ত রায়। অনেকে বলেন প্রতাপাদিত্যই এ রাস্তা তৈরি করান। সময়টা অনুমান করা যেতে পারে ১৫৯৯-১৬০৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হবে। এ পথের পশ্চাতে আছে এক মনোরম জনশ্রুতি। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের মা একবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন গঙ্গা স্নানের। মায়ের ইচ্ছা নদী পথে না গিয়ে যাবেন পালকি করে। রাস্তা ঘাট বড়ই দুর্গম। তার ওপর চোর দস্যুতো আছেই। তাই মায়ের পালকির সাথে পাঠালেন বিরাট লোক-লস্কর বাহিনী। তারা মহারাজের মাকে পালকি করে আনার সাথে সাথে বন জঙ্গল কেটে বানাতে লাগলো রাস্তা। এভাবেই তৈরি হলো রাণীমা'র চলার পথ। যাত্রাপথ শেষ হয় দেগঙ্গাতে এসে। অনুমান এখান থেকেই ছোট গঙ্গার ওপর দিয়ে রাণীমা পুণ্য—সলিলা গঙ্গায় স্নান করতে যান্ পুণ্যের আশায়। শুধু তাই নয় এ পথের ধূলিকণায় রয়েছে আরো কিছু স্মৃতি। একদা এ পথ বেয়েই অসংখ্য মানুষ যেত গঙ্গা স্নানে, এ পথ ধরেই একদিন বাংলার লুপ্ত রাজধানী গৌড় থেকে পুণ্য প্রয়াসীরা আসতো পুণ্য স্নানে ; এ পথ ধরেই লোকনাথ ব্রহ্মচারী বেণীমাধব ও গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী যাত্রা করেছিলেন মহাতীর্থ কালীঘাটের উদ্দেশ্যে। এমনি সব হৃদয় মথিত করা লোককথা জড়িয়ে রয়েছে গৌড়গঙ্গার পথ-ধূলার রেণু-পরমাণুতে। এখন আলোয় উদ্ভাসিত নগরের পাকা রাস্তা ধরে যাত্রীর মিছিল চলেছে পুণ্যতীর্থ কালীঘাটে কিংবা গঙ্গাস্নানে। আধুনিক কালের মানুষের সময় নেই যে পথ ধরে পুণ্য পরিক্রমায় বার হতেন পূর্ব পুরুষেরা তাঁদের চরণ চিহ্ন খোঁজার। 'গৌড়বঙ্গ' বঙ্গসমাজে সমাদর পেলেও 'গৌড়গঙ্গা' পড়ে আছে অনাদরে, অবহেলায়, পড়ে আছে অপরিচিতের পরিচয় নিয়ে।

আজ বিশ্বাস করানো কঠিন হলেও এক সময় টাকী রোডের গায়ে গা দিয়ে হুশ হুশ শব্দ করে ধোঁয়া উড়িয়ে ট্রেন চলত। ট্রেন চালাতো

মার্টিন কোম্পানি। সবাই বলতো ছোট রেল। ছোট রেলের কথা বলার আগে বলে নেই বড় রেল বা ব্র্যাডগেজ রেলের কথা, যা এখন চলছে বারাসাত থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত। মার্টিন ট্রেন বন্ধ হওয়ার পরঅনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে এ ট্রেন চালু হয় ১৯৬২'র ৯ই ফেব্রুয়ারি। তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়, সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ সহ টাকী, বসিরহাটের বিভিন্ন সংস্থা, লোকসভার সদস্যদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার ফসল বারাসাত হাসনাবাদ ব্র্যাডগেজ রেল। খরচ পড়ে ২ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা। মোট ১৪টি স্টেশনের মধ্যে দেগঙ্গার মধ্যে পড়ে তিনটি স্টেশন বেলিয়াঘাটা, ভাসিলা ও হাড়োয়া রোড। ভাসিলার পাশে নতুন হল্ট লেবুতলা হয়েছে পরে। একটি মাত্র এক্সপ্রেস 'ইছামতী' শিয়ালদহ থেকে হাসনাবাদে যায়। ইছামতীর নদীর নামানুসারে ইছামতী এক্সপ্রেস চালু হয় ১৯৮৩'র ১৩ই মে।

অবশ্য আমাদের জেলা ২৪ পরগণাতে প্রথম ট্রেন চলতে আরম্ভ করে ১৮৬২ খ্রীস্টাব্দে। কোলকাতার বেলেঘাটার থেকে ট্রেন যেতো সোনারপুর পর্যন্ত। এটি পরিচালনা করতো সাউথ ইস্টার্ণ রেলওয়ে। দমদম থেকে দত্তপুকুর ট্রেন চলে ১৮৮২ তে। গোবরডাঙগা বনগাঁ ১৮৮৪ তে। আজকের সুবিশাল শিয়ালদহ স্টেশন তখন ছিলো টিনের তৈরি ঘরে।

প্রথম ট্রেন প্রবেশের কথা যখন বললাম, একটু বলে নেই প্রথম কবে দমদম বিমান বন্দর থেকে বিমান উড়লো। "ঘাসের ওপর বিমান বন্দর তৈরি হয় ১৯২৩-২৪ সালে। এখানে ১৯২৩ সালে বিমান নামিয়েছিলেন পাইলট দ'ওয়েজি। ১৯২৪ সালে আসেন ডাচ পাইলটরা এবং ১৯২৫ সালে ব্রিটিশ রয়েল এয়ার ফোর্সের বিমান। দমদম বিমান বন্দর দিয়ে নির্ধারিত সূচী অনুযায়ী বিমান চালনা শুরু করে KLM ১৯২৭ সালের জুনে।"

ফিরে আসি মার্টিন ট্রেনের কথায়। অধুনালুপ্ত মার্টিন ট্রেন চলতো বেলগাছিয়া থেকে হাসনাবাদ পর্যন্ত। বেলগাছিয়ায় বর্তমান ট্রাম ডিপোর সামনে ছিলো স্টেশন যদিও নাম ছিলো শ্যামবাজার। বেলেঘাটাতে ছিলো জংশন স্টেশন। একটা ট্রেন শ্যামবাজার, পাতিপুকুর, লাঙলপোতা, বেলিঘাটার ওপর দিয়ে চলে যেতো বসিরহাটের দিকে আর একটা বারাসাত থেকে আসতো বেলেঘাটা পর্যন্ত। শ্যামবাজার থেকে আসা ট্রেন বেলিয়াঘাটা, কার্ত্তিকপুর,

দেগঙ্গা, বেড়াচাঁপা, স্বরূপনগর, ধান্যকুড়িয়া গাইনগার্ডেন, আড়বেলিয়া, শিকড়া কুলীন গ্রাম, খোলাপোতা, মৈত্রবাগান, বসিরহাট, শাঁকচুড়া দণ্ডিরহাট প্রভৃতি স্টেশনের ওপর দিয়ে পৌঁছোতো হাসনাবাদে। বেড়াচাঁপাতে বর্তমানে যেখানে 'ভারতী প্রেস' সেখানে ছিল বিরাট আকারের দ্বিতল রেস্ট হাউস। পদস্থ অফিসারেরা লাইন পরিদর্শন এসে এখানে উঠতেন। পাশেই স্টেশন। ছিল পুষ্করিণী সহ সাজানো ফল ও ফুলের বাগান। এ ট্রেন চালু হয় ১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে। পরিচালনা করতো মার্টিন কোম্পানি। পরবর্তী কালে দু-চারবার মালিকানা হস্তান্তরিত হয়। বাংলার কৃতি সন্তান ভ্যাবলা গ্রামের স্যার আর, এন, মুখার্জীর সক্রিয় ভূমিকা ছিল রেল পরিচালিত হওয়ার ব্যাপারে। দীর্ঘ ৫০ বছর চলার পর লোকসানের অজুহাতে রেলের চাকা আর চলেনি।

ট্রেন বন্ধ হয়ে যাওয়ার দিনের কথা ভোলবার নয়। যাঁরা প্রতিদিন দেখেও দেখতেন না—তাঁরাও সেদিন এসেছিলেন রেললাইনের ধারে। আপনজন বিচ্ছেদের মত করুণ চিত্তে সকলে দেখলো সে দৃশ্য। হাসনাবাদ কিংবা বসিরহাটের কোনো এক কিশোর কাঁচা হাতে খড়ি দিয়ে সব শেষের বগিতে লিখে দিয়েছিল 'শেষ ট্রেন'। ইঞ্জিনের ধোঁয়া আর উড়লো না। হুসহুস শব্দ ও হয়ে গেল স্তব্ধ। চিরকালের জন্য মার্টিন ট্রেনের চাকা গেল বন্ধ হয়ে। বন্ধ হওয়ার দিনটা ছিল ১৯৫৫'র ১লা জুলাই।



গ্রামের নাম কেন হলো?

কবে প্রথম গ্রাম নামের সন্ধান মেলে? কিভাবে সৃষ্টি হলো গ্রামগুলির নাম—এসব কথার সন্ধান করতে গিয়ে সন্ধানী মানুষ পেয়েছেন বেশ কিছু কথা। ঋগ্বেদে 'ক্ষেত্র' ও 'খিল্যা' শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'ক্ষেত্র' অর্থ জমির দাগ এবং 'খিল্যা' শব্দের অর্থ সীমানা—দুটি দাগের পৃথক কারী চিহ্ন। বেদে গ্রাম, মহাগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। (ভূমি রাজস্ব ও জরীপ—টোডরমল)। প্রাচীন অর্থশাস্ত্রবিদ্ কৌটিল্য ও পরিব্রাজক মেগাস্থিনিসের বিবরণ থেকে জানা যায়—"একশত থেকে পাঁচশত পরিবার নিয়ে গ্রাম ও দশটি গ্রাম নিয়ে স্থানীয় ও চল্লিশ স্থানীয় নিয়ে দ্রোণ মুখ।"

প্রথম গ্রাম শব্দের খোঁজ মিললেও কেন হলো গ্রাম নাম এ বিষয়ে আমরা ওল্টাতে পারি ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী'র আশ্বিন সংখ্যা। গ্রাম নামের বৈচিত্র্য নিয়ে যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলেছেন—'একটা কিছু অর্থ ব্যতীত গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়।" সমগ্র পশ্চিম বাংলাতে যে নিয়মে গ্রাম নাম হয়েছে—সে নিয়ম দেগঙ্গাও অনুসরণ করেছে। মোটামুটি ভাবে নাম করণের পশ্চাতে কাজ করেছে ৫টি রূপ-ভাবনা। (১) গাছ-গাছি, ফলমূল, কৃষিজাত দ্রব্য। (২) চাঁদ-তারা-সূর্য প্রভৃতি। (৩) দেব-দেবী, ধর্মীয় চিন্তা-ভাবনা। (৪) রাজা-বাদশা বা প্রভাবশালী ব্যক্তি। (৫) হালকা বা লঘু অর্থে।

ব্যাপক ও ধারাবাহিকভাবে নামকরণ শুরু হয়েছে গুপ্ত সময়কাল বা মোটামুটি দেড় হাজার বছর আগে থেকে। তবে নামকরণের শুরু কিন্তু বৈদিক কালে এবং বৃক্ষ দিয়ে। এ বিষয়ে তুলে ধরতে পারি

ভাষাচার্য ডঃ সুকুমার সেনের কথা—"ভারতবর্ষের ঐতিহ্যে যে কয়টি প্রাচীন স্থান-নামের উল্লেখ আছে তার মধ্যে 'বৃক্ষ' নাম বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। বেদের কাল থেকেই 'বৃক্ষ' বা 'হ্রদ' স্থানের দিশা চিহ্ন বলে গণ্য হতো"।

সেকারণে প্রথমেই উল্লেখ করছি দেগঙ্গা এলাকার গ্রাম বা স্থান যার সাথে যুক্ত রয়েছে গাছ-গাছা-গাছি, কৃষিজাত দ্রব্য, ফলমূল ইত্যাদি। ৯৮। বিরামপুর-কুমরুলী, ১৮। গান্তিরগাছি, ২২। বসনে-বেনাপুর, ২৬। দোগাছিয়া, ২৭ তেঁতুলিয়া (এ নামে তিনশোর বেশী গ্রাম আছে পশ্চিমবাংলায়) ৩২। বেলপুর, ৩৪। খেজুরডাঙ্গা, ৩৫। বেলগাছিয়া, ৪০। কলাপোল-চক কলাপোল, ৪৩। শরবেড়িয়া, ৪৪। কুরলগাছা, ৫৭। মাটি কুমড়া, ৫৮। আমুলিয়া, ৫৯। বড়গাছিয়া, ৬০। শিমুলিয়া, (আড়াইশোর বেশী গ্রাম আছে এ নামে) ৭৮। চক্-কুলিয়া, ৮০। খোড়দা, ৭৩। পদ্মপুকুর ৯৭। রোহিন্দী—প্রকৃতপক্ষে রোহীন কথার অর্থ (রোহিহীন) 'বার বার কেটে বাদ দেওয়া হলেও পুনরায় অঙ্কুরিত হয়।' ৯২। চাঁপাতলা প্রভৃতি।

পশ্চিমবাংলাতে গ্রামের সংখ্যা ৪২,৬১৫, চব্বিশ পরগণায় ৪,২০০, দেগঙ্গাতে ১০৮টি এ হিসাব মৌজানুযায়ী। মৌজা বলতে বড় গ্রাম। আবার এমন ও দেখা যাচ্ছে মৌজার অধীন সৃষ্ট অন্য গ্রামগুলির জনসংখ্যা মূল মৌজা অপেক্ষা অধিক। অতি অল্প সংখ্যক গ্রাম নামের উৎস খুঁজে পাওয়া যায়নি। তাই সে ক্ষেত্রে কিছুটা অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়েছে। তুলে ধরেছি সবকটি গ্রাম বা মৌজার নাম। প্রতিটির পাশে উল্লেখ করা আছে সেই মৌজার ক্রমিক সংখ্যা। ৩।৪টি ক্ষেত্র ছাড়া কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সম্ভব হয়নি মৌজার অধীন সব গ্রামের নাম উল্লেখের।

গ্রামের নাম কেন হলো অধ্যায়ে নেই নীচের মৌজা যুক্ত গ্রামগুলির সূত্র। এগুলির ব্যাখ্যা রাখা আছে ঐ গ্রামগুলি নিয়ে কোনো না কোন বিষয়ের আলোচনা পর্বে। ৩। শ্বেতপুর, ৪৬। কামদেবকাঠি ৪৯। রাণীহাটী, ৫০। রায়পুর, ৫৪। রায়কোলা, ৯৯। হাদিপুর-চুপড়ি ঝাড়া, ১০০। সিঙ্গেরআটী, ৬৮। দেউলিয়া, ৬৯। বেড়াচাঁপা, ৪১। সুবর্ণপুর, ৪৫। পারপাটনা, ৯৫। মামুরাবাদ, ৫১। পাথরঘাটা, ১০২। মাণিকপুর, ৪৭। উত্তর কলসুর,

৪৮। দক্ষিণ কলসুর, ১৭। সোহাই, ৩০। দেগঙ্গা, ৮২। সাতহাতিয়া, ৭৩। ভাসলিয়া।

এবারে আসি গ্রাম নামের সাথে যুক্ত পুর, নগর, আড়া, বেড়া, পোল, তলা, চক, ভাঙগা প্রভৃতি নিয়ে। পুর—কথার অর্থ হলো গৃহ, আলয়, নগর ইত্যাদি।

চক—"প্রধান মৌজা থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো অংশ যাকে সামান্য খাজনাদায়ী বা নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি হিসাবে একখন্ডে গণ্য করা হয়...........। গ্রামবাসীদের কাছ থেকে বহিরাগত কাউকে পত্তন করলে সে জমি চক নামে পরিচিত হত।"

আড়া—উঁচু স্থান, পোল—বিচালী (পোয়াল) খড়।

৯০। চকধুলোট—গ্রামের মধ্যস্থিত ভূখন্ড।

১৪। নূরনগর—নূননগরের অপভ্রংশ রূপ। কাছেই এখনও রয়েছে আর একটি গ্রাম নুনের আটি। নূরনগরের ব্যাখ্যায় ধনঞ্জয় দাস মজুমদারের লেখা "বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস" থেকে জানা যায় "নূননগরে মাহিষ্য মলঙ্গিগণের লবণ প্রস্তুত করিবার বিরাট ভাঁটি ও লবণের গোলা ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্বকালে এই সকল ভাঁটিতে লবণ প্রস্তুত বন্ধ করিয়া দিলে মলঙ্গিগণ এই সকল স্থান ত্যাগ করিয়া খুলনা জেলার রঘুনাথপুর—ফলসী প্রভৃতি স্থানে বাস করিতে যায়।"

ব্যক্তি, পেশাকে অবলম্বন করেও গ্রাম নাম দেখা যায়। এর মধ্যে রয়েছেন, সাধারণ থেকে অসাধারণ, ঐতিহাসিক থেকে অনৈতিহাসিক ব্যক্তি। ধর্মীয় গুরুও বাদ যান্ নি। নামগুলি রাখার পশ্চাতে সব সময় যে শ্রদ্ধা কাজ করেছে এমন নয় ভয়-ভীতি থেকেও হয়েছে। আবার এমনও দেখা গেছে অনেক গ্রাম পত্তনকারী বা প্রথম অধিবাসীর নামে অভিহিত হতে। ১। ক্ষুদ্র মন্ডল গাঁথি—অল্প-স্বল্প জোত জমার অধিকারী। ৭। কুমারপুর, ১০। নিয়াজেশপুর, ১২। মোবারেকপুর, ২০। আরজুল্লাপুর, ১০৫। জামালপুর, ৬৬। জীবনপুর, ৮৮। এসমাইলনগর, ৯৩। নিজামিরপুর, ১০৪। আজিজনগর, ১০৭। আবজারনগরে ইত্যাদি।

৮। দৈবজ্ঞপোল ৯। মঙ্গলনগর পাশাপাশি দুটি গ্রাম। অলৌকিক চিন্তা চেতনায় একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। দৈব বা ভাগ্য বিষয়ে যিনি জানেন বা বিজ্ঞ তিনিই তো দৈবজ্ঞ অর্থাৎ ভাগ্যগণনাকারী বা জ্যোতিষী। মঙ্গল অর্থ শুভ। ভাগ্যের উন্নতি

হোক, মঙ্গল হোক—এ রকম শুভেচ্ছা নিয়েই হয়তো গ্রাম দুটির নামকরণে আগিয়ে এসেছিলেন ভাগ্য গণনায় পারদর্শী কোনো ব্যক্তি।

৯৯ এস / গাজীতলা—গাজীর অধিষ্ঠিত স্থান। গবেষক আব্দুল গফুর সিদ্দিকির অভিমতে—"যাঁহারা অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যে এসলাম বিরোধী শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করেন তাঁহাদের বলা হয় গাজী।"

গাজীতলা—(আমুলিয়া অঞ্চল) গ্রামবাসীর বক্তব্য অনুযায়ী শাহগাজী নামক এক পীরের নামানুসারে গ্রামটির নাম হয়। পীরের দরগাও আছে এখানে।

৬৮। নন্দী পাড়া, ১০৮। হড়পুকুর—পাশে গোপালপুর গ্রামের হড়বাবুদের কাটা পুকুর থেকে হড়পুকুর।

২। মীর্জাপুর, ৬৫। মীর্জানগর—অভিজাত মুসলমান পরিবারের পদবী আবার "ভদ্র পারসিক ও মোগলদের জাতীয় উপাধি।"

৫। খাঁপুর বা খানপুর—'সম্ভ্রম সূচক মুসলমানী উপাধি বিশেষ'। অনেক হিন্দুও সৎকার্য ও কর্মদক্ষতার গুণে সুলতানের কাছ থেকেও খাঁ উপাধি পেয়েছেন। যেমন গুণরাজ খাঁ, পুরন্দর খাঁ প্রভৃতি। নবাব হুশেনশা'র কাছ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণার মাহীনগর গ্রামের গোপীনাথ বসু উপাধি পান পুরন্দরখাঁ।

১০১। ঝিকরা—এক সময় জাক্রা নামেও পরিচিত হতে দেখা যায় এ গ্রাম। পূর্ব নাম নতিবনগর ও কিশোরনগর।

বাসাবাটি—ঝিকরা মৌজার অধীন নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জোলা বা তাঁতী সম্প্রদায়ের একটা অংশের বিরাট ভূমিকা ছিল। সময় অর্থাৎ ১৮৩১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে তিতুমীরের সাথে ইংরাজদের সংঘর্ষ বাধলে বাদুড়িয়ার হয়দারপুর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকা থেকে চলে আসা তাঁতী'রা "বাসা" বাঁধেন বাসাবাটিতে।

৬। ওধনপুর—ওদন সঠিক শব্দ। ওদন অর্থ অন্ন। 'ওদিন ওদন বিনা ভাল লাগে না' "(ভারত চন্দ্র গ্রন্থ মেলা)"।

ওদন্তপুরী নামে একসময় ছিল বিখ্যাত বৌদ্ধ মঠ। ওধনপুর বা ওদনপুর গ্রামটির নামকরণ সেই অনুসারে দেওয়া হয়েছিল কিনা তা আজ বলা কঠিন। তবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো ওদনপুর গ্রাম থেকে প্রাচীন কালের নিদর্শন স্বরূপ সংগৃহীত হয়েছিলো নানা ধরণের মৃৎপাত্র ও কাঠের খুঁটি। এগুলি বল্লাল সেনের সময়কালের

বলে অভিমত দান করেছেন গবেষক। পাশের গ্রাম সোহাই থেকেও সংগৃহীত হয়েছে প্রস্তরে নির্মিত নানা দেব-দেবীর মূর্তি, মৃৎ পাত্রাদি। সামগ্রিক বিশ্লেষণে একথা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে আজ বিলুপ্ত হলেও কোনো এক সময় পদ্মার তীর বরাবর এ গ্রামগুলি ঘিরে গড়ে উঠেছিল জনবসতির ও বিস্তার লাভ করেছিলো সভ্যতার।

২৫। বেলিয়াঘাটা—একরুল্লা মৌজার অন্তর্গত বেলিয়াঘাটার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া বিদ্যাধরী সীমা নির্ধারণ করেছে বারাসতের সাথে দেগঙ্গার। এক সময় এখানকার মাটিতে ছিল বালির আধিক্য ও এখানে ছিল খেয়া পারাপারের ঘাট।

৫৩। সিরাজপুর—কথিত আছে পাশাপাশি গ্রামগুলির নাম করণ করা হয়েছিল মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মানার্থে, উৎসাহবশতঃ নবাব সিরাজের ভক্ত কোন ব্যক্তি গ্রামটির সাথে যুক্ত করতে পারে সিরাজের নাম।

১০৩। চটকাবেড়িয়া—বর্ষাকালে কাদা চটকে নানা দিক বেড়দিয়ে বা ঘুরে প্রবেশ করতে হতো গ্রামে।

১৫। ফাজিলপুর—'ফাজিল' অর্থ অতিরিক্ত। এই 'অতিরিক্ত' জ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

চাঁদ, তাঁরা, সূর্য, রবি গ্রহ প্রভৃতি নক্ষত্রের নাম দিয়ে গ্রামের নাম রয়েছে অনেক। তবে এর মধ্যে চাঁদকেই যেন বেশি ভালবাসে মানুষ। চাঁদের সৌন্দর্য সুধার সথে প্রিয়জনের তুলনা করতে যেন বেশি ভালবাসি আমরা। চাঁদ নাম যুক্ত করে গ্রামের মানুষ গ্রামের নাম রেখেছে বেশী পরিমাণে। পশ্চিমবাঙলায়ত চাঁদ নাম দিয়ে গ্রামের সংখ্য ১০০'র বেশী। দেগঙ্গাতে। রয়েছে ৭১। চাঁদপুর, ৮৩। কেয়াডাঙ্গা—চাঁদপুর, ৮৯। চক্—চাঁদপুর, খিদিরমোল্লা আটী চাঁদপুর, তরফদার আটি চাঁদপুর, দীঘেরআটি চাঁদপুর, চাঁদপুর (আমুলিয়া), চাঁদকাঠি (কলসুর) প্রভৃতি।

৪২। মঞ্জিল আটি—মঞ্জিল কথার অর্থ হলো প্রাসাদ। পর্ণকুটির সমৃদ্ধ পল্লী বাঙলায় নামকরণের ধারাপাতে 'মঞ্জিল' নামকরণ মঞ্জুল বা অপূর্ব।

৮৬। গাঙগলিয়া, ৮৭। গাংধুলোট, (এ) গাংআটি, গাংনিয়া—গাং কথার মানে গঙগা থেকে উৎপন্ন নদী। এখানে গ্রামগুলির অবস্থান ঘটেছে গংগার শাখা বিদ্যাধরীর তীরে।

৫২। চাকলা—"কয়েকটি পরগনার সমষ্টি"।

৬২। চৌরাশী—জনশ্রুতি আছে ফকিরের কেরামতীতে এক সময় গড়ে ওঠে চুরাশীটি গ্রাম। অন্যমতে চৌরাশী ছিল একদা একটি পরগণা। এরই অধীনে ছিল ৮৪টি গ্রাম।

৯১। পণ্ডিতপোল—পণ্ডিতমণ্ডলীর বসবাস থেকে পণ্ডিতপোল কিনা এ রকম উৎসের সন্ধান না মিললেও কবি পণ্ডিত শাহাদাৎ হোসেনের বাড়ী এ গ্রামে। পরবর্তী এক পর্বে আলোচনা করেছি আজীবন কাব্য সাধনারত তাঁর কথা।

৬৯। অম্বিকানগর—বেড়াচাঁপা মৌজার অন্তর্গত এ গ্রামের-আদি নাম বেড়াচাঁপা। স্বাধীনতার পর ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে তৎকালীন পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করে চলে আসা নাগরিকেরা বসবাস শুরু করেন এখানে। এক সময়ে এখানকার গাঁতিদার ছিলেন অম্বিকাচরণ গড়গড়ি। তাঁরই নামানুসারে তাঁরা গ্রামের নামকরণ করেন অম্বিকানগর।

সংখ্যা দিয়ে গ্রাম ২৫। একরুল্লা ৩৩। দো-হাড়িয়া

৭৫। ঝাঁপা—চৈত্র সংক্রান্তি অর্থাৎ বছরের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত হয় চড়ক উৎসব। এ উৎসবের একটি লোমহর্ষক অঙ্গ উপর থেকে ঝাঁপ দিয়ে লৌহশলাকার ওপর পড়া। পুরাতন চড়ক বা গাজনের উৎসবও আছে আশপাশের গ্রামে। ঝাঁপা নামটি ঝাঁপ শব্দ থেকে উদ্ভূত হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

৯৪। রামনগর ২৩। রামনাথপুর, রামপুর—রামনাম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রিয় হলেও পশ্চিম বাঙালায় তুলনামূলক ভাবে কম। পশ্চিম বাঙলাতে রাম নাম দিয়ে গ্রামের সংখ্যা ৪০০র মত। ২৪ পরগণায় ৬০টির বেশি, দেগঙ্গায় ৩টি।

৩৬। ব্যসবরুনী ৩৭। বরুনীপুঞ্জী ৩৮। বরুনী—জলাধিপতি বা বৃষ্টির দেবতা বরুণ। স্ত্রীলিঙ্গে বরুণা+না—নী। দেবতা বরুণকে স্মরণ করে কৃষি সম্পন্ন এলাকায় এ রকম নাম করণ বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। বরুণের পুর্বে ও অন্ত্যে 'ব্যস' ও 'পুঞ্জী' যুক্ত করায় একটি সুন্দর ভাবনা চিন্তাও ফুটে উঠেছে। 'ব্যস ও 'পুঞ্জী' শব্দ দুটির অর্থ একই—প্রচুর বা রাশিকৃত।

জীবজন্তু, মৎস্য পশুপক্ষীর নাম যুক্ত গ্রামের সংখ্যা খুবই কম। বাদুড়িয়া, ট্যাংরামারী, কুমীরমারী এখানে নেই বটে তবে আছে ৩১। চাংদানা (বর্তমান নাম চন্দনা), বোয়ালিয়া, কুঁচেমোড়া প্রভৃতি।

৬১। ওয়ালীপুর—'হজরতশাহ আববাস আলী ও হজরত আবদুল্লা এখানকার ব্রাহ্মণ প্রধান পল্লীতে তিনদিন তিনরাত্রি অবস্থান করে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণকারী শিষ্যগণ পীর সাহেবদ্বয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে স্থানের নাম রাখেন অলিপুর বর্তমানে ওলিপুরই পরিচিত হয়েছে ওয়ালীপুর নামে"।

৬৩। এয়াজপুর—এ গাঁয়ের পূর্বে নাম ছিল কচুয়ানগর। সুদূর আরব দেশ থেকে কোন এক সময় এখানে আসেন 'আয়াজ' নামে একজন সাধক। তিনি কিছুদিন অবস্থান ও করেন এখানে। তাঁকে স্মরণীয় করে রাখার উদ্দেশ্যে গ্রামবাসী কচুয়ানগরের অর্দ্ধেক অংশের নাম রাখেন আয়াজপুর। আজকের 'এয়াজপুর' 'আয়াজপুরের'ই নামান্তর।

৬৪। কাউকে পাড়া—কাউকে পাড়াটি পত্তনি দেওয়ার জন্য নাম কাউকেপাড়া হয়েছিল কিনা জানা না গেলেও পুরাতন দলিল দস্তাবেজে এর নাম দেখা যায় বিরামনগর।

ইসনামী ধর্মজগৎ নিয়ে গ্রাম নামের সংখ্যা কম। কারণ বলতে গিয়ে "পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম" গ্রন্থের লেখক শ্রীঅমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত তুলে ধরা যেতে পারে—"ইসলামে দেব-দেবীর স্থান নেই। আল্লাই সেখানে একেশ্বর। কিন্তু আল্লা, খোদা, মহম্মদ (বা তাঁর বিকল্প নাম), কোরাণ, মক্কা প্রভৃতি সহযোগে গ্রাম নাম সৃষ্টি ইসলাম বিরোধী" যেমন খোদাদাতপুর ব্যক্তির নামে খোদা বা ঈশ্বরের নামে নয়। তবে খ্যাত নামীদের নামে হতে পারে, হতে পারে কোনো অসাধারণ ব্যক্তির নামেও যেমন ২৮। হোসেনপুর—হজরত মোহম্মদ দৌহিত্র হোসেন না ব্যক্তি হোসেন। একই প্রশ্ন থেকে যায় ৭৪। আমিনপুরের ক্ষেত্রেও হজরত মাতা আমিনা না কোনো রমণী ?

৯৬। গোরাইনগর—গোরাই গাজী বা পীর গোরাচাঁদের নামানুসারে; আবার ১১। বাজিত নগরের উৎসের সন্ধান না মিললেও ৭৬। মহব্বতপুর প্রেমের প্রকাশ কিনা ঠিক করতে না পারলেও স্থির করা গেছে ১০৬। সেকেন্দ্রানগর ১২। মোবারেকপুর নিয়ে। বারাসাত, বসিরহাট, ডায়মণ্ডহারবার প্রভৃতি এলাকায় এক সময় পীরের প্রভাব ছিল অসামান্য। তাঁদের মধ্যে পীর বড় খাঁ গাজী ছিলেন এক শক্তিশালী পীর। দক্ষিণ ২৪ পরগণার ঘুটিয়ারীশরিফে তাঁর স্মরণে প্রতি বৎসর ১৭ই শ্রাবণ

লক্ষাধিক লোকের উপস্থিতিতে 'ওরস' উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। বড় খাঁ গাজীর আরো কয়েকটি নাম দেখা যায়। তার মধ্যে মোবারক শাহ গাজী অন্যতম। তার পিতার নাম সেকেন্দার শাহ, "কারো কারো মতে তাঁর পিতা ছিলেন পীর গোরাচাঁদ সহচর শাহ আবদুল্লাহ্ ওরফে শাহ সোন্দলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। (বাংলা পীর সাহিত্যের কথা—ডঃ গিরীন্দ্র নাথ দাস)। স্বাভাবিক কারণে সেকেন্দ্রানগর, মোবারেকপুর গ্রাম দুটি সেকেন্দার শাহ ও মোবারেক শাহ গাজী নামানুসারে হয়েছে অনুমান করাটা অন্যায় হবে না।

২৯। কাতিকপুর—কালিয়ানী মৌজার অন্তর্গত এ গ্রাম নামের সাথে মিশে রয়েছে ভারত খ্যাত চিকিৎসক ও পল্লী উন্নয়নে উৎসর্গীকৃত প্রাণ কাতিক চন্দ্র বসুর নাম। তাঁর পিতৃভূমির নাম চাংড়ি পোতা। ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি কোলকাতাতে প্রতিষ্ঠা করেন 'বোসেস ল্যাবরেটরী'। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলি আবিষ্কৃত ঔষধের মধ্যে রয়েছে 'নানালা' মাথা ধরার ঔষধ ও 'অশোক কডিয়াল'। স্বাধীনতা পূর্ব যুগে গ্রামের মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে তিনি কাতিকপুরে স্থাপন করেন কৃষি খামার, গোপালন কেন্দ্র, সমবায় সমিতি ও মৈত্র বাগানে চিনির কল।' কাতিকপুর 'উহমেনস হোম' নামে পরিচিত ইংরাজি অনুকরণে নির্মিত বিশাল বাড়িটিও তিনিই নির্মাণ করেন। নাম দেন 'বিশ্রাম মন্দির'। চারপার্শে ছিল ঝিল। যাতে রোগীরা মুক্ত জল বায়ুতে দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠতে পারে। ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে বাধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। সৈন্যদের থাকার কারণে ও শত্রু পক্ষের বিমান আসার সংবাদ দ্রুত সংগ্রহ করার যন্ত্র 'র‍্যাডার' বসানোর উদ্দেশ্যে ইংরাজ সরকার 'ডিফেন্স রুল' বলে নিয়ে নেয় বাড়িটিকে। স্বাধীনতার পর রাজ্য সরকার এটিকে গ্রহণ করেন অনাথা বিধবা মহিলাদের থাকার জন্য। আজ মার্টিন ট্রেন বন্ধ হয়ে গেলেও এক সময় তাঁরই উদ্যোগে এখানে প্রতিষ্ঠিত স্টেশনের নাম ছিল কাতিকপুর। কোলকাতা পৌরসভা আমহার্স্ট স্ট্রীট পোস্ট অফিসের গায়ে অবস্থিত 'করিশ চার্চ' লেনের নাম পরিবর্তন করে নাম করণ করেছে কাতিক চন্দ্র বসু স্ট্রীট।

হিন্দু দেব-দেবীর নামাঙ্কিত গ্রামগলি প্রসঙ্গে আসা যাক্। কালী'র নামের সাথে যুক্ত কালিয়ানী কিন্তু শিবকে কেন্দ্র করে এখানে গ্রামের সংখ্যা ৩টি যেমন ১৩। বড়া-বিশ্বেশ্বরপুর, ২৪। বিশ্বনাথপুর, (মতান্তরে এক সময়ের জমিদার বিশ্বাসদের নামানুসারে) ৮১। কলিযুগা বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি স্থান নামগুলিতে শাক্তানুরাগীদের

প্রভাব প্রতিফলিত হলেও বৈষ্ণবীয় চেতনায় রসসিক্ত গ্রামগুলিই অধিক।

৮৩ এস। গোঁসাইপুর—বৈষ্ণব গুরু বংশীয় ব্যক্তিদের উপাধি। আবার গোঁসাই অর্থ প্রভু বা ঈশ্বরও বটে। সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে কৃষ্ণ যুক্ত গ্রামের সংখ্যা ৮০০'র কিছু বেশি। দেগঙ্গাতেও সবচেয়ে বেশি যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণ বা কৃষ্ণের অন্য নামে। ভাবতে অবাক লাগে এলাকাতে রাধা নামে সাধা নেই কোনো গ্রাম।

১৯। মোহনপুর, ৭৯ এস/ গোবিন্দপুর, ৭০। যাদবপুর, (হে কৃষ্ণ, হে যাদব, গীতা ১১, ৪১) ২১। গোবিন্দপুর, ৭৯। গোবর্দ্ধনপুর, ৮৪। কৃষ্ণচন্দ্রপুর, ৩৯। মুরারী ডাঙ্গা—দৈতকুলে একদা মুর ছিল শক্তিমান ও ভয়ানক দৈত্য। কৃষ্ণ মুরকে বধ করেন তাই কৃষ্ণের আর এক নাম মুরারী—এবং সে থেকেই মুরারীডাঙ্গা, ৫৫। বল্লভপুর, ৫৬। বাসুদেবপুর, ৭৭। পারুলিয়া-মাধবপুর, পারুল অর্থ পাটল ফিকে রঙের এক ধরণের বনফুল। শ্রীকৃষ্ণ বনফুল খুবই ভালবাসতেন। নিশ্চয়ই কোনো কৃষ্ণ প্রেমিক তার আরাধ্য মাধবকে পারুল বা বনফুলের নাম আচ্ছাদনে ঢেকে দিয়ে পেরেছিলেন পরম তৃপ্তি। কৃষ্ণ অভিধাযুক্ত গ্রামগুলির আধিক্যে মনে আসে যে চৈতন্যোত্তর যুগে বাংলায় প্রবাহিত কৃষ্ণ প্রেমের ঢেউ ছোট্ট হলেও আছড়ে পড়েছিল আমাদের আঙিনাতেও এবং সেদিন এখানকার সরস মাটিতে কৃষ্ণ নাম মাধুরীর প্রকাশ স্মরণ করিয়ে দেয় কাজী নজরুল ইসলামের কাব্যাংশকে—

"দিও বর, হে প্রভু
যবে যাই আনন্দ ধামে
যেন প্রাণ ত্যাজি হে স্বামী
শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ নামে"

পল্লীবাসীর হৃদয়ে পল্লীর স্থান ছিল স্বর্গসম। তাঁদের সে মনের কথা ফুটে রয়েছে কবি যতীন্দ্র মোহন বাগচীর ছন্দে—

"এটি আমার গ্রাম, আমার স্বর্গপুরী,
এইখানেতে হৃদয় আমার গেছে চুরি।"

অনেক গ্রামের নামের উৎস আজ কুয়াশাচ্ছন্ন, কিন্তু এ কথা সঠিক গ্রামবাসীর কাছে গ্রামই ছিল রবীন্দ্রনাথের কথায় "আমার পৃথিবী তুমি।" সে গ্রামের রূপশ্রী বৃদ্ধিতে সাহায্য করেছে সুন্দর ভাবনা চিন্তার আলোকে অর্থবহ ও মধুময় নামকরণ।



ইংরাজ আমলে বড় ধরনের চাকরীতে প্রথম বাঙালী

১৭০০ খৃস্টাব্দের পরবর্তী সময় দেগঙ্গার নন্দরাম সেন দেগঙ্গা থেকে চলে আসেন কোলকাতায়। তখন কোলকাতা জলা জঙ্গলে ভর্তি। তিনি বন কেটে এখানে বসবাস শুরু করেন। লেখক পুর্ণেন্দু পত্রীর—'পুরনো কলকাতার কথা চিত্র' গ্রন্থে নন্দরাম সেনের পরিচয়ে লেখা আছে—

"এলেন পুরুষ মহা দীর্ঘ গঙ্গা হইতে
জঙ্গল কাটিয়া বাস এখানে করিতে।"

ইংরাজ আমলে প্রথম কালেক্টর ছিলেন রালফ সেলডন। ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হন নন্দরাম সেন। নন্দরাম সেনই প্রথম বাঙালী যিনি এত বড় উচ্চ পদে নিযুক্ত হন।

নন্দরামবাবুর তখন বেতন অনেক। চার টাকা। এ পদে থেকেই তিনি প্রচুর ধনসম্পত্তির মালিক হন। পরে অবশ্য তহবিল তছরুপের দায়ে তাঁর চাকরী চলে যায়। তবে নন্দরামবাবুর একটা কাজ যুক্ত হয়ে আছে অনেকের সাথে। পুরানো দলিলে পাওয়া যায় যে রাধারমণ মিত্র ছিলেন কোলকাতার জমিদার। রঘুনাথ মিত্র ছিলো রাধারমণের পুত্র। রঘুনাথের ফাঁসির হুকুম হয়। তার অপরাধ সে দলিল জাল করেছে। তারিখটা ছিল ১৭৬৬ খ্রীস্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী। ফাঁসির হুকুম রদ করতে একত্রিত হলো কোলকাতার জমিদারেরা।

এঁদের মধ্যে ছিলেন বাগবাজারের গোকুল মিত্র, খিদিরপুরের ভূকৈলাশের রাজপরিবারের গোকুল ঘোষাল, মহারাজ নবকৃষ্ণ বাহাদুর, বড় বাজারের শোভারাম বসাক এবং দেগঙ্গার নন্দরাম সেন।

অবশ্য এ কাজে আর একজনের ভূমিকার কথা বলতেই হবে। তিনি মীর্জা ফুলুরী। মুর্শিদাবাদের নবাব। পোষাকী নাম নজমউদ্দৌলা। নজমউদ্দৌলা ছিলেন নবাব মীরজাফরের পুত্র। ফুলুরী নামে ডাকার কারণ—তিনি যখন মা মণি বেগমের গর্ভে তখন তাঁর মা ফুলুরী খেতে খুব ভালবাসতেন। অবশ্য নজমউদ্দৌলা মাত্র এক বছর সময় পান নবাবী করার। থাক্ সে সব কথা। রঘুনাথের ফাঁসির হুকুম রদের ব্যাপারে দেগঙ্গার নন্দরাম সহ অন্যান্য জমিদারদের পাশাপাশি নবাব সাহেবের ভূমিকা ছিল ভালো। শেষ পর্যন্ত ফাঁসি হয়নি রঘুনাথের।

"দীর্ঘ গঙ্গা নামে স্থান সেন কুলোদ্ভব
তৎপূর্বের বার্ত্তা জানা নাহিক সম্ভব।"

দীর্ঘগঙ্গা গ্রামের সেন কুলোদ্ভব নন্দরাম সেনের নামে কোলকাতায় রাস্তা আছে। কোলকাতার রথতলার ঘাটও এই নন্দরাম সেনের বদান্যতার সাক্ষ্য বহন করে। নন্দরাম বেঁচে নেই কিন্তু ডেপুটী কালেক্টর পদে প্রথম বাঙালী হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার সংবাদ-কণাটি ম্লান হলেও মুছে যায়নি।



নীল চাষ ও পাটকাঠির কেল্লা

তরুণ ফরাসি মঁসিয়ে লুই বোনাড নীলচাষের আশা নিয়ে বাংলাদেশের চন্দননগর এলাকায় আসেন ১৭৭৭ খ্রীস্টাব্দে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা কিম্বা চক্রান্তের শিকার হয়ে লাভজনক ব্যবসায়ে সফল হতে পারেন নি। সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে আসে ইংরেজ বেনের দল। তাদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে বাংলার চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর, খুলনার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে। এর মধ্যে ছিল দেগঙ্গার উর্বর ভূমি খণ্ডও।

মিঃ বানু নামে একজন ইংরাজ দেগঙ্গা এলাকায় আসেন নীলচাষ করার উদ্দেশ্যে, তিনিই মালিক বা কুঠিয়াল। চৌরাশীর জীবনপুরে বানালেন কুঠি। সাহেবের কুঠি বলতে ছিল পাকা ঘর। সেখানে ভেঙে ফেলে স্থানীয় মানুষ বেঁধেছে ঘর। এখনও বয়স্করা ডাকে কুঠির হাট বলে। ঠিক পাশেই পদ্মার আয়নার মত স্বচ্ছ জল। উর্বর দোঁয়াশ মাটি সুতরাং নীলচাষের স্বর্ণ ভূমি। প্রাকৃতিক পরিবেশও মনোরম। তাই মেমসাহেবকে নিয়ে থাকার পক্ষে স্থানটি ছিল উত্তম। এখানেই একদিন প্রাচুর্য আর অত্যাচারের বন্যা বয়ে গেছে। সেদিনের সাক্ষ্য ইটগুলো জরাজীর্ণ হয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আজও।

বাংলাদেশের মধ্যে বারাসতের কাছে নীলগঞ্জে সর্বপ্রথম স্থাপিত হয় কারখানা ও শুরু হয় নীলচাষ। এ ঘটনা ১৭৭৯ খ্রীস্টাব্দের এবং এর উদ্যোক্তা ছিলেন জন্ প্রিন্সেপ। ধীরে ধীরে দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলসহ ২৪ পরগণায় শুরু হয় নীলচাষ। সে সময় নীলকর সাহেবদের অত্যাচার ও নীলচাষের বিরুদ্ধে দেগঙ্গার কৃষক-কুলের একটা সক্রিয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু জীবনপুর কুঠি ও বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ব্যতীত বিস্তৃতভাবে কোথাও ঠাঁই পাইনি সে বৈপ্লবিক পট ভূমিকায়।

সাহেব বানু এলেন দেরি হলো না মোসায়েব জুটতে। নীলকরের লোকেরা চৌরাশী, চাকলা, কলসুরের সমগ্র এলাকায় জমি নীলচাষের

উপযোগী—মনে করলেই পুতে দিতো লাল নিশান। তাকে তোলার ক্ষমতা কারো ছিল না। প্রবল শক্তি আর শত্রুতার বিরুদ্ধে দূর থেকে অসহায় চাষীর অপলক নয়নে জমির দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া কিছুই করার ছিলো না। এখন যেমন কাপড় জামায় দেওয়ার জন্য নীল বা 'শলু' তৈরি হয় রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় তখন হতো গাছ থেকে। গাছের নাম ছিল 'ইণ্ডিগো'। ১০।১২ মন নীল পাওয়া যেতো ১৫ টাকারও কম দামে।

প্রত্যেক কুঠিতে থাকতো একজন দেওয়ান আর কিছু কর্মচারী যারা সবাই এ দেশীয়। দেওয়ানই ছিল সর্বেসর্বা। জীবনপুর কুঠির দেওয়ান ছিলেন মোহাম্মদ হেরাছতুল্লা—মিনিট পাঁচেক আগিয়ে গেলে রাজুকবেড়িয়ায় তাঁর বাড়ি। দেওয়ানজী খেটে খুটে সবদিক তদারকি করেন আর কুঠিয়াল ক্রুর বানু পালকিতে চেপে, হেঁটে হেঁটে ছড়ি ঘুরিয়ে কুঠিগুলি দেখাশোনা করেন মাত্র। জীবনপুর প্রধান কুঠির অধীনে ৮৪টি গ্রামে ৫২টি কুঠি বর্তমান ছিল। লোকমুখে এখনও শোনা যায়—

হিজেল কোঠায় বিরাজখানা
কাজল কোঠায় খানা
বাহান্ন কুঠিতে তার আওনা যাওনা।

কলসুর, চৌকিপোতা, সর্দার পাড়া, নসীমপুর, জীবনপুর, শ্বেরপুর, মাটিকুমরা, সিরাজপুর, রায়পুর, চাকলা, শ্বেতপুর, বল্লভ-পুর, ঘোলদেড়িয়ারবিল, চাঁদপুর, কেয়াডাঙ্গা চাঁদপুর, বিশ্বনাথপুর প্রভৃতি দেগঙ্গার এ সকল এলাকায় ছিল নীলকুঠি পদ্মা যে সকল গ্রামগুলোতে ছুঁতে পারে নি সেখানে নীল ধোয়ার জন্য চৌবাচ্চা ছিল। তার কিছু কিছু এখনও রয়েছে কয়েকটি স্থানে। সিরাজপুরের কুঠি দেখা শোনা করতেন সফিরউদ্দিন মোড়ল।

ইতিমধ্যে মিঃ বানুর নিষ্ঠুরতা আর চেলা-চামুণ্ডাদের অত্যাচার গ্রামের মানুষের ঘুম কেড়ে নিয়েছে।

কত বছর বট গাছটির বয়স কেউ জানে না। রায়কোলার সেই গাছের শিকড়ে বসে সুতো দিয়ে বাঁধা মোটা কাঁচের চশমার ফাঁক দিয়ে বৃদ্ধ চাষীটি বললেন—সব কিছু মনে করতে পারছি না তবে শুনেছি চাষ করতে রাজী না হলে চাষীর পিঠে পড়তো সপাৎ শব্দ করে বেতের ঘা। বেত্রাঘাতকে সাহেবদের দেওয়া আদরের নাম ছিল

'শ্যামচাঁদ'। 'শ্যামচাঁদ' নামের ভয়ংকর উল্লেখ শুধু দেগঙ্গার মাটিতেই পাওয়া গেছে তা নয়, নীলকর সাহেবদের আদরের বেত 'শ্যামচাঁদ' সে সময় বাংলার চাষীর মনে ভয়ংকর ত্রাসের সঞ্চার করেছিলো।

অব্যক্ত যন্ত্রণা, নিদারুণ কষ্ট নিয়ে দিন কাটাচ্ছে নরম মাটির সহজ মানুষগুলো। বাঙলার অন্যত্রও নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কথা পদ্মার কিনারে পৌঁছাতে দেরি হয়নি। কিন্তু দেগঙ্গা এলাকায় নীলকরদের জুলুমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নেতৃত্ব দেবে কে? হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনায় এলাকার গণশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করে নীলকর সাহেবরা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অতি সামান্য লেখা আছে সে কথা কিন্তু সত্য হয়ে বেঁচে রয়েছে বায়োবৃদ্ধদের মনে ও মুখে।

একদিন দেওয়ান হেরাছতুল্লা কিছু টাকা ধার চাইলেন মিঃ বানুর কাছে। দেওয়ানজীর বহুদিনের সখ একটা ঘোড়া কেনার। তখন একজন দেওয়ানের বেতন ছিল ৫০ টাকা। তাই কিছু টাকা ধার পেলে ঘোড়াটা কিনতে পারবেন, তাতে কাজের সুবিধা হবে, সখও মিটবে।

সাহেবের অসম্মতির কোনো কারণ নেই—বিশেষ করে দেওয়ানজী যখন চাইছেন। টাকা নিয়ে রাজুকবেড়ের মানুষ ছুটলেন বিহারের ছত্তরে। বাঘ, সিংহ, হাতি, ঘোড়া থেকে নানা জাতের পশুপক্ষীর কেনা বেচা করার অত বড় মেলা ভারতবর্ষে তখনও ছিল না—আজও নেই। বাছাই করে ৭০০ টাকা দিয়ে একটা তেজী ঘোড়া দেওয়ান কিনে আনলেন ছত্তরের মেলা থেকে। টগবগ করে ঘোড়ায় চেপে চলতেন দেওয়ানজী। দাঁড়িয়ে দেখতো গ্রামের লোক।

মুস্কিল হলো এখানেই। বাবু যত বলে পারিষদেরা চিরকালই তার চেয়ে বেশি বলে। মিঃ বানুর কান ভারী করে তুললো এরা। সাহেব যাবে হেঁটে, পালকি চেপে আর কর্মচারী তাও আবার অমন তেজীঘোড়ায়। হতেই পারে না। বার বার বলে কান ভারি করার ফলে সাহেব একদিন দেওয়ানজীকে ডেকে ঘোড়াটিকে তার ভাল লাগার কথা বললো এবং ইঙ্গিতে সেটি চাইলেও। দেওয়ানজী তো অবাক। অত কষ্ট করে দূর বিহারের ছত্তর থেকে ঘোড়াটিকে এনে সবে চাপতে শুরু করেছেন অমনি সাহেবের নজর পড়লো। বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। মনে মনে অপমানও বোধ করলেন কিন্তু উপায় তো নেই।

দাঁতে দাঁত চেপে ইচ্ছার বিরুদ্ধে সম্মতি দিলেন। শুধুমাত্র সময়মত এর উত্তর দেওয়ার জন্য দেওয়ানজীর শুরু হলো অপেক্ষা। ও দিকে আবার পুরকায়েতআটী, চাকলা, রায়পুরের চাষীরা লাভ হবে জেনেও পাট চাষ করতে পারছিলো না। দু-চারজন মৃদু প্রতিবাদ করতে গিয়ে বেত্রাঘাতে জর্জরিত হোলো। কিছুজনকে ধরে এনে আটকে রাখলো আলো-বাতাসহীন জীবনপুর কুঠির পাশের ঘরে।

নীলকরদের শোষণের বিরুদ্ধে এদিকে সারা দেশ জুড়ে নেতৃবৃন্দের প্রতিবাদ উঠেছে। কিছু কিছু বিদেশী ভারতবন্ধু, সংবাদপত্র বিশেষভাবে অমৃতবাজার পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখছেন দেশজুড়ে। চব্বিশ পরগণার শেষ সীমানায় হাবড়ার পথ ধরে আগিয়েও যাওয়া যায় নদীয়ার প্রথম দিকের গ্রাম চৌবেড়িয়ায়। চৌবেড়িয়ার মানুষ দীনবন্ধু মিত্র নীলদর্পণ নাটক লিখলেন ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে। নাটকে গ্রাম বাঙলার চাষীদের ওপর নীলকর সাহেবদের অবর্ণনীয় অত্যাচারের কথাই তুলে ধরা হলো।

এরপর নাটকটি পাদরী লঙ্ সাহেবের তত্বাবধানে কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইংরাজীতে অনুবাদ করেন, সারা দেশের মানুষ ব্যথিত চিত্তে দেখে এ নাটক। কিন্তু ক্ষেপে ওঠে নীলকর সাহেবরা। তারা মামলা করেন লঙ্ সাহেবের বিরুদ্ধে। বিচার চলে সুপ্রিম কোর্টে। বিচারে একমাস জেল ও হাজার টাকা জরিমানা হয়। গৌরবের কথা জনদরদী কালীপ্রসন্ন সিংহ এ টাকা জমা দেন কোর্টে।

এর সামান্য আগে একটা ঘটনা ঘটেছে যা মনে রাখার মত। এক ঐতিহাসিক রায়ের সাথে জড়িয়ে রয়েছে দেগঙ্গার মানুষ। নীলকর সাহেবদের নিপীড়নের বিরুদ্ধে কিছু রায়ত আবেদন করেন বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট লেসলী ইডেনের কাছে। চৌরাশী পরগণার দু'জন সাহসী মানুষ শিবচন্দ্র চ্যাটার্জী ও আমীর বিশ্বাস ছিলেন আবেদনকারীদের মধ্যে। তাঁদের সাহসিকতাপূর্ণ আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ম্যাজিস্ট্রেট লেসলী ইডেনের দেওয়া সেদিনের রায় ছিল ঐতিহাসিক। ১৮৫৯ খ্রীস্টাব্দে ২০শে ফেব্রুয়ারি বারাসাতের এজলাসে বসে এঁর দেওয়া রায় কাঁপিয়ে তুললো সারা দেশকে। মানুষের বন্ধু ইডেন বললেন—

"প্রজারা জমির মালিক, নীলকর নয়। যদি নীলকর সাহেব প্রজার ওপর অত্যাচার করে, আইন প্রজার পক্ষে দাঁড়াবে। নীলকর সাহেবের পক্ষে নয়"।

প্রজা প্রিয় ইডেনের রায়কে অনুসরণ করলো নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ডব্লিউ, জে, হার্শেল। একই ফরমান্ তিনিও জারি করলেন তাঁর জেলাতে।

ইডেন সাহেবের এই রায় নীলকরদের শক্ত ভীত কাঁপিয়ে তুললো। তারা সঙ্ঘবদ্ধভাবে তৈরী করলেন 'প্লান্টার্স এসোসিয়েশন'। স্যার জন পিটার গ্রান্ট বাংলার গভর্ণর হন ১লা মে ১৮৫৯ খৃস্টাব্দে। এসোসিয়েশন পিটার গ্রান্টের কাছে রায়ের বিরুদ্ধে আবেদন করলো। গ্রান্ট প্রথমদিকে সামান্য ইতস্তত করলেও জনরোষের কথা চিন্তা করে মহামান্য ইডেনের বক্তব্যকে সমর্থন করলেন। বাঙলার চাষীরা শুধু খুশি হলো না—হলো উদ্দীপ্ত। নদীয়ার দিগম্বর বিশ্বাস, বিষ্ণুচরণ বিশ্বাসের নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা পৌছোলো বাঙলার ঘরে ঘরে। উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে পাশের কলিঙ্গা, গোবরডাঙ্গা, বাদুড়িয়ার চাষী সম্প্রদায়। সারা বাংলাদেশে ৬০ লক্ষ চাষী প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছিলো এ আন্দোলনে। পদ্মা তীরের গ্রামগুলিতেও সে কথা পৌঁছাতে দেরী হলো না।

ওদিকে দেওয়ান হেরাছতুল্লাও আগে থেকে ফুঁসছিলেন। তিনিও ঠিক এই সময় দেওয়ান পদে ইস্তফা দিলেন। ইতিমধ্যে শক্তিমান লাঠিয়ালরূপে খ্যাত 'কাহার' সম্প্রদায়কে অন্য স্থান থেকে এখানে এনে বসবাস করার জন্য দেওয়ানজী জমি দিলেন রাজুকবেড়িয়াতে। এদের দলের সর্দার ভীমচাঁদ কাহার ছিলো বানু সাহেবের ঘোড়ার সহিস, লাঠিয়াল রূপে তার খ্যাতিও ছিল। সেও সহিদ পদ ত্যাগ করলো। দেওয়ানজী তাকে ইতিমধ্যে নিজের বাগানের 'মালি' নিযুক্ত করেছেন। পদ্মার সেতু পার হয়ে 'মালির বাগান' এখনও রয়েছে।

একদিন মিঃ বানুর নির্মমতা ও প্রচন্ড দাপটকে স্তব্ধ করার জন্য ভীমচাঁদকে সামনে রেখে এক ভয়ানক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন দেওয়ানজী। তখন নসীমপুরের নীলকুঠি খুব রম-রমা। আবার পদ্মার বুকই এখানে খুবই প্রশস্ত। তাই আনন্দ ফূর্তি করার জন্য সাহেব প্রায়ই আসেন এখানে।

মিঃ বানু চলেছে ঘোড়া ছুটিয়ে কলসুরের রাস্তা ধরে নসীমপুরের কুঠিতে। বেলডাঙ্গার কাছে ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভীমচাঁদ হঠাৎ করে সামনে আসতেই ঘোড়া গেল থেমে। থামবেই তো। কারণ সেইতো আসার দিন থেকে ঘোড়াটিকে আদর যত্ন করছে। সাহেবের কিছু বলার আগেই ভীমচাঁদ

একলাফে ঘোড়ার পিঠে উঠে মারলো চাবুক। উর্দ্ধ গতিতে ঘোড়া আবার ছুটতে শুরু করতেই ভীমচাঁদ সাহেবকে মারলো এক লাথি।

আকস্মিকতার জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিল না সাহেব। বেলডাঙ্গার বেলেমাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে রইলো সাহেব। সাংঘাতিক খবর ছড়িয়ে পড়লো চারদিকে। তাড়াতাড়ি মোসায়েবরা সাহেবকে নিয়ে গেল কোলকাতায়। বেশি কিছু হয়নি তবে একখানা হাত ভেঙে গিয়েছিলো বলে শোনা যায়। দীর্ঘদিন সাহেবের কাজকর্ম থাকলো অচল হয়ে। সবাই ভাবলো সাহেব আর আসবে না। কিন্তু সবার ধারণাকে নস্যাৎ করে দিয়ে সাহেব আবার এলো। আসতে তো তাঁকে হবেই শুধুমাত্র লাভের লোভে নয় চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা করার জন্য। তাই বানু এলো তবে আগের মূর্তি নয়, উগ্র রণচন্ডী মূর্তি নিয়ে। লোকে আগে বলতো বানু সাহেব এখন বলে বানু চন্ডাল।

ফিরে এসেই দেওয়ান আর ভীমচাঁদকে চাইলেন শায়েস্তা করতে। তারাও জানতো সাহেব এলে হেস্তনেস্ত করবে। তাই তারা মনেমনে প্রস্তুত ছিলো। সাহেব ভাবগতিক বুঝে কিছু করার সাহস পেলো না। রাগ গিয়ে পড়লো নিরীহ চাষীদের ওপর। নির্যাতন আর পাশবিকতার বলি হলো এরা। গভীর কালো রাতে জীবনপুরের কুঠিতে কান পাতলে এখনও বোধহয় শোনা যাবে সেই সব লাঞ্ছিত, অপমানিত মানুষদের বাঁচতে চাওয়ার আকুল আর্তনাদ।

নীলকরদের পাশবিকতায় এ সময় চাষীকুল বাঙলায় কি রকম ভীত হয়ে উঠেছিলো তার একটা বিবরণ দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক সতীশ চন্দ্র বলেছেন—

একবার বারাসাতের ম্যাজিস্ট্রেট মহামান্য ইডেন সাহেব একটি কুঠি হতে দুই তিনশো গরু খালাস করে এনেছিলো। কিন্তু নীলকরের ভয় এত বেশি ছিলো যে কয়েকদিনের মধ্যে লোকে নিজের গরু নিয়ে যেতে সাহস পায় নি।

কুঠিয়ালও মানুষ, তারাও ধীরে ধীরে ভয় পেলো। তাই বেলডাঙ্গা, নসীমপুরের দিকে না গিয়ে সুবর্ণপুর, পুরকায়েত আটি, চাকলা, সিরাজপুরের দিকে যাতায়াত শুরু করলো।

কিন্তু বানু সাহেব জানতো না যে এ পথেই তার জন্য আরো ভয়ানক বিপদ অপেক্ষা করছে। জরিপ শিকারী মাটিকুমরার শক্ত মানুষ। জরিপের ভিটা এখনও রয়েছে। দুর্ধর্ষ বুদ্ধিদীপ্ত জরিপের কিছু অন্য দোষ ছিল। কিন্তু নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই

করার ব্যাপারে সবার সাথে এক কাট্টা। অভাবনীয় অকল্পনীয় এ কৌশল জরিপকে সামনের সারিতে এনে দিলো।

তিতুমীরের বাঁশের কেল্লার অনুকরণে কিনা বলতে পারবো না তবে পাটকাঠির দীর্ঘ কেল্লা বানালেন জরিপ। বানালেন মাটীকুমরার গ্রামের কাছাকাছি এক স্থানে।

জীবনপুর থেকে চাকলার প্রায় দু-তিন মাইল ধরে দুপাশে পাটকাঠিকে গায়ে গায়ে স্থাপন করা হলো। এখনও পাট ধোয়ার সময় গেলে আংশিক অনুমান করা যায় সে দৃশ্য। সাহেব যখনই সুবর্ণপুর, পুরকাইত আটী, চাকলার কুঠির দিকে যাবে অমনি পাটকাঠির কোলে লুকিয়ে থাকা অনুগামীরা দেবে আগুন ধরিয়ে। সঙ্গে সঙ্গে মুখ দুটোও আটকে দেওয়া হবে। ঘোড়া ভয়ে দিশেহারা হয়ে পথ ঠিক করতে পারবে না। তখনই সাহেবকে জীবন্ত পুড়িয়ে ঝলসানো হবে। অবসান ঘটবে এক নিষ্ঠুর যুগের।

বিশ্বাসঘাতকেরা সব কালেই জন্মায়। চক্রান্তের কথাটা ফাঁস হয়ে গেল। কানে গেল সাহেবের। সত্য মিথ্যা যাচাই করার জন্য কুঠিয়াল বানু সরেজমিনে তদন্ত করতে এলেন, সঙ্গে মেম সাহেব। ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে সাহেব আসছে সংবাদ পেয়ে তাড়াতাড়ি করে জরিপ শিকারীর অনুগামীরা দিলো আগুন ধরিয়ে। আগুনের লেলিহান শিখা দূর দূর গ্রাম থেকেও দেখা গেল। ভয়াবহ কাণ্ড দেখে সাহেব শিউরে উঠলো। তার ওপর মেমসাহেবের কান্না নীলচাষ বন্ধ করে মিঃ বানু স্বদেশের পথে কোলকাতায় দেয় পাড়ি।

না, মিঃ বানু কোলকাতার পথে পাড়ি দেয় নি—জীবনপুর নীলকুঠিতেই তাঁর মৃত্যু হয়, একথাও লেখা রয়েছে কোনো কোনে ঐতিহাসিক গ্রন্থে। সেখানে বলা আছে দেগঙ্গার ৮৪টি গ্রামে ছিল ৫২টি নীলকঠি, জীবনপুরই ছিল তাদের হেডকোয়ার্টার। অদূরে সুবর্ণপুর গ্রাম। সুবর্ণপুরের "পুরকায়েত" পরিবার ফসলেরা চায-আবাদ বাদ দিয়ে নীলচাষ করতে অসম্মত হয় ও বিদ্রোহ করে। "পুরকায়েত আটি" গ্রাম আজো সেই বিদ্রোহী পরিবারের কথা স্মরণ করে। পুরকায়েত পরিবারের প্রধানকে ধরে এনে পুরে রাখা হয় জীবনপুর কুঠির অন্ধকার ঘরে। শুরু হয় বেত্রাঘাত। পুরকায়েত প্রধানের করুণ আর্তনাদেও মন ভেজে না বানু'র। বেত্রাঘাত সহ্য করতে না পেরে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে বৃদ্ধ মানুষটি। কিন্তু তিনিও

জ্বলে ওঠেন শেষবারের মত। মরার আগে মরণ কামড় বসিয়ে দেন অত্যাচারী বানু'র পায়। রক্ত পড়ে ঝরে, শুরু হয় বিষক্রিয়া, শুরু হয় পচনশীলতা। চিকিৎসকের চিকিৎসায় কাজ হলো না কিছুই। পুরকায়েত পরিবার প্রধানের অন্তিম প্রতিরোধে পরাজয় ঘটে পরাক্রান্ত বানু'র—মৃত্যু হয় তার। কিন্তু আজো বেঁচে রয়েছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এলাকার মানুষের পরিকল্পিত ভাবে রুখে দাঁড়ানোর কাহিনী; রয়েছে নীলকুঠী, সুবর্ণপুর কুঠী, বানুকুঠী, সাহেব কুঠী, সিরাজপুর কুঠী, পদ্মার কুঠী, নসীমপুর কুঠী, কুঠীর হাট, মালির বাগান, কেয়াডাঙ্গা কুঠী, সাহেব পুকুর, কুঠী ঘাট এমনি সব আরো কত নাম ও তাদের জীর্ণ ইটের কঙ্কাল।



হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের

১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দ। রাজস্থানের আলোয়ার নগরের প্রাসাদে মহারাজ রাও প্রতাপ সিংহ এক মিউজিয়ম স্থাপন করেন। সেখানে আছে সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী ভাষায় লেখা সাত হাজারেরও বেশি পাণ্ডুলিপি। তার মধ্যে দর্শকদের চোখ যেখানে এসে আটকে যায়—সেস্থান হলো কবি শেখ সাদী'র লেখা 'গুলিস্তানে'র নকল।

অভিভূত হতে হয় দেগঙ্গার কয়েকটি প্রাচীন পরিবারে রক্ষিত মোঘলযুগের দলিল, নবাবী আমলের আদেশনামা, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের স্বাক্ষর যুক্ত একাধিক দানপত্র, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অনুলিপি প্রভৃতি দেখে। অজানা ও রোমাঞ্চকর কথা-বার্তা নিয়ে এগুলি পড়ে আছে কীট-দংশিত দলিল-দস্তাবেজের বাণ্ডিলের মধ্যে। গভীর গবেষণায় সম্ভব এর ইতিবৃত্তের প্রকাশ। আগিয়ে যাই একটি মাত্র পুঁথির আলোচনায়—যার বুকে-মুখে ফুটে উঠেছে বঙ্গ-সংস্কৃতির নিটোল ছবি। ইতিপূর্বে ঐতিহাসিক ডঃ গৌরীশঙ্কর দে পুঁথিখানি নিয়ে আলোচনা করেছেন 'কলসুরের ব্রাত্য সমাজ ও প্রাচীন পুঁথি' প্রবন্ধে।

পুঁথিগুলি সংগৃহীত হয়েছে গ্রাম কলসুর থেকে। সাহিত্যরস সমৃদ্ধ পুঁথিগুলির সংখ্যা তিন। একখানি হলো "সংস্কৃত মহাভারত", দ্বিতীয়টি হলো "কাশীরামদাসের মহাভারত", তৃতীয়টি "সত্যনারায়ণ পাঁচালী"। বিজ্ঞানসম্মত ভাবে সংরক্ষিত না হওয়ায় পুঁথিগুলির অবস্থা করুণ। আলোচনা করি 'সত্যনারায়ণ পাঁচালী'র পুঁথিটি নিয়ে।

"স্বাক্ষর মিদং হারানচাঁদ বিশ্বাস, সাকিম পরগণে বানিয়ার যোগিপুখরিয়া।" বাদুড়িয়া থানার যদুরহাটির গায়ে গা দিয়ে গ্রাম যোগিপুখরই হবে যুগিপুখরিয়া। 'বানিয়ার' সম্ভবত বাদড়িয়ারই নামান্তর। 'মনসামঙ্গল' খ্যাত কবি বিপ্রদাস পিপলাইয়ের বাসভূমি ছিল বাদুড়িয়াতে।

"এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে যে দু'খানি খণ্ডিত পুঁথি বহুদিন সংরক্ষিত আছে সেই দুটি পুঁথিই অনুলিখিত হয়েছিলো বারাসতের কাছাকাছি দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপুকুর) গ্রামে।"

কলসুরের ছিন্ন পুঁথির পাতায় আর যাঁদের নাম পাওয়া যায় তাঁর মধ্যে রয়েছেন ভাষাণ চাঁদ মন্ডল। ঠিকানা লেখা আছে চৌরাশীর কনসোর গ্রাম। বর্তমানে চৌরাশীর শেষ, কলসুরের শুরু, সে সময় কলসুর ছিল চৌরাশী পরগণার অধীন। আবার চৌরাশী ও যুগেপুখুর পদ্মার এপার ওপার। কাব্য অনুরাগই হয়তো একজনকে অপরজনের কাছে টেনে এনেছিল।

একটি পুঁথির লিপিকার রয়েছেন ভাষাণ চাঁদ মন্ডন। পুঁথিতে লেখা রয়েছে—"পুস্তক সমাপ্ত হইল—সন ১২১৭ বারোশত সতরো সনের ২৬ সা পৌষ—মঙ্গলবার বেলা দেড় প্রহরের সময়। মোকামে মন্ডনের বাটির পুর্ব খাজুর-বাগানে বসিয়া পুস্তক সমাপ্ত করিলাম।"

১৭৮ বছর আগের কালে লিপিকাররা বেশ আমেজ প্রিয় ছিলেন। কারণ গৃহ কোণ পরিত্যাগ করে শীতের এক মনোরম দুপুরে তাঁরা বেছে নিয়েছিলেন "খাজুর বাগানকে"। পুঁথির পাতায় রয়েছে অল্প-স্বল্প আঁকা-জোঁকা। এটি শিল্পবোধেরই পরিচয়। সাল, মাস, তারিখ এমনকি সময়ক্ষণ পর্যন্ত উল্লেখ থাকায় পুঁথিটি পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করতে পেরছে। আবার কবি কীর্তি দেখার জন্য সেই দুর্লভ মুহূর্তে উপস্থিত ছিলেন গ্রামস্থ সাহিত্য রসিকেরা। আজকের দিনে হলে কি করতেন জানি না তবে সে দিন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁদের নাম পুঁথিতে লিপিবদ্ধ রয়েছে তাঁরা হলেন—শ্রীআনন্দ চন্দ্র মন্ডন, ওভা নিনকান্ট মন্ডন, ডাঃ গোবিন্দ চন্দ্র মন্ডন, ওভা ভাগবত চরণমন্ডন, ওভা গৌরচাঁদ মন্ডন, ওভা রামচাঁদ মন্ডন, ওভা বদন চাঁদ মন্ডন প্রমুখ।

১৭৭ বছর আগের মন্ডলদের 'কুলজিতে' দেখেছি এঁদের নাম। নামের আগে ওভা কেন? 'ওভা' কি 'শ্রী'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হতো? তাইবা কি করে হবে—কেন না 'শ্রীতো দু একজনের নামের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে। মনে হয় বৈষ্ণবজনেরা "শ্রী"র পরিবর্তে 'ওভা' অর্থাৎ ওঁ ভাগবত ব্যবহার করতেন।

গভীর মন দিয়ে পুঁথিখানি পড়লে আপনার চোখে মুখে ফুটে উঠবে হাসির রেখা। কবির ভাষাতেই বলি—"এই পুস্তক যে চুরি করিবেক তাহার শাশুড়ীর হাত ধরিবেক।" শাশুড়ীর হাত ধরা

নিশ্চয়ই লজ্জাকর। তবে আশা করা যায় এই জাতীয় সতর্কবাণী নিরস্ত করবে অন্যায় কাজ থেকে বিরত থাকতে। সমসাময়িক পুঁথির পাতায় আরো কটু ও অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করতে দেখা গেছে। আবার এমনও দেখা গেছে—চুরি হওয়ার ভয়ে বাইবেল ছিদ্র করে গীর্জা কর্তৃপক্ষ সেটিকে বেঁধে রেখেছেন শেকল দিয়ে।

আধুনিক সভ্যতার বড় বাহন মুদ্রণ যন্ত্র। তাই সে দিনের লিপিকারদের আজ আর কদর নেই কিন্তু এক সময় ছিল তুঙ্গে। আসল পুঁথির দাম অবশ্যই ছিল কিন্তু চোখ জুড়ানো অনুলিপিযুক্ত পুঁথির মূল্য ছিল বেশি। যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর চন্ডীমঙ্গলের আসল পুঁথি কিনেছিলেন পঁচিশ টাকায়। আবার গগণেন্দ্র নাথ ঠাকুর ঐ পুঁথির অনুলিপি কিনেছিলেন দু'শো টাকায়। কলসুরের লিপিকার ভাষাণ চাঁদ মন্ডল, রচনাকার হারাণ চাঁদ বিশ্বাস প্রমুখ সংস্কৃতি-জনেরা মহাকলের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের রেখে যাওয়া পাংশুবর্ণ পুঁথির পাতায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে পল্লী সংস্কৃতির আলপনা আর সে অনুভূতি যেন ধরা পড়ে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতার—

"হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের
পুরানো কাগজ পড়ি ;
আমার নয়নে সহসা পোহায়
সে দিনের বিভাবরী।"



"সতী বেহুলা-ভাসাইল ভেলা"

চাঁদসওদাগর ছিলেন পরম শৈব ও বিত্তশালী বণিক। শিব ব্যতীত কোনো দেবতাকেই তিনি সম্মত নন পূজা করতে। মনসার মত নারী দেবীকে তো নয়ই; কারণ সেক্ষেত্রে তাঁর অনমনীয় পৌরুষ অপমানিত হয়। এমন কি তাঁর ছয় পুত্রের মৃত্যু হয়েছে তবুও তিনি মনসা বিরোধী।

চাঁদসওদাগর ও মনসা কেন্দ্রিক লোককাব্যের শরীরে রয়েছে বাঙলার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বর্ণনা এবং সেই বর্ণনার অনেকাংশে মিলে রয়েছে রাজা চন্দ্রকেতুর দেশ। লোককাব্য বলে চাঁদসওদাগরের বাণিজ্যতরী "মধুকর" বাণিজ্য করতে আসতো চন্দ্রকেতুর দেশে। রাজার দেশের মধ্য দিয়ে মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে সতী বেহুলার ভেলা গিয়েছিলো নেতা ধোপানির ঘাট ছুঁয়ে সুন্দরবনের পথে। এসব তথ্য আভাসিত হয়েছে সতীশচন্দ্র মিত্রের লেখায় ও মধ্যযুগের জনপ্রিয় কাব্য মনসামঙ্গল-এ। দেগঙ্গার দিগন্তে ছড়িয়ে থাকা স্বাক্ষর সমূহ বলিষ্ঠ করেছে পূর্বসূরীদের বক্তব্যকে। আমি অনুসরণ করেছি তাঁদের; অনুমান করে খুঁজেছি হারিয়ে যাওয়া সে পথরেখা।

আর সে পথ খুঁজতে গিয়ে সন্ধান মেলে আর এক বিশিষ্ট কাহিনীর যার সাথে সংযোগ রয়েছে দেগঙ্গার রাজা'র—রাজা চন্দ্রকেতু ছিলেন চাঁদ সওদাগরের সপ্তম ও কনিষ্ঠ পুত্র। চন্দ্রকেতুর সাথে বিয়ে হয় বেহুলার। স্বামী চন্দ্রকেতু ও সতী বেহুলার কথাই মনসামঙ্গল কাব্যের পৃষ্ঠাকে রেখেছে আলোকিত করে।

বাংলাদেশ, ঢাকা থেকে প্রকাশিত কবি শুকুর মাহমুদের পুঁথি নিয়ে আবুল কালাম যাকারিয়া বিরচিত "গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস" গ্রন্থে আবদ্ধ রয়েছে তারই গুরুত্বপূর্ণ সূত্র—"মনসার কাহিনীতে বর্ণিত লখিন্দর বা লখাই চন্দ্রকেতু—গন্ধবণিক চাঁদ সদাগরের সপ্তম ও কনিষ্ঠ পুত্র এবং বেহুলার স্বামী। তাকে (চন্দ্রকেতু) কেন্দ্র করেই মনসার কাহিনী বিরচিত হয়েছে।"

বেহুলা মাজুষ বা ভেলায় করে মৃত স্বামীকে নিয়ে চলেছেন জীবন ফিরে পাওয়ার জন্য। বেহুলার রূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ গোদা তাকে কাছে রাখতে চায়। বিজয় গুপ্ত প্রণীত পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্যে আছে—

"তাবৎ থাকিও গোদা, ফুটিয়া বড়শী
যাবৎ হেথায় আমি ফিরিয়া না আসি"

জীবনপুর-নসীমপুর-কলসুরের মধ্য দিয়ে শুকিয়ে যাওয়া পদ্মার তীরে রয়েছে "গোদা" স্থান। প্রসঙ্গক্রমে এসে পড়ে সুবর্ণপুর গ্রামের কথা। মেদিনীপুরের সুবর্ণরেখা নদী নয় তবে সুবর্ণপুরে ছিল নদীর অস্তিত্ব। সুবর্ণপুর, পাথরঘাটা, পারপাটনা, মনসাদহ, বদরহাট স্মৃতিবহ নামগলি বহন করছে নদী থাকার ইঙ্গিত। পাথারঘাটাতে ছিল নদীতে নামার ঘাট—একথা এখনও বলেন বৃদ্ধ জনেরা।

বৈশিষ্ট্য পূর্ণ নাম মনসাদহ—মনসাদহের সাথে সংযোগ ছিল পদ্মার। "পদ্মার অর্থ মনসা বা সর্প"। আজ মনসাদহের প্রশস্ত বুকে চাষ-আবাদ চলছে। কিন্তু কোনো এক সময় এটি ছিল বেগবতী নদী। তুলে ধরছি ছোট্ট একটা উদাহরণ। প্রায় তিনশো বছর আগেকার কথা। বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে বর্ধমান পরিত্যাগ করে চাকলা গ্রামে এসে বসবাস শুরু করেন রায় পরিবার। পুরাতন নথিপত্তর ঘেঁটে দেখা যায় তাঁদের গৃহ নির্মান প্রয়োজনে কড়ি-বরগার কাঠ এসেছিলো নদীয়ার রাণাঘাট থেকে এবং মনসাদহের ওপর দিয়ে জল পথে নৌকা করে।

ব্যাখ্যা প্রয়োজন পারপাটনা গ্রামের ; পাটনী পারঘাটার মাঝি বা নৌকা করে যে ব্যক্তি যাত্রীকে এপার-ওপার করে। স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে যাওয়ার কালে বেহুলাকে অনেকবার বাধার সম্মুখীন হতে হয়। একবার বিষহরি মনসা পাটনীর ছদ্মবেশে পথ আটকায় বেহুলার—লক্ষ্য বেহুলার স্বামীর মৃতদেহ নিয়ে নেওয়ার। পাথরঘাটা গ্রাম নামের মধ্যে যেমন নদী পারাপারের প্রয়োজনে ঘাট থাকার কথা বলছে তেমনি পারপাটনা ছদ্মবেশী পাটনীর কথাই উচ্চারণ করে। পাশেই হরিণখোলা গ্রাম একদা হরিণদের অভয়ারণ্য ছিল বলে জানা যায় বয়স্কদের মুখে।

জলপথ থাকার ইঙ্গিত বহন করছে আরও একটি নাম। নদীপথে সঙ্কটে পড়লে যাঁর অলৌকিক কৃপায় যাত্রী বা মাঝি রক্ষা পায় তাঁর নামেই সুবর্ণপুরের গায়ে গা দিয়ে গ্রাম বদরহাট। মখদুম শাহ বদরুদ্দীন

বদর আলম যাহিদীই যিনি সাধারণ্যে পরিচিত বদরপীর রূপে। নদীর বুকে চলার সময় মাঝি বা যাত্রীরা যাতে বিপদে না পড়ে, ঝড়-তুফানে যাতে হারিয়ে না যায় তারই জন্য তারা আজো স্মরণ করে বদরপীরের নাম। বৈঠার তালে তালে সুর মিলিয়ে উচ্চারণ করে "বদর 'বদর'।

মনসা মঙ্গল কাব্য রচয়িতাদের অন্যতম ছিলেন বাদুড়িয়ার বিপ্রদাস পিপলাই। বাদুড়িয়া দেগঙ্গার নিকটতম প্রতিবেশী—জল ও স্হলপথে দুটি স্হানের সম্পর্কও ছিল নিবিড়। বিপ্রদাস সহ বাংলার বাইশ কবি রচিত 'পদ্ম-পুরাণ বা মনসামঙ্গল' কাব্যও এ কথা স্পষ্ট করে বলে —"চন্দ্রধর বা চাঁদ সওদাগরের ডিঙ্গা সুন্দরবনের পথে চন্দ্রকেতুর দেশে বাণিজ্য করতে আসতো।" বঙ্গের দক্ষিণাংশে অবস্থিত সকল বন্দরের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল চন্দ্রকেতুর। ফেলে আসা দিনের তাৎপর্যময় সে কথা খুঁজে পাই অতীতের পৃষ্ঠায়—

"সওদাগরের ডিঙ্গা চলে চন্দ্রকেতুর দেশে
শিবেরে বান্দিয়া শিরে চাঁদ চলে শেষে"

বিস্মৃতির অস্পষ্টতায় বিলীন হলেও পর্যবেক্ষণ একথা তুলে ধরে যে মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে সতী বেহুলার ভেলা ভেসেছিল বদর সুবর্ণপুর, পাথরঘাটা, পারপাটনা মনসাদহ ও পদ্মার প্রাণচঞ্চল ঢেউয়ের উত্তালে।

শেষ হয়ে গেছে কত দিন, কত রাত্রি, সুদীর্ঘ সময় পথ—হয়েছে অতিক্রান্ত। তবুও আমাদের আঙিনা আজো সিক্ত বাঙালি হৃদয়ের রমণীয় রসধারায়।



লৌকিক দেবী- বনবিবি

চৈত্রের দুপুর। তেতে উঠেছে রোদ। সারা মাঠ জুড়ে কোথাও দেখা নেই চাষীর। রায়কোলার বিশাল মাঠের মাঝখানে গোলাকার এক-খণ্ড বন। ভয় লাগে প্রবেশ করতে। কিন্ত ভক্তি করে সকলে। গিয়েছিলাম বনবিবির থানে—সাথে আলোকচিত্র শিল্পী।

'বনবিবি নাম তার ভাটির প্রধান
হিন্দু মুসলিমে তাকে জানায় সালাম'

২৪ পরগণার লোকমনে জাগ্রত দেবী বিশেষভাবে সুন্দরবন এলাকার নর-নারীর। দেগঙ্গাও তো একদা ছিলো সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। বনবিবির আরো অনেক নাম আছে যেমন—বনদেবী, বনচণ্ডী, বনষষ্ঠী, অরণ্যদেবী প্রভৃতি। দেগঙ্গার কত গ্রামে যে বনবিবির থান জড়িয়ে রয়েছে তা বলা কঠিন। তার মধ্যে রয়েছে মাটিকুমরা, গাজীতলা, ঢালিপাড়া, শিমুলিয়া, হড়পুকুর, আজিজনগর, নিরামিশা, গ্যাংআটি, দেউলিয়া, রায়কোলা সহ আরো সব গ্রাম। দুই ধর্মের মানুষের কাছে ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রে এমন অনিবচনীয় প্রতিরূপ কমই দেখা যায়।

কেন এই বনবিবির পুজো?

হিংস্র জীব জন্তুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার আশায় পূজিতা হন বনবিবি। সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করার আগে মৌলে, কাঠুরিয়া, নৌজীবীরা মানত করে যায় বনবিবির কাছে। ভালো ভাবে ফিরে এসে তার 'থানে' পুজো দেয় নানা উপাচার নিয়ে। ওপরে দেগঙ্গার যে গ্রামগুলির নাম উল্লেখ করলাম তা ব্যতীত বনবিবির থান রয়েছে মরা পদ্মা ও নদীখাতের ধারবরাবর পল্লীগুলিতে। রায়কোলাতে—রয়েছে বিশাল আকারের বনবিবির বন। কবে থেকে কোন কাল থেকে এ বনবিবিতলার সৃষ্টি কেউ বলতে পারে না। আগে এখানে মানত করে মোরগ ছেড়ে দেওয়া হোত। এখনও এ রীতি প্রচলিত আছে ২৪ পরগণার সর্বত্র। মোরগ ছাড়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে

লোকগবেষক গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু বলেছেন—"সম্ভবত এ প্রথাটি বৌদ্ধ প্রভাবের ফল।" ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে এখনও আছে পাখি কেনার রীতি-নীতি। এগুলি আবার তীর্থস্থানে এনে মুক্তি দেওয়া হয়। মোরগ ছেড়ে দেওয়া তারই বিবর্তিত রূপ বলে বিশ্বাস।

কে এই বনবিবি? কবে থেকেই বা কিভাবে বনবিবি পুজো পেতে শুরু করলো তা নিয়ে চিরায়ত লোক কাহিনীটিই বলি—দক্ষিণ রায় বাঘের দেবতা। বাঘের দেশ সুন্দরবন এলাকায় যে সব মানুষের বসবাস তারা সব সময়ই পুজো করে দক্ষিণ রায়কে। ব্যাপার হলো কি একবার দক্ষিণ রায়ের সাথে বিবাদ বাধলো বনদেবীর। কি ব্যাপার? বনবিবিকে যেন সুন্দরবনের মানুষ বেশি মান্য করছে। রাগ হলো দক্ষিণ রায়ের। দক্ষিণ রায় ঢাল তলোয়ার টাঙ্গি নিয়ে যুদ্ধ করবেন বনবিবির সাথে।

বাধা দিলেন তার মা। তিনি বললেন যুদ্ধ হবে আওরাতে আওরাতে—অর্থাৎ নারীতে নারীতে। কখনই পুরুষের সাথে নারীর যুদ্ধ নয়। কি করবেন দক্ষিণ রায় ভেবে পাচ্ছিলেন না। শেষে পাঠালেন তাঁর স্ত্রী নারায়ণীকে—বনবিবির সাথে যুদ্ধ করতে। অনেকে বলেন নারায়ণী তাঁর স্ত্রী নন দক্ষিণ রায়ের মা। যুদ্ধ বেধে গেল। বড়খাঁ গাজী তখন এলাকার পীর। যুদ্ধ তাঁর আদৌ ভাল লাগে না। তিনি এসে বোঝালেন দু'পক্ষকে যে যুদ্ধ করা ভালো নয়। তাঁর চেষ্টায় যুদ্ধ গেল থেমে। শান্তি ফিরে এলো জলা জঙ্গলময় ভাটি অঞ্চলে। দু'জনেই থাকবে বনে দেবী ও দেবতা হয়ে। সব সম্প্রদায়ের মানুষই তাদের মান্য করবে। সেই থেকেই হিন্দু মুসলমান সৌহার্দ্যের প্রতীক হয়ে রইলো বনদেবী বা বনবিবি।

বর্তমানে রাস্তার পাশে, লোকালয়ে মূর্তি কিম্বা 'থানে' মানত কিম্বা পূজো করার রীতি প্রচলিত হলেও আদিতে ছিলো অন্য ব্যবস্থা। তখন বিরাট কোনো জলা জঙ্গলময় এলাকায় খাল বিল নদীর তীরে কিম্বা বট-অশ্বত্থের তলে পূজা হতো বনবিবির।

সেদিক দিয়ে রায়কোলার মত দেউলিয়ার বনবিবিতলা বহন করছে বহু পুরানোকালের স্পষ্ট ইঙ্গিত। দেউলিয়ার বনবিবিতলা ছিল জাগ্রত। এ নিয়ে আছে এক চমকপ্রদ ঘটনা। দেউলিয়ার বনবিবির প্রাচীন অশ্বত্থগাছের ডাল একবার কেটে ফেলার ফলে জমির মালিক শ্রীউপানন্দ মণ্ডল দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসা করে যখন

সুস্থ হয়ে উঠতে পারছিলেন না তখন বুঝতে পারলেন বনদেবীর ক্ষতি করার জন্যই তাঁর এ অসুস্থতা। তিনি মনে মনে ঠিক করলেন নতুন করে গাছ লাগিয়ে দেবেন। এর পরই তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। দেউলিয়ার গড়ের পাশে বনদেবী তলায় ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন গৃহিনীরা একত্রিত হন সেখানে। বনদেবী বা বনবিবিকে পুজো করলে বাড়ির পশুপক্ষী সহ মানুষজন ভাল থাকবে বলে বিশ্বাস। বন ষষ্ঠীর তলে বসে চিঁড়ে, দই, আম, কাঁঠাল সহযোগে আহারাদি করতো সকলে। এখন অবশ্য গৃহিনীরা সে পাঠ সেরে নেন পাকা রাস্তার ধারের এক মাঠে বসে। মনে হয় কাদা মাটির রাস্তা তাঁরা এড়াতে চান। কিন্তু পুজো পার্বনাদি যথাযথ ভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। গৃহিনীরা বাড়ি ফেরার সময় নিয়ে আসেন এক ঘট জল। তাঁরা বাড়িতে ফিরে না আসা পর্যন্ত নিয়ম নেই আলো জ্বালার। সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে উঠতো সীমন্তিনীদের ঘরে ফেরার পরই। তার আগে বাড়িতে না জ্বালা প্রদীপ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে অন্যজন। বনবিবিতল থেকে ফিরে আসা গৃহিনী উঠানে দাঁড়িয়ে বলেন—

ঘরে নেই কেন গো আলো ?
বাড়ীর মানুষ, গরু আছে সবাই ভালো ?

প্রদীপ হাতে বাড়ীতে অপেক্ষারত অন্য জন বলে ওঠে—

গিন্নি গেছেন বনভোজনে
বাড়ির সবাই আছে ভালো।

এর পর ঘটে করে আনা জল ছিটিয়ে দেয় ঘরের দুয়ারে, শিশুদের মাথায়। ঘরে ঘরে জ্বলে ওঠে সাঁঝের প্রদীপ, বেজে ওঠে সন্ধ্যার শুভ শঙ্খধ্বনি।

রায়কোলার বনবিবি নিয়ে শুনেছি ভয়ঙ্কর কথা। অনেক প্রবীণের সাথে সে কথা শোনালো তরুণ ফজের আলী। বনবিবি'র কাছে মানততো সবাই করে বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য, তার ওপর এক সময় বাঘও আসতো এখানে। হিংস্র নরখাদকের হাল্লুম শব্দে কেঁপে উঠতে সারা এলাকা। ভয়ে শিউরে উঠতো সবাই। কিন্তু ভয় জয় করার মন্ত্রও ছিলো মা ঠাকুরমাদের জানা। পরদিন তাঁরা বনবিবির থানে গিয়ে মানত করে আসতেন। তিনি শুনতেন তাঁর ভক্তদের কথা। বনদেবীর আদেশে গভীর রাত্রে

বাঘ এসে মাথা নোয়াতো তার থানে। তাঁর নির্দেশে মাথা নীচু করে বাঘ চলে যেতো এলাকা ছেড়ে।

যারা এক সময় চেষ্টা করেছে এ বন কেটে ফেলতে তাদের পরিবারের শান্তি হয়েছে বিঘ্নিত। কেউনা কেউ আক্রান্ত হয়েছে দুরারোগ্য রোগে। ধর্মীয় বিশ্বাসের শিকড় মনের অনেক গভীরে। তাই তারা মাটির ওপর আপনা থেকে সৃষ্ট শিকড় উচ্ছেদ করে আপন বিপদ ডেকে আনতে চায় না—বরং বিপদে পড়লে তাঁকে স্মরণ করে উদ্ধার পেতে চায়। সে কথাই লেখা আছে মুন্সি বয়নুদ্দিনের বনবিবির জহুর নামায়—

'আঠার ভাঁটির মধ্যে আমি সবার মা।
মা বলে যে ডাকে তার দুঃখ থাকে না॥
সঙ্কটে পড়িয়া যে বা মা বলে ডাকিবে।
কখনও কোথাও সে বিপদে না পড়িবে॥'



"বাঁচাও বাঁচি-পেঁচো পাঁচী"

বৃষ্টি পড়ছে না মাটিতে। কিন্তু আকাশটা মেঘলা। গিয়েছি পেঁচো পাঁচীর থান্ দেখতে। হাদীপুর, হামাদামা, রামনগর থেকে একটু আগিয়ে পাকা রাস্তা ছেড়ে নেমে পড়ুন মামুরাবাদ—গ্রামের কাঁচা রাস্তায়। আবাদ থেকে এসেছে মামুরাবাদ। এক সময় গ্রামের গা দিয়ে বইতো 'বউলির খাল', মজে গেছে অনেক কাল আগে। গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করতে সঙ্গী হলো একদল বাচ্চা কাচ্চা। পেঁচো পাঁচীর থান কোথায় জিজ্ঞাসা করতেই কে আগে দেখাবে—সেই প্রতিযোগিতা করতে করতে নিয়ে গেল আমাকে।

"পেঁচো বা পাঁচু ঠাকুরের রং কালো। মাথায় জটা, বা ঝুটি করে বাঁধা ·········· চোখ দুটি বেশ বড় বড় ও প্রায় গোলাকার এবং একটু লাল ইত্যাদি।" লোক গবেষক গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসুর দেওয়া বিবরণের মূর্তির রূপ এরকমই। মূর্তি নেই মামুরাবাদে আছে প্রতীক। গ্লাস উল্টো করে বসালে যেমন দেখতে হয় এমনি ভাবে তৈরি দুটি মাটির লম্বাকৃতি খণ্ড। একটি পেঁচোর অপরটি পাঁচীর। পাশে আর দুটি ছোট আকারের এমনি মূর্তি। কেন ও দুটি? জিজ্ঞাসা করতে উত্তর পাওয়া গেল না সঠিক। পুত্র কন্যার হয়ে পুজো দেয়, মানত করে পেঁচো পাঁচীর থানে। কেন? সন্তান না হলে, সন্তান হয়ে না বাঁচেল আর পেঁচোয় পাওয়ার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে, বা দিনে দিনে শিশু শীর্ণকায় হয়ে পড়লে লোকের ধারণা হয় বুঝি পেঁচোয় পেয়েছে, এ সব সমস্যার হাত থেকে মুক্ত করে পেঁচো পাঁচী। শনি, মঙ্গলবার থানে আসেন সকলে। দূর দূরান্তর থেকেও লোকে আসেন ওখানে। দীর্ঘ দিনের সঞ্চিত বিশ্বাস এখানে টেনে আনে ভক্তদের।

তবে মূলতঃ পেঁচো পাঁচী সন্তান না হওয়ার জন্য এবং ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মারা যায় এদের হাত থেকে রক্ষাকারী দেবতা।

অনেক থানে অনেকেই দড়ির সাহায্যে ঢেলা বেঁধে আসেন। ধারণা এর প্রতি পেচো পাঁচীর নজর পড়লে তার মনোবাঞ্ছা পূরণ হবে। মানতও করেন। তবে মানতের বস্তু অতি সাধারণ, দুধ,

বাতাসা, ইত্যাদি। এক কোণে পড়ে আছে কয়েকটি ভাঙ্গাচুরো মূর্তি। মানতের সাথে সাথে এগুলো দিয়ে গেছে। লৌকিক দেব-দেবী পেঁচো-পাঁচী। তাই নেই কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র। তবে ইদানিং কোনো কোনো স্থানে পুরোহিত ডাকা হচ্ছে। শ্লোক পাঠ হচ্ছে। মামুরাবাদে কয়েক পুরুষ ধরে দেখাশোনা করেন একটি পরিবার। ৭০ বছর বয়সে পুঁটে কচি মারা যাওয়ার পর দেখাশোনা করেন তাঁর ভগ্নী রঙ্গিলা বিবি (৩২)। হাসনাবাদ, বাদুড়িয়া, টাকী প্রভৃতি দূরাঞ্চল থেকে বিশ্বাসী নরনারীরা দুখের বোঝা নিয়ে আজও সমবেত হন থানে। হিসেবের অনুমান বলে মামুরাবাদের মাটিতে দুশো বছরের বেশি সময় ধরে রয়েছে পেঁচো পাঁচীর থান। মাঠের একান্তে থানটির দেওয়াল মাটির ঢাকা আছে টালির চাল দিয়ে, তার অবস্থা খুবই সঙ্গীন। থানের আকৃতি মহত্তম নয় কিন্তু জড়িয়ে আছে অনেক মাহাত্ম্য। ভক্তিশ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে মিলেছে মনের আকাঙ্খিত অনেক বস্তু। পেঁচো পাঁচীর থানে মানত করে বেঁচে থাকা শিশুদের অনেকের নাম পঞ্চানন, পাচুগোপাল ইত্যাদি। মানুষের বিশ্বাস অফুরন্ত তাই আজও দেখি শিশুর মাথায় চুল, হাতে বালা। ৩, ৭ কিম্বা ১১ বছর পর পেঁচো পাঁচীর নামে মুণ্ডিত হতে দেখি অনেককে।

লৌকিক দেবতা, কিন্তু ঘটে গেছে অনেক অলৌকিক ঘটনা। নিকট দূর থেকে অগাধ বিশ্বাস নিয়ে আসা সরল প্রাণ নর-নরী মন্ত্র উচ্চারণের ভঙ্গিমায় মনে মনে বলে—

"থানে তোমার মাথা রাখি
কোলে দিও ছা—
হলে তুমি নিও না আর
তোমার পায় দিলাম ঢালি
বাঁচাও বাঁচি, পেঁচো পাঁচী।"



।"শালকে দ"

'শালকে দ'। খনার ঢিপি ধরে মিনিট পনেরো মত হাঁটতে হবে। কুঁচেমোড়ার মোড় থেকে আগিয়ে গেলে মিলবে পদ্মার মৃত শাখা। মৃত হলেও সবাই এখনো একে ডাকে পদ্মা বলে। পদ্মার ধার বরাবর পূর্বদিকে আগিয়ে গিয়ে দাঁড়ান চিকিৎসক 'তারক ঘোষের' তৈরি পোলের কাছে। দেখবেন দূর থেকে একসারি নারকেল গাছ আপনাকে দেখে মাথা দুলিয়ে আনন্দ প্রকাশ করছে। এখানে দাঁড়িয়ে যে কোনো গ্রামবাসীকে জিজ্ঞাসা করলেই দেখিয়ে দেবে কিংবদন্তীর বেড়াজালে আবদ্ধ একখন্ড জমি।

আল্লাহ-প্রেমিক দরবেশ অনেক যোজন পেরিয়ে পৌঁছেছেন রায়কোলা গ্রামে। সেখান থেকে রওনা দিয়েছেন দেউলিয়ার রাজার উদ্দেশে। তাঁর ইচ্ছা রাজার সাথে সাক্ষাৎ করে আলোচনা করবেন ধর্মের নানা দিক নিয়ে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন পদ্মার তীরে এসে। ওপার এয়াজপুরে যেতে পারছেন না। এয়াজপুর পার হতে না পারলে রাজার কাছে পৌঁছানো কঠিন। পদ্মার দুরন্ত ঢেউ তাঁর বড় প্রতিবন্ধক। তার ওপর চওড়া তো আছেই। একটা কথা সত্যি এক সময় দূর-দূরান্তর থেকে বড় ছোট নৌকা এসে এখানে নোঙর করতো। রাত্রির মত বিশ্রাম করতো এখানে। নৌকাগুলোকে বেঁধে রাখতো তেঁতুল গাছের গুঁড়িতে। কাছি বাঁধার দাগের ক্ষত দেখেছি তেঁতুল গাছের গায়ে। বর্তমানে অবশ্য গাছটি কেটে ফেলা হয়েছে।

যা হোক দরবেশকে পদ্মা তো পার হতেই হবে। সিদ্ধ সাধক তিনি। হাঁটা শুরু করলেন পদ্মার জলের ওপর দিয়ে। দুর্ভাগ্য নদীর মাঝখানে এসে তাঁর প্রিয় সাথী শালিখ পাখিটি হাত থেকে গেল জলে পড়ে। ডুবে মারা গেল পাখিটি। যেখানে পড়ে গেল সেখানে সৃষ্টি হলো গভীর খাত। সে স্থানটির নাম হলো 'শালকে দ'। আসলে কথাটি হলো 'শালিখ দহ'—'শালকে দ'

তার অপভ্রংশ রূপ। 'দ' কথার অর্থই হলো—"নদীর গভীর জলস্থান।"

অন্যজনে একটু অন্য গল্প বলেন। দরবেশকে যেতে হবে ওপারে। এখানে নদী কতখানি গভীর ও চওড়া তাঁর জানা দরকার। তাঁর প্রিয় সাথী শালিখের কানে কানে কি যেন বলে তাকে ছেড়ে দিলেন। ওপার থেকে এপারে ফিরে এলেই সব বোঝা যাবে। কিন্তু না তাঁর প্রিয় শালিখ আর ফিরে এলো না। ফেরার পথে নদীর মাঝখানে সে গেল পড়ে। ডুবে গেল সবার সামনেই। ডোবার যায়গাটি হলো আরো গভীর। কিন্তু দরবেশের ক্ষমতা তো অলৌকিক। তিনি মন্ত্র বলে গভীর স্থানটি দিলেন ভর্তি করে। জল শুকিয়ে তৈরি হলো ডাঙ্গা। চুরাশিটি গ্রাম তৈরি হলো তার ওপর। চৌরাশী নাকি তারই মধ্যে একটি গ্রাম।

আরও একটি কল্পকথা আছে 'শালকে দ' নিয়ে। দরবেশ তাঁর দৈব ক্ষমতা বলে শালিখের পিঠে চেপে পার হচ্ছিলেন পদ্মা। মাঝখানে এসে ডুবে যায় তাঁর বাহনটি। ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি। তাঁর অভিশাপে, শালিখ যেখানে ডুবে গেলো—জায়গাটা গেল শুকিয়ে। সৃষ্টি হল চর। তারই ওপরই বর্তমানের সব গ্রাম। শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে। স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ ভুলে গেছে সব কথা। কিন্তু ভোলেনি পদ্মার ওপর একখন্ড মাটির সাথে বিজড়িত 'শালকে দ' র গল্পকথা।



বিপ্লবী যতীন্দ্র মোহন রায়

"আপনি যে একান্নবর্তী পরিবার সৃষ্টি করেছেন"—একবার উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহনের সেবাকার্য দেখে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় এ উক্তি করেছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। বিপ্লবী যতীন্দ্রমোহন একদিকে ছিলেন পরম গান্ধীবাদী অপরদিকে বাংলাদেশের বগুড়া জেলাতে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গণমঙ্গল' ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়। গ্রাম চাকলাকে তিনি সাময়িকভাবে বেছে নিয়েছিলেন কার্যক্ষেত্র রূপে। চাকলাবাসীদের তিনি চেষ্টা করেন ইংরাজদের বিরুদ্ধে জাগিয়ে তোলার। এখানে তিনি প্রচলন করেন মুষ্টি ভিক্ষা প্রথা ও শিক্ষাদেন চরকায় সুতা কাটার। চাকলাতে এ সময় বিপ্লবীদের মধ্যে কারা আসতেন জানা যায়নি বটে কিন্তু তাঁর 'গণমঙ্গল' পরিদর্শন করেছেন মহাত্মা গান্ধী, কবি নজরুল ইসলাম, সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত, চারণ কবি মুকুন্দ দাস প্রমুখ বরেণ্য ব্যক্তিবৃন্দ। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের অপরাধে ইংরাজ সরকার তাঁকে বিভিন্ন সময় আটক রাখেন বাংলার বিভিন্ন কারাগারে। পুরাতন নথিপত্তরে দেখা যায় যে তাকে বেশ কিছু দিন আটক রাখা হয় দেগঙ্গা থানাতেও। সম্ভবত সেটি হবে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ।



আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

বর্তমান প্রজন্ম জানতে না পারলেও একথা সত্য প্রাক্-স্বাধীনতা কালে বাংলার কুটিরশিল্প জগতে দেউলিয়ার একটা বিশেষ স্থান ছিলো। এক সময় বিশেষ কদর ছিলো এখানকার কাঠের ঘানিতে প্রস্তুত সরিষার তেল ও চরকায় এবং তকলিতে কাটা সুতা'র। সে সময় ১১০ খানা'র মত ঘানি চলতো এ গ্রামে। উৎপাদিত দ্রব্য সামগ্রী যেমন বাইরেও যেত তেমনি 'খাদি প্রতিষ্ঠানের' মাধ্যমে বিক্রয় হতো দেউলিয়াতেও। ইংরাজদের কাছে তখন খাদি দ্রব্য ছিল চক্ষুশূল। যদিও শেষ পর্যন্ত কুটির শিল্প টিঁকে থাকতে পারেনি কলের সাথে প্রতিযোগিতা করে।

স্বাধীনতা যজ্ঞের পুরোহিতেরা বিভিন্ন সময়ে দেউলিয়াতে এসেছেন এখানকার কার্যাদি দেখাশোনা করতে। কুটির শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে 'খাদি প্রতিষ্ঠানের' উদ্যোগে দেউলিয়াতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ২৬ মার্চ। সে সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন বাংলার গান্ধী সতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ও তাঁর স্ত্রী হেমপ্রভা দেবী এবং দেশপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আনন্দ অনুভব করি সেদিন দেউলিয়া গ্রামের মাটিতে বরেণ্য মানুষদের উপস্থিতির কথা স্মরণে এনে।



একটি স্মরণীয় গ্রাম
একজন অবিস্মরণীয় ব্যক্তি

সেকথা ১৯৬৭-৬৮ সালের। সংবাদপত্রের শিরোনামায় না হলেও একস্থানে প্রকাশিত সংবাদ দৃষ্টি আকর্ষণ করে ইতিহাস অনুরাগীদের। সরকারী উদ্যোগে 'টেস্ট রিলিফে' মাটি-কাটার সময় কোদালের আগায় উঠে আসে কয়েকটি পোড়ামাটির মূর্তি। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে এ গ্রাম থেকেই সংগৃহীত হয়েছে মৌর্যযুগের মুদ্রা, শুঙ্গ-কুষাণকালের মিথুন ফলক, পালযুগের দেবী-দুর্গার মৃন্ময় মূর্তি। নির্মান কৌশলে এগুলি স্মরণ করিয়ে দিয়েছে প্রাচীনকালের রীতি-নীতির বৈশিষ্ট্যাকে।

গ্রামের নাম ঝিকরা। "জাক্রা" রূপেও উল্লেখিত হয়েছে কোনো কোনো গ্রন্থে। বিশ্ববিশ্রুত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাতেও অমর হয়ে রয়েছে ঝিকরা বা জাক্রার কথা। ঐতিহাসিক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন "১৯০৯ খৃস্টাব্দে জিলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত 'জাক্রায়' এই জাতীয় ছয়টি মুদ্রা আবিস্কৃত হয়েছিলো।"

ঐতিহাসিক ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের 'বাঙলার ইতিহাস' (আদিপর্বে) দেখি—"বাংলাদেশে ২৪ পরগণার 'জাক্রা' এবং বেড়াচাঁপায় এই ধরণের রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের নানা স্থানে প্রাপ্ত এই জাতীয় মুদ্রার নিকট আত্মীয়তা ধরা পড়ে।"

এখানকার ভুমি থেকে পাওয়া আরো যে নিদর্শন আমাদের চমকে দেয় তা হলো, ঝিকরা ও এরই গায়ে গা দিয়ে গড়ে ওঠা গ্রাম বাসাবাটির পুষ্করিণী শুকিয়ে গেলে দেখা যায় গৃহের প্রাচীর ও ছাদ। ভূগর্ভে আরো দেখা যায় বিশাল হর্মের ধ্বংসাবশেষ। অবাক হতে হয় এই কথা ভেবে যে—এ সকল সম্পদ সমূহের রহস্য উদ্ঘাটনে উদ্যোগী হননি কেউ বা মূল্যায়ণও হয়নি পুরোপুরী।

আপাতত স্মরণ করি এক ব্যক্তিকে যাঁর খুব মনোহর ঘ্রাণ নিয়ে খুশি হয়েছিলো বাঙলার সংস্কৃত ও সংস্কৃতি জগৎ, যিনি একদা স্মরণীয় হয়েও আজ বিস্মৃত।

তখন ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ নব্য কালচারের নামে এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে চলছে বেলেল্লপনা। নব সভ্যতার নামাবলী গায়ে চড়িয়ে অসৌজন্যতার প্রকট প্রকাশ, করণ সুধাই যখন বিলাসী বাবুদের একমাত্র আনন্দের কারণ বাবুদের, সেই সময় 'বারুণী বিলাস' গ্রন্থখানি বিরাট ঝড় তুললো সমাজে; ভিমরুলের চাকে ঢিল মারার মত ছটফট শুরু করলো একদল বাবু। চারদিক দিয়ে লেখকের উদ্দেশ্যে বর্ষিত হতে লাগলো কটু বাক্য। শেষ পর্যন্ত সংশয়ও দেখা দিল লেখকের জীবনের ওপর। লেখক সফল শিক্ষকও বটে। কৃতি ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা জানকী ভট্টাচার্য, জাতীয়তাবাদী নেতা ব্রহ্মবান্ধব, বাংলায় মহাভারত লেখক কালীপ্রসন্ন সিংহ পুত্র বিজয় সিংহ প্রমুখ। তিনি বিজয় সিংহের গৃহ শিক্ষকও ছিলেন।

কালীপ্রসন্ন সিংহের কানে গৃহ শিক্ষকের বিপদের কথা পেঁৗছোলে তিনি শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করেন রাত্রে পড়ানোর পর বাড়ি ফেরার সময় তাঁর ব্যক্তিগত গাড়িটি ব্যবহার করতে।

লেখকের আরো কিছু গ্রন্থ এ সময় পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলো। গ্রন্থগুলি 'চন্দ্রহাস' 'মহাভারতের সুখশশী আজ যবন কবলে' 'মদভ্রম' ইত্যাদি। পণ্ডিতজনের প্রশংসা লাভ করেছিলো 'রঘুবংশ', কুমার সম্ভব-এর টীকা গ্রন্থগুলি। যার দু-চারটি কিছুদিন আগেও দেখা গেছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।

মাত্র কুড়ি বছর বয়সে বিপুল পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি উপাধি পান 'বিদ্যারত্ন'। যাঁর কথা বলছি ইনি নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্ন। বাড়ি ঝিকরা-সাধারণ্যে অখ্যাত হলেও অনেক খ্যাত কীর্তির ধারক এ গ্রাম। নবীন চন্দ্র ছিলেন মহা পণ্ডিত। পিতা শ্রীনাথ ন্যায় পঞ্চাননও ছিলেন শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ। এ সব কথা হচ্ছিলো নবীন চন্দ্রের ঝিকরার ভিটায় বসে তাঁর উত্তর পুরুষদের সাথে।

নবীন চন্দ্র পণ্ডিতের পূর্ব পুরুষদের আবাস ভূমি ছিল সংস্কৃত চর্চা ও শাস্ত্র শিক্ষার পীঠস্থান হুগলীর গুপ্তিপাড়াতে। সেখান থেকে তাঁর পূর্ব পুরুষ রুদ্রেশ্বরকে কুলপুরোহিত করে নিয়ে আসেন পাশের গ্রাম আজিজনগরের জমিদার দেওয়ান মাধব চৌধুরী। তখন গুপ্তিপাড়া লঘু অর্থে মেয়েদের 'চোপা'র জন্য শুধু মাত্র নয়,

তার খ্যাতি শাস্ত্র শিক্ষায়ও। সে সময় বাংলার অকসফোর্ড নবদ্বীপ, নৈহাটী, ভাটপাড়া, গুপ্তিপাড়ার পণ্ডিতজনেরাই বাংলার শাস্ত্র ও সংস্কৃত জগৎ আলো করে রাখতেন। নবীন চন্দ্র শুধু মাত্র বংশ সূত্রে পণ্ডিত নন তিনি ছিলেন লেখক, টীকাকার, সমাজ সংস্কারক ও সফল শিক্ষকও বটে।

১৮৭২-এ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যাসাগর কলেজের তখন নাম ছিল মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বিদ্যারত্ন দীর্ঘ দিন সুনামের সাথে বিদ্যাসাগর কলেজ অধ্যাপনা করেন। 'মেট্রোপলিটন কলেজ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়' প্রবন্ধে কালীকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য উল্লেখ করেছেন, "যৎকালে সারদা রঞ্জন ও আমি মেট্রোপলিটন কলেজে প্রবেশ করি তখন কলেজের অবস্থা অতি সুন্দর, পি, কে, লাহিড়ী, এন, ঘোষ, বৈদ্যনাথ বসু, ক্ষুদিরাম বসু, পণ্ডিত নবীনচন্দ্র প্রভৃতি সুবিখ্যাত অধ্যাপকদিগের অধ্যাপনায় কলেজের এমন খ্যাতি বাহির হইয়াছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজও ইহার নিকট হীন বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।" তৎকালীন সময়ে শিক্ষকদের পঠন-পাঠন নিয়ে একটি ছাত্রের স্বীকারোক্তির কথাও উল্লেখ করেছেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় "আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম। আপনাদের পি, কে, লাহিড়ী যেমন ইংরাজী পড়ান, নবীন পণ্ডিত মহাশর সেরূপ সংস্কৃত পড়ান..............। এরূপ কুত্রাপি হয় না। সেইজন্য প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছি।" শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত মূল্যবান সংখ্যা 'বিদ্যাসাগর কলেজ স্মরণিকা' (১৮৭২-১৯৭২)-তে লিপিবদ্ধ রয়েছে—

The Institution was served by such eminent teachers as Sir Surendranath Banerjee, Prasanna Kumar Lahiri, Navin Chandra Vidyaratna, Nagendra Nath Ghosh, Sarada Ranjan Roy etc.

শুধু তাই নয়, আমরা বিদ্যারত্ন সম্পর্কে আরো জানতে পারি জাতীয়তাবাদী নেতা ও দেশ প্রেমিক সাংবাদিক ব্রহ্মবান্ধবের লেখনী থেকে। ১৮৭৮ খৃস্টাব্দে তিনি ছিলেন এখানকার এফ, এ ক্লাশের ছাত্র। স্মৃতি চারণায় শ্রদ্ধা সহকারে তিনি বলেছেন—

"The teaching was very good indeed. Suren Banerjee, Prasanna Lahiri, Navin Vidyaratna were our teachers. The College was running well" (Vidyasagar College Centenary Commemoration Volume).

বাগ্মী, দেশ নেতা সুরেন ব্যানার্জীকে তিনি সহকর্মীরূপে পেয়েছেন। এটা একটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে বিদ্যাসাগরের সাথে অধ্যাপকদের মতভেদ ঘটলেও অনেকেই ইনস্টিটিউশন ছেড়ে চলে গেছেন—যান্নি বিদ্যারত্ন। নবীন চন্দ্র শুধুমাত্র বিদ্যাসাগরের সহকর্মী নন বান্ধবও ছিলেন। নবীন চন্দ্রের স্ত্রীর অমৃতসম রান্না বিদ্যাসাগরের কাছে ছিল পরম উপাদেয়।

প্রসঙ্গ ক্রমে নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্নের পূর্ব পুরুষদের তেজস্বিতার কথা উল্লেখ না করে পারছি না। নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্রের দানের কথা সর্বজন বিদিত। কবিতা, কাব্যে, গল্পে তাঁর বিপুল দানের কথা স্থান পেয়েছে। কিন্তু এমন ঘটনা বিরল হলেও দেখা যায় যে নদীয়া রাজের দানও প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। বিদ্যারত্নের পূর্বপুরুষ দানকে অনুগ্রহ মনে করে 'ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি' গ্রহণ করতে অসম্মত হন। মহারাজ কৃষ্ণ চন্দ্র এই প্রত্যাখ্যানে অসম্মান বোধ করেন। ফলে ঝিকরার টোল পরিচালনার জন্য প্রদত্ত অনুদান বন্ধ করে দেন। পরে বৈদ্যবাটির জমিদার একথা জানতে পেরে টোল পরিচালনার সাহায্যে আগিয়ে আসেন। কারো অজানা নয় যে আগেকার দিনে রাজা-মহারাজা-জমিদারদের সক্রিয় পৃষ্ঠ-পোষকতার ফলে টোল, চতুষ্পাঠী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানগুলি বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছিল। এই গ্রামের বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক ইতিহাস রসিক হরেন্দ্র নাথ মিত্র গ্রামটি প্রদক্ষিণকালে এক স্মৃতি চিহ্নহীন স্থান দেখিয়ে বললেন—"ওখানেই একদা বসতো চতুষ্পাঠী, টোল"। দূর-দূরান্তর থেকে ঝিকরার মাটিতে বিদ্যার্থীরা আসতো নানা শিক্ষার আশায়। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের জন্মধন্য বাদুড়িয়ার কাছে পুঁড়াগ্রামের বিখ্যাত ন্যায়রত্ন পন্ডিত ঝিকরার চতুষ্পাঠী থেকেই শিক্ষিত হয়েছিলেন। আরো একটুকরো সংবাদ কণা গৌরবান্বিত করে আমাদের—নবীন চন্দ্র বিদ্যারত্নের পূর্বপুরুষরাই নাকি জগদ্ধাত্রী পূজার মন্ত্রাদি প্রথম রচনা করেন।

হারিয়ে গেছে ঝিকরার সারস্বত সমাজ, ধূসর হয়ে এসেছে বঙ্গখ্যাত বংশের কিতিবাস কাহিনী। প্রাচীন নিদর্শনেরও মূল্যায়ণ হয়নি। তবুও মনকে বিভোর করে রাখে ঝিকরার ঝিলমিল করা একরাশ সুখ স্মৃতি।



গঙ্গেশ্বর শিব

৬০৬ খ্রীস্টাব্দ। সে সময় গৌড়-রাষ্ট্রের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। গৌড় নামের সাথে জড়িয়ে আছে বাঙালী হৃদয়ের অনেক আবেগ। গৌড় রাজ্যের রাজধানী ছিলো মুর্শিদাবাদের কর্ণ সুবর্ণ। সেখানকার মাটি খুঁড়েও পাওয়া গেছে প্রাচীন ইতিহাসের বহু মূল্যবান নিদর্শন। সে সময় ২৪ পরগণার এসব এলাকাও ছিল গৌড়-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। গৌড় রাজ শশাঙ্ক ছিলেন পরম শৈব। শিবই তাঁর উপাস্য দেবতা। তাঁর সময় ভাটা পড়ে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও প্রসারের। তিনি সমতটের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠা করেন শিব-বিগ্রহ। দেগঙ্গাও তার মধ্যে একটি। মানুষের হৃদয়ে দেগঙ্গার শিব ছিল সু-প্রতিষ্ঠিত। অতীত ঐতিহ্যকে স্মরণ করে স্থানীয়রা "গঙ্গেশ্বর শিব" বিগ্রহ স্থাপনে উদ্যোগী হলে— অতীত উজ্জ্বল হবে বর্তমানের ছোঁয়ায়।

মহারাজ শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত শিব বিগ্রহ সমূহের মধ্যে ৬টির মাহাত্ম্যের কথা ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। অনেকে বলেন ৫টির কথাও। সুদূর অতীতে স্থাপিত সে ৫টি মূর্তির মধ্যে রয়েছে কুশদহে যমুনা নদীরতটে লাউপালায় একটি। গোবরডাঙ্গা, ইছাপুর, চারঘাট প্রভৃতি এলাকা নিয়ে গঠিত ছিল কুশদহ। অপরটি অম্বুলিঙ্গ শিব যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিলো হাতিয়াগড়ে; তৃতীয়টি কালীঘাটে নকুলেশ্বর শিব; দেগঙ্গায় গঙ্গেশ্বর শিব ও গাইঘাটায় জলেশ্বর নামক স্থানে জলেশ্বর শিব। অবশ্য একথাও শোনা যায় জলেশ্বর শিব মন্দিরটি স্থাপন করেন জলেশ্বরের রাজা কাশীনাথ রায়। রাজা শশাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত দেগঙ্গার "গঙ্গেশ্বর শিব" দর্শন করে পুণ্য প্রয়াসীরা সঞ্চয় করতো অক্ষয় পুণ্য। ভক্ত হৃদয়ে তাঁর আসন ছিলো সুগভীর। সুদূর সে দিনে তাঁর অপরূপ লীলাকে কেন্দ্র করে দেগঙ্গা হয়ে উঠেছিলো এক তীর্থ ক্ষেত্র।

দেগঙ্গার ঠিক কোনস্থানটিতে দেব-মন্দিরটি অবস্থিত ছিল তার সঠিক নিশানা ঠিক করতে না পারলেও অনুমিত হয়েছে গ্রাম

জামালপুরে সে মন্দির থাকার কথা। জামালপুরে মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ধ্বংসস্তূপ যেটি যুগ-যুগান্তর ব্যাপী কথিত হয়ে আসছে শিব মন্দির নামে। তবে সে গৌরবময় নিদর্শন আজ অন্ধকারের সাথে আলিঙ্গন করলেও সূর্যের মত দীপ্তি নিয়ে একদা দেগঙ্গায় বিরাজিত গঙ্গেশ্বর শিবের সংবাদে পরম পুলকে উজ্জীবিত হয়ে ওঠে আমাদের মন। ইতিহাসও তেরোশ বছর ধরে তার পৃষ্ঠায় সে মহিমাময় ছবিকে ধরে রেখে পেয়েছে অনাবিল আনন্দ ঃ

"হিন্দু ধর্মে শ্রদ্ধা গভীর
শশাঙ্ক নৃপবর
মিলিল দ্বিগঙ্গা নগরে
শিব গঙ্গেশ্বর"।



সাধনায় সিদ্ধ পীর আকবর শহীদ

ভুল বোঝাবুঝি শুরু হয়েছে গ্রামের মানুষদের মধ্যে। অনেককাল আগে থেকে চলে আসা হাটটি উঠে যাবে অন্যত্র। শেষ পর্যন্ত মীমাংসার আশায় ব্যাপারটি গেল বারাসাত কোর্টে। তখন ইংরাজ আমল, বিচারক মিঃ পি, রায় এলেন সরেজমিনে তদন্ত করতে। আধুনিক যানবাহনের প্রশ্নই ওঠে না। বিচারক এসেছেন সাইকেলে করে। যখন সোহাইতে পৌঁছোলেন তখন সাঁঝের জ্যোৎস্না তার সাদা রঙে ঢেকে ফেলেছে জঙ্গলময় এলাকাটাকে। লোকজন নেই। ভয় ভয় করছে তাঁর। দাঁড়ালেন সেই হাটের আঙিনায় অবস্থিত এক সমাধির সামনে। তিনি বিস্মিত হলেন এক অলৌকিক দৃশ্য দেখে। তিনি দেখলেন তাঁর

সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক শুভ্র শ্মশ্রুমন্ডিত কেশধারী পুরুষ। কোনো কথা নেই। শুধু মৃদু হাসি ঘিরে রয়েছে সমগ্র মুখ মন্ডলে। ধীরে ধীরে তিনি আবার অন্তর্হিত হলেন। ইতিমধ্যে বিচারক এসেছেন শুনে গ্রামের সবাই এসেছেন। এঁরা কিছু বলতে চান মহামান্য বিচারককে। "কিন্তু না কারো কাছ থেকে আর শোনার নেই। যা করার আমি করবো।"—বলে সঙ্গী সাথীদের নিয়ে সাইকেলে করে আবার রওনা দিলেন বারাসতের উদ্দেশ্যে। এমন অলৌকিক ঘটনা ঘটেছিল পীর সঈদ দাউদ আকবরের সমাধির সম্মুখে। ছশো বছর আগেকার কথা। সুদূর আরব দেশ থেকে ২২ জন মুসলিম সন্ত এসেছিলেন দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায়। উদ্দেশ্য ইসলামের মর্মবাণী তুলে ধরার। সঈদ দাউদ আকবর তাঁদের মধ্যে একজন। দাউদ আকবর বেছে নেন শান্ত নির্জ্জন সোহাইকে ধর্ম সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে। ধীরে ধীরে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন 'গোরা সঈদ' নামে। অনেকের ধারনায় সঈদ থেকেই 'সোহাই' নামের উৎপত্তি।

ভিন্ন পরিসরে দেখা যায় বাইশ জন সম্প্রচারকের অন্যতম ও নেতা পীর আববাস আলীর সাথে যুদ্ধ বাধে সুন্দরবনের রাক্ষসদের রাজা আকানন্দ ও বাকানন্দের। আকানন্দ ও বাকানন্দ দুই ভাই। যুদ্ধে পীরের অস্ত্রে নিহত হয় আকানন্দ। কিন্তু ভাই বাকানন্দের অস্ত্রে গুরুতর আহত হন পীর আব্বাস আলী। তখন তিনি নিজের চিকিৎসার ব্যাপারে সুপরামর্শের জন্য তাঁর একান্ত এক আপনজনকে পাঠান গোরা সঈদের কাছে। পীর সঈদ আব্বাস আলীর আহত হওয়ার সংবাদ শুনে—

"একথা শুনি সঈদ কাঁদিয়া ওঠে
অশ্বলয়ে দ্রুত লয়ে হেতে গড়ে ছোটে।"

দুই পীর হন একত্রিত। নানা বিষয়ে গোরা সঈদ তাঁর সাথে আলোচনা করে ফিরে আসেন আপন আস্তানা সোহাইতে। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মাজার দেখাশোনার দায়িত্ব রয়েছে কাজী পরিবারের ওপর। খাদিমদার গোলাম মোস্তাফা শাজীর বয়স আশি বছর। আগে প্রতি বছর ৬ই মাঘ মেলা বসতো এখন আর বসে না।

শনি, বুধবারে হাট বসে। শুধু দেগঙ্গা বা ২৪ পরগণার নয় সমগ্র পশ্চিমবাংলার প্রাচীন হাটগুলির মধ্যে সোহাই অন্যতম।

কেন না এখানকার হাট বসা শুরু হয় গোরা সঈদের মৃত্যুর পর থেকে। পুঁথিপত্তর দেখে একথা মোটামুটি বলা যায় পীর সঈদের মৃত্যু হয় বাংলা ৭৬১-৬২ সাল নাগাদ। ৬০০ বছরের অধিক কাল ধরে হাট বসার সংখ্যা পশ্চিমবাংলায় খুবই কম।

পরবর্তীকালে নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান থেকে এঁরাও বঞ্চিত হন নি। দরগাকে সুষ্ঠভাবে পরিচালনা করার জন্য মহারাজ দান করেন শতাধিক বিঘা জমি। বর্তমানে অবশ্য সামান্য কয়েক কাঠা জমি ছাড়া কিছুই নেই।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ মানত, হাজত করেন এখানে। দরগা ঘিরে ঘটে গেছে কত অলৌকিক, কত আশ্চর্য ঘটনা। সে সব কথা এখনও বলতে পারেন গ্রামের প্রবীণেরা। অসুখ বিসুখ থেকে মুক্তির অদম্য আশা নিয়ে আসা ভক্তগণ প্রতি বৃহস্পতিবার বিকালে দরগায় রেখে যান তেল-পানি। পৃথক পৃথক দুটি পাত্রে ধরা থাকে এগুলি। খাদিম বা কোনো ফকিরের প্রয়োজন হয় না মন্ত্রপূতঃ করার। যে যাঁর পাত্র ফেরৎ নিয়ে যান শুক্রবার বিকালে। বাড়ি ফিরে তাঁরা তেল-পানি ব্যবহার করেন। আধি-ব্যাধির হাত থেকে আরোগ্য হওয়া নর-নারীর সংখ্যাও কম নয়। পীর সঈদের মহিমাকে কেন্দ্র করে সুদূর অতীত থেকে এখানকার ধূলিকণায় যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস প্রবাহিত হওয়া শুরু হয়েছিল—সমান ধারায় আজো তা প্রবহমান।



তালপাতার ছাতার তলায় বসে আছেন পন্ডিতমন্ডলী

বারাসাত-বসিরহাট-টাকী-হাসনাবাদ ব্রডগেজ রেল লাইন ধরে বিংশ শতাব্দীর এক দ্রুত যান ছুটে চলেছে। কিন্তু থমকে দাঁড়িয়ে আছে অদূরে একটি গ্রাম আজিজনগর ঘিরে শোনার মত কয়েক টুকরো কথা। কথাগুলি পুরানো দিনের। কে যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে, শুনতে বলে ১২৬৬ সালের সেই পর্বটি। স্বর্গত রাধামোহন ছিলেন তদানীন্তন বাংলা তথা ভারতের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। জীবনে অর্থ উপার্জনের পাশাপাশি পরার্থে দান ও দেবসেবার জন্য অর্থ ব্যয়ের দৃষ্টান্তও তিনি প্রচুর রেখে গেছেন। স্বর্গত রাধামোহন চৌধুরী গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রাধামোহনেশ্বরীও ত্রৈলোক্য মোহিনীশ্বরী মন্দির দুটি। পুণ্য সঞ্চয়ের মানসে শুধুমাত্র দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেই তিনি বিরত হন নি। "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়"—আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যয় করেছিলেন অনেক অর্থ এবং সঙ্গে মানসিক উদ্যমের একটি বড় অংশ। একালের ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী দুনিয়ায় আর একটা কথা অবিশ্বাস্য ঠেকলেও একথা সম্পূর্ণ সত্য সে যদি কোনদিন কোন মধ্যাহ্নে তাঁর গ্রামে একটি মানুষও অভুক্ত থাকতো তবে তিনি ঐ নিরন্ন মানুষটির ক্ষুন্নিবৃত্তির ব্যবস্থা না করে নিজে অন্নগ্রহণ করতেন না।

ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশি পূজা পেয়ে থাকেন দেবাদিদেব মহাদেব। মন্দির দুটির একটিতে অধিষ্ঠিত মহেশ্বর শিব, অন্যটিতে পূজিত হচ্ছেন বৈকুন্ঠেশ্বর নারায়ণ। পূর্বে মন্দির প্রাঙ্গণে সাতদিন ধরে চলতো উৎসব। নিকট দূর থেকে আসতো অসংখ্য ভক্তবৃন্দ। অবস্থান করতো জোড়া শিব মন্দির প্রাঙ্গণে। তৃপ্ত হতো প্রসাদ গ্রহণ করে। অবহেলায় মন্দিরের সৌন্দর্য পড়েছিলো অবক্ষয়ের গ্রাসে। উৎসবের কলরোল আর শোনা যেতো না। আনন্দের কথা উৎসাহীজনের আন্তরিকতায় মন্দির দুটি আবার

ফিরে পেয়েছে অতীতের সৌন্দর্য সুষমা। নতুন প্রজন্মের উদ্যোগে মন্দির পাদপীঠে যুক্ত করা ফলকের গায়ে উৎকীর্ণ রয়েছে—

আজিজনগর জোড়া শিব মন্দির।
স্থাপিত ১২৬৬ সাল / সংস্কার ১৩৯২ সাল।
সংস্কারক—আজিজনগর পল্লীবাসী।
ব্যবস্থাপনায়—আজিজনগর পল্লী সারথী।
১০ই চৈত্র, সোমবার, ১৩৯২, আজিজনগর, ২৪ পরগণা।

প্রতিটি মন্দিরে একটি করে প্রবেশ পথ। একটি করে বহির্গমন পথ বিদ্যমান। চারটি বৃষ মূর্তি সহ কারুকার্য অবহেলার নয়। মন্দির অভ্যন্তরে পুরোপুরি ও বাইরের অংশে শ্বেত পাথরের কাজ দেখার মত। লতাপাতা ও পদ্মের ন্যায় পুষ্পগুলি শিল্প রসিকদের দৃষ্টির বাইরে যাবে না বলেই বিশ্বাস। জোড়া শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা কালে জড়িয়ে থাকা রমণীয় স্মৃতি কথা শুনলে আনন্দে আপ্লুত হতে হয় আজও। পরে বলেছি সে কথা।

চৌধুরী বংশের পূর্ব পুরুষদের বেশ কয়েকজন ছিলেন সুপণ্ডিত। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আহ্বানে এঁদের মধ্যে দু'চারজন উপস্থিত হয়েছিলেন কৃষ্ণনগর রাজসভায়। শোনা যায় একজনের মুখে মুখে শ্লোক রচনার পরিপাট্যে বিস্মিত ও প্রীত হন কাব্যপ্রিয় কৃষ্ণচন্দ্র। দান করেন ৫০০ বিঘা জমি। সেই সম্পত্তির মধ্যেই নাকি অবস্থিত জোড়া শিব মন্দির।

শ্রীশ্রীরাধামোহনেশ্বরী ও ত্রৈলোক্যমোহিণীশ্বরী উদ্বোধন কালে স্মরণীয় একটি ঘটনা স্মৃতিবাহিত হয়ে বেঁচে রয়েছে অনেক মানুষের মনে। অবিশ্বাস্য হ'লেও একথা সত্য মন্দিরের উদ্বোধন দিবসে আজিজনগরের মাটিতে লক্ষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাধামোহন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন নবদ্বীপ, গুপ্তিপাড়া, কাশী প্রভৃতি স্থান থেকে আগত পন্ডিতমন্ডলীর থাকার ব্যবস্থা হয়েছিলো কাঁটার মাঠে। সেই সব শাস্ত্রবিদ্‌দের চরণচিহ্ন মিশে রয়েছে এখানকার ধূলিকণার রেণু পরমাণুতে। বর্তমানে আজিজনগর স্বাস্থ্যকেন্দ্র অবস্থিত সেই কাঁটার মাঠেই। কাঁটার মাঠ এখনও আছে গোলাপের সৌরভস্মৃতি নিয়ে। প্রতিটি পন্ডিতজনের থাকার ব্যবস্থা মনে রাখার মত। তালপাতার তৈরি বিরাট আকারের ছাতা পরস্পর সাজানো ছিলো কাঁটার মাঠে। এক একজনের জন্য সংরক্ষিত ছিল এক

একটি ছাতা। সেখানেই অবস্থান, অধ্যয়ন ও খাদ্য গ্রহণ, সে এক অভিনব আয়োজন। কাঁটার মাঠে দাঁড়িয়ে ক্ষণকালের জন্য নিশ্চুপ হয়ে ভাবলে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে সারি সারি তালপাতার তৈরি কুটিরের তলে উপবেশন করে আপন আপন শাস্ত্র ও ধর্ম চর্চায় ব্যস্ত ব্রাহ্মণ মন্ডলীর মুখচ্ছবি।

চৌধুরী মশাই শুধু এখানেই কর্তব্য শেষ করেন নি। শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ পাথেয় সহ প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে দান করেছিলেন একটি করে গিনি ও ঘড়া।

সেদিন শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনের আর এক পদ্ধতি কঠিন হৃদয়কেও নাড়া দেয়। পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় সঞ্চিত করা হয়েছিলো সমাগত পন্ডিত মন্ডলীর পদরেণু। এগুলি ছিল কাঁচের তৈরি একটি বিশেষ আধারে। কোনো শুভ কাজে যাত্রারম্ভের পূর্বে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে সবাই মাথা ঠেকাতো আধারের গায়ে। বেশ কিছুদিন হলো আধারটির আর সন্ধান মেলে না। দেব—দ্বিজে ভক্তির এমন নজীরহীন নজীর অভিজ্ঞতার খাতায় নিশ্চয়ই দুর্লভ।

বলা হয়নি একটা কথা। এক সময় বাংলায় অস্থিরতার কারণে, অনেকে বলেন বর্গীর হাঙ্গামার ভয়ে পূর্বপুরুষ মাধব চৌধুরী নবাবের কর্ম পরিত্যাগ করে নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে চলে আসেন আজিজনগরে। জমিদারী পত্তন করে এখানেই বসবাস শুরু করেন। রাজকর্মে প্রভূত ধনদৌলত সঞ্চয়কারী মাধব চৌধুরীর পরবর্তী কিছু কর্মও স্মরণযোগ্য। সম্ভবতঃ দেওয়ান উপাধি লাভ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছ থেকে মতান্তরে মীর কাসিমের নিকট থেকে। দেওয়ান পদে নিযুক্ত থাকার কারণে 'মাধব দেওয়ান' নামেই তিনি অধিক পরিচিত হয়ে ওঠেন। দেওয়ানজী তৎকালীন বাঙলার অন্যতম শিক্ষাপীঠ গুপ্তিপাড়া থেকে প্রখ্যাত পন্ডিত রুদ্রেশ্বরকে আমন্ত্রণ করে আনেন কুলপুরোহিত রূপে। পাশের গ্রাম ঝিকরাতে ব্যবস্থা করে দেন বসবাসের। পরবর্তী সময়ে পুরোহিত পরিবারের অন্যতম নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্ন ছিলেন ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগরের পরমবন্ধু এবং বিদ্যাসাগর কলেজ প্রতিষ্ঠাকালে তাঁর ছিল সক্রিয় ভূমিকা। গ্রাম দেশে জল কষ্ট নিবারণের জন্য মাধব দেওয়ান শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শত নামে বিভিন্ন এলাকায় খনন করেন ১০৮টি পুষ্করিণী।

আত্মীয় স্বজন ও পুণ্যার্থীদের থাকার সুবিধার্থে গয়াতে 'নিবাস' নির্মাণ করেছিলেন মাধব দেওয়ান। শুধু তাই নয় গয়ার মন্দিরে তিনি দান করেন একটি সুবৃহৎ ঘণ্টা। ঘন্টাটি মাধব দেওয়ানের নামানুসারে 'মাধবী ঘন্টা' নামে খ্যাত। মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে ভক্তজনের কাছে এ ঘন্টা বাজানো অবশ্য পালনীয়। দূর সময়কালে স্থাপিত সেই ঘন্টা আজো ধ্বনিত ভক্তজনের হাতে হাতে, তার প্রত্যেকটি অনুরণন স্মরণ করিয়ে দেয় দেওয়ান মাধব চৌধুরীর স্মৃতি।

যদি কোনদিন দেখতে ইচ্ছা করে নতুন করে সংস্কৃত অতীত দিনের সেই মন্দির-দ্বয়। যদি কোনদিন হাঁটতে ইচ্ছা করে স্মৃতিমাখা গ্রাম্যপথে। যদি শুনতে ইচ্ছা করে হারিয়ে যাওয়া দিনের মধুর কথা—আসতে পারেন বেড়াচাঁপা থেকে অথবা হাড়োয়া স্টেশন থেকে নেমে পনের মিনিটের হাঁটা পথে দক্ষিণের গ্রাম আজিজনগরে।



শৌর্য ও সাহসিকতায় সেন রাজবংশ

কত কাল হয়ে গেছে। বাংলার গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে আছেন তাঁরা। ছড়িয়ে আছে তাঁদের স্মৃতি সৌরভ। আজো তাঁরা গর্ব বোধ করেন 'দেগঙ্গার সেনরূপে' পরিচয় দিতে। আমরাও আত্মপ্রসাদ লাভ করি সেই সব পরাক্রমশালী মানুষদের প্রথম আবাসভূমি দেগঙ্গায় ছিল জেনে।

সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিলো দুষ্প্রাপ্য পুঁথি "দ্বিগঙ্গা রাজবংশম।" রচনাকার ছিলেন পণ্ডিত কমলাকান্ত সার্বভৌম। রচিত হয়েছিলো ১৭০০ খ্রীস্টাব্দের প্রথম দিকে। পরে প্রকাশিত হয় আর এক মূল্যবান পুঁথি। নাম তার "বাসুকী কুলগাঁথা"। এটি লিখেছিলেন মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। পন্ডিত কমলাকান্ত যে কথা লিখেছিলেন "দ্বিগঙ্গা রাজবংশমে"—সে কথাই প্রায় প্রতিধ্বনিত হয়েছিলো "বাসুকী কুলগাঁথাতে"। অনুমান করা যেতে পারে "বাসুকী কুলগাঁথার" বয়স হবে দু'শো বছরেরও বেশি। 'দ্বিগঙ্গা রাজবংশম' ও 'বাসুকী কুলগাঁথা' পুঁথি দুটির পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে দেগঙ্গার সেনেদে'র শৌর্য-বীর্যের কথা ও সেখানে তাঁদের যশোগাথা হয়েছে কীর্তি।

সেনেদেরই একজন রুদ্রনারায়ণ রাজা উপাধি পান সম্রাট শাজাহনের কাছ থেকে। দেগঙ্গা থেকে চলে গিয়ে রাজ্য স্থাপন করেন বরিশালের রায়েরকাঠিতে। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রও পিছিয়ে থাকলো না। চিরুলিয়া পরগণা পেলেন বাবার কাছ থেকে। প্রাসাদ বানালেন-শুরু করলেন বসবাস। রুদ্রনারায়ণের চারপুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ গন্ধর্ব নারায়ণের পুত্রকে নিয়ে একটা গল্প আছে যেটি রহস্যে ভরা।

গন্ধর্বপুত্র রাজচন্দ্র দারুণ ভাবে অসুখে আক্রান্ত। কবিরাজ বদ্যি কেউই তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারলো না। রাজচন্দ্রের জীবনের আশা সবাই ছেড়ে দিয়েছেন। এমন সময় ঘটলো এক আশ্চর্য ঘটনা। এরই মধ্যে হঠাৎ করে একদিন এক সাধু এসে

হাজির। তিনি রাজপুত্রকে নিয়ে গেলেন গভীর জঙ্গলের মধ্যে। অবশ্য রাজা রাণী সাথে ছিলেন। সন্ন্যাসী রাজা রাণীকে একসাথে 'পানি' আনতে বলেন। তাঁরা যান পানি আনতে ফিরে এসে দেখেন পুত্র আছে সন্ন্যাসী নেই।

"বহুলোক সমাগমে তথা হইল হাট
তদবধি সে স্থানের নাম পানিহাট।"

আজো মনে পড়ে তিনশো বছরেরও আগেকার কথা। পুতকীর্তি স্থাপিত করে পুণ্যার্থী ভক্তদের মনে আসন করে নিয়েছিলেন কুলশ্রেষ্ঠ রুদ্রনারায়ণ। তাঁর স্থাপিত মন্দির সম্পর্কে তুলে ধরছি ঢাকা থেকে প্রকাশিত "বাংলাদেশের প্রত্ন সম্পদ" গ্রন্থের বক্তব্য।

"বরিশাল জেলার পিরোজপুর থানার অধীনে এবং শহর থেকে চার মাইল দূরে অবস্থিত রায়ের"-কাঠিতে মোগল আমলের একটি কালীমন্দির ছিল। মন্দিরগাত্রে সংস্কৃত ভাষায় যে শিলালিপি ছিল তা থেকে জানা যায় যে—রুদ্রনারায়ণ রায় নামক একজন জমিদার ১০৪০ বঙ্গাব্দে (১৬৪৩ খ্রীঃ) কালীমূর্তিটি প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১১৪৪ বঙ্গাব্দে (১৭৩৭ খ্রীঃ) মন্দিরটি নির্মিত হয়"।

আর একজন বিশ্রুত মানুষ ছিলেন শিবশঙ্কর সেন। তাঁর কথা স্মরণ করতে গিয়ে মুগ্ধ হই আমরা। ১৪৯৩ থেকে ১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার নবাব ছিলেন হুশেন শাহ্। অবিভক্ত চব্বিশ পরগণার সোনারপুর থানার মাহীনগর গ্রামের গোপীনাথ বসু নবাবের কাছ থেকে উপাধি পান 'পুরন্দর খাঁ'। শুধু তাই নয় অসীম কর্মকুশলতার গুণে তিনি প্রধান উজীর পদেও নিযুক্ত হয়েছিলেন। চব্বিশ পরগণার সেই গুণময় মানুষ দেগঙ্গার শিবশঙ্কর সেনকে 'মৌলিক প্রধান' রূপে স্বীকৃতি দিয়ে সম্মানিত করেন। তাঁরা হারিয়ে গেছেন কালের নিয়মে, হারায়নি তাঁদের ভূমিকার কথা।

আর একবার বলি দেগঙ্গা নিঃসন্দেহে ছিল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক নির্মমতা ও হিংস্র জীবজন্তুর অত্যাচারে শুধু মাত্র তখনকার নগরগুলি পরিত্যক্ত হইনি, পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অনেক পরিবার, সেনেদের দেগঙ্গা পরিত্যাগ করার এটাই বড় কারণ। সেনেরা চলে যান বরিশাল, যশোর, খুলনা ও বর্ধমান প্রভৃতি স্থানে।

স্মৃতির পর্দায় ভেসে ওঠে এক আজীবন শিক্ষা গুরুর নাম। বাংলা সাহিত্যের দিকপাল গবেষক ডঃ সুকুমার সেন দেগঙ্গার সেন বংশোদ্ভূত এবং তাঁর পূর্ব পুরুষরাও ছিলেন দেগঙ্গারই অধিবাসী। কয়েকছত্রে লিপিবদ্ধ করে সে কথার যথাযথ সমর্থনও করেছেন তিনি।

"শ্রীযুক্ত দিলীপ কুমার মৈতে মহাশয় আমার কাছে এসেছিলেন। আমাদের পুরনো ট্রাডিশন অনুযায়ী আমরা দেগঙ্গা থেকে এসেছি। আমাদের দুর্গামাতা দ্বিভূজা অভয়ামূর্তি। এই মূর্তি প্রাচীনত্বের পরিচায়ক। আমরা গত তের চোদ্দ পুরুষ ধরে বর্দ্ধমানের রায়না থানার অন্তর্গত গোতান গ্রামের বাসিন্দা।"

স্বাঃ সুকুমার সেন
১৮. ২. ৮৮

সেকালে প্রতিষ্ঠিত কায়স্থদের মধ্যে আর ছিলেন বনগ্রামের দত্ত, নলতার ভঞ্জ, হরিয়ালী ও মহেশ্বরের গুহ-মজুমদার, দাঁড়িয়ার মিত্র, বোধখানার চৌধুরী ও পাঁজিয়ার সিংহ প্রভৃতি।

মোগল আমলে কিঙ্কর সেনের ভূমিকার কথা আগ্রহভরে আজো পড়ি আমরা। কিঙ্কর ছিলেন 'মৌলিক প্রধান' শিবশঙ্করের প্রপৌত্র কিন্তু তার চেয়েও তাঁর বড় সম্মান প্রাপ্তি পরিচয় 'ভূঞা 'কিঙ্কর সেন' নামে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ গণের মধ্যে তিনি সম্মানিত হোন গোষ্ঠীপতি বা মৌলিক রূপে।

যশোহর রাজ প্রতাপাদিত্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে যাওয়ার সময় বিশ্রাম নেওয়ার কারণে ও রনকৌশল স্থির করতে মোগল সেনাপতি মানসিংহকে বেশ কিছুদিন অবস্থান করতে হয়েছিলো সোহাই গ্রামে। সে সময় ভবানন্দ মজুমদার এঁকে যেমন পথ দেখিয়ে এনেছিলেন তেমনি স্থানীয় রাজারাও তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন বারাসতের রাজা ও দ্বিগঙ্গার কিঙ্কর সেন। একবার প্রতাপের সাথে যুদ্ধ হয় কিঙ্করপুত্র মদনমোহনের। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সব সম্পত্তি হারান মদন। শাজাহান তখন যুবরাজ। বাংলা মুলুকে পরিভ্রমণে এলে মদন মোহন তাঁকে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে সম্পত্তি ফেরত পান আরও পান খেলাত খেতাব। নিজপুত্র শ্রীনাথ রায়ও সেলিমাবাদ সহ রাজা উপাধি পান।

সে রাজাও নেই, রাজ্যও নেই। আছে শুধু কীর্তিময় কাহিনী, আর আছে "সেনের ভিটা"। বড়িষার সাবর্ণ চৌধুরীরা যেমন ছড়িয়ে পড়েছেন, ছড়িয়ে পড়েছেন বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা, তেমনি ভাবে

বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে আছেন দেগঙ্গার সেনেরা। ছড়িয়ে আছে সেনেদের বসত বাড়ির ইঁটের টুকরো। মেজর ভূপেন সেনের ভিটে বিম্বা সেনের ভিটেয় যাবো বললেই সানন্দে দেখিয়ে দেবে ঝিকরা গ্রামের মানুষ। জেনেছি স্থানটুকু হস্তান্তরিত হয়েছে। নতুন মালিক তৈরি করবেন বাড়িঘর। হারিয়ে যাবে ঐতিহাসিক এক বংশের শেষ স্মৃতিটুকু।

হারায়নি রাম রায়ের বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা। সে কথা বলেই শেষ করবো। রাম ছিলেন শ্রীনাথের পুত্র। বেশি দিনের কথা নয়। আরাকানবাসী 'মগ' ও 'ফিরিঙ্গি'দের অত্যাচারে ভীত হয়ে পড়ে সুন্দরবনের মানুষ। অশুভ ও হিংস্র নররূপী জীবদের লুটপাট প্রতিহত করতে না পেরে দেশ ছেড়ে চলে যায় অধিবাসীরা। দেশটা চলে যায় মগেদের অধীনে। দেশ হলো 'মগের মুল্লুক'। আগিয়ে আসেন রাম রায়। মগেদের অত্যাচার থেকে বাঁচান প্রজাদের। বিপুল সম্মান পান তিনি। সেনেরা দেগঙ্গা ছেড়ে চলে গেলেও সুদীর্ঘ সময় পথ পরিক্রমার পরও তাঁরা সম্মান নিয়ে বেঁচে আছেন কোলকাতা সহ বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। ইতিহাস বলে—"দ্বিগঙ্গাই ছিল বীরধর্ম্মী সেন বংশীয় কায়স্থগণের প্রথম নিবাস। ইহারা রাঢ়ী কায়স্থ।" এক সময় তাঁদের শৌর্য, বীর্য, আধিপত্যের কথা ধরে রেখেছিলো বাঙলার বাতাস। এক সময় ছিল বালীর দত্ত, মুড়াগাছার দেব, দেগঙ্গার সেন কায়স্থগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। সে কথার সন্ধান মেলে যশোর, খুলনা, চব্বিশ পরগণা নিয়ে রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থে।

"বালী, দ্বিগঙ্গা আর মুড়াগাছা
আর যত সব কাদা খোঁচা।"

কবে, কোন্ সময়, কোথা থেকে এসে প্রতাপান্বিত সেনেরা দেগঙ্গার মাটিতে প্রথম পা রেখেছিলো তার কাহিনীও বড় চমৎকার। শেষ করি শুরু'র কথা দিয়ে।

সময়টা হবে ৬৫৪ শকাব্দ বা ৭৬৯ খ্রীস্টাব্দ। তখন গৌড়ে'র রাজা আদিশূর। সুদূর কান্যকুব্জ থেকে ৫ জন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এনে বাঙলার মাটিতে বসবাস করার উত্তম ব্যবস্থা করে দিয়ে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন আদিশূর। সেই ঐতিহাসিক ব্যক্তিই নিয়ে আসেন রমানাথ সেনকে। দেগঙ্গা তখন সমৃদ্ধ জনপদ। নৃত্যপরা নদীর স্রোত তখন এর গা বেয়ে বইতো,

কলকল শব্দে। রাজা আদিশূরই দেগঙ্গা দান করেন রমানাথ সেনকে। রমানাথ বসবাস শুরু করেন এখানে। সেই শুরু। সে কথা বারোশ বছর আগেকার। সে কথাই গাঁথা রয়েছে অতীতের কাব্য গাথায়—

> "ভাগীরথী নদী তীরে দীর্ঘ গঙ্গা গ্রাম
> সর্বস্থানে দ্বিগঙ্গা বলিয়া ঘুষে নাম
> সুন্দর সে গ্রামখানি কি শোভা তাহাতে
> সেই গ্রাম আদিশূর দিল রমানাথে।"



বাইশ আউলিয়া-ধন্যভূমি রায়কোলা

প্রবাহিনী পদ্মার উপরেখা, বনবিবির বিশাল দেহ, প্রকৃতির স্নিগ্ধ পরিবেশ আজো মুগ্ধ করে সকলকে। রায়কোলা গ্রাম। এখান অবস্থান করেছিলেন ইসলাম ধর্ম জগতের বাইশজন সাধক সম্প্রচারক। সে পুণ্য কথা বেঁচে থাকবে স্মরণাতীত কাল পর্যন্ত। ৭২১ হিজরাব্দের ৭ই রবিউল বা ৭০৮ বাংলা সালের কথা। তিনশো একজন মুজাহিদের একটি কাফেলা বা তীর্থযাত্রীর দল শাহজালালের নেতৃত্বে বার হন মক্কা থেকে। লক্ষ্য হিন্দুস্থানের রাজধানী দিল্লী। সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমার পর তাঁরা সেখানে উপস্থিত ৭২২ হিজরাব্দের ২২শে জেলহেজ্জা বা ৭০৯ সালে। এ দলেই ছিলেন আব্বাস আলী রাজী। আব্বাস আলী রাজী দীক্ষা গ্রহণ করেন শাহ-জালাল রাজীর নিকট। গুরু শাহ জালাল এক সময় আব্বাস আলীকে ভূষিত করেন 'সামসুল আরেফীন' ও 'কোতবুল আরেফীন' আখ্যায়। দিল্লী থেকে তাঁরা যান সিলেটে। সেখানেই থেকে যান গুরু শাহজালাল। গুরুর নির্দেশে আব্বাস আলী রাজী তাঁর একুশ জন সতীর্থ সাধক সহ রওনা দেন বাংলার এ অংশের উদ্দেশ্যে। দীর্ঘ সড়ক অতিক্রম শেষে তাঁরা পৌঁছান চব্বিশ পরগণার দেগঙ্গার

রায়কোলা গ্রামে। কলকণ্ঠের শব্দ থেকে দূরে এ গ্রামে সাধকবৃন্দ অবস্থান করেন বেশ কিছু কালের জন্য। যাঁদের অবস্থানে ধন্য হয়েছিলো রায়কোলা তাঁরা হলেন—

১। হজরত সৈয়দ আব্বাস আলী রাজী—হাড়োয়া।
২। হজরত আবদুল্লাহ রাজী—শিষিনী।
৩। হজরত আহমদুল্লাহ রাজী—আনোয়ারপুর।
৪। হজরত সৈয়দ আবদুলকাদের রাজী—বঙ্গোপসাগরের কাছে।
৫। হজরত আবদুল নঈম রাজী—কোন্নগর।
৬। হজরত আব্দুল অহেদ রাজী—রায়গ্রাম।
৭। হজরত আবুল ফজল রাজী—সরওরার গ্রাম।
৮। হজরত আব্দুল্লাহ আউয়াল—বীরভূম।
৯। হজরত আব্দুল লতিফ—সোনারপুর।
১০। হজরত মোহম্মদ শাহ সুফী সুলতান—পান্ডুয়া, হুগলী।
১১। হজরত সাফীকুল আলম—কেমিয়া-খামারপাড়া।
১২। হজরত সঈদ রাজী—শালতিয়া, নৈহাটী।
১৩। হজরত হামেদুদ্দীন রাজী—মঙ্গলকোট।
১৪। হজরত কোরবান আলী রাজী—আরামবাগ, হুগলী।
১৫। হজরত মোমেনুদ্দিন রাজী—বনডালা, বর্দ্ধমান।
১৬। হজরত ইলিয়াস রাজী—আঁধার মাণিক, বাদুড়িয়া।
১৭। হজরত হোসায়েন হায়দার রাজী—পূর্ণিয়া।
১৮। হজরত মোহাম্মদ ফাজ্জিল—হিঙ্গলগঞ্জ।
১৯। হজরত মোহাম্মদ দায়েম—ডায়মন্ডহারবার।
২০। হজরত মোহাম্মদ হাসান রাজী—হাসনাবাদ।
২১। হজরত দাবার খাঁ রাজী—ত্রিবেণী'
২২। হজরত দাউদ আকবর রাজী—সোহাই।

রায়কোলা গ্রামে বাইশজন আউলিয়ার অবস্থানের সময়টা হবে ১৩০৩ থেকে ১৩২২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। অবস্থান ধন্য স্থানটিতে প্রোথিত হয়েছে প্রস্তর ফলক। ফলকে উৎকীর্ণ রয়েছে ২২ জন আউলিয়ার নাম। ১৩৮৮ সালের ২২শে চৈত্র অভিনন্দনযোগ্য একাজটি করেছেন অনুরাগীবৃন্দ।

বাইশ আউলিয়ারই মত আঠারো আউলিয়ার স্থান রয়েছে বর্দ্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে। মঙ্গলকোট একদিকে যেমন

প্রস্থক্ষেত্র রূপে খ্যাত অপরদিকে এর খ্যাতি আঠারো আউলিয়ার জন্য। আউলিয়া কথার অর্থ হলো—"আউল সম্প্রদায়ের লোক, দরবেশ, মুসলমান সন্ন্যাসী বা ফকির।"

গ্রামের নাম কেন হলো রায়কোলা—তারও পশ্চাৎপটে রয়ে গেছে ইতিহাস আশ্রিত এক রম্য গাথা।

রায়কোলা গ্রামের আগে নাম ছিল দেবদাসপুর। সে সময় বিস্তীর্ণ এ সকল এলাকা ছিলো নদীয়ার মহারাজার অধীনে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজ্য পরিভ্রমণকালে একবার এসেছিলেন এ সকল এলাকাতে। প্রজাপালক রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মানার্থে প্রজাকুল দেবদাসপুরের নাম পরিবর্তন করে নাম রাখেন রায়কোহিলা—তার থেকেই আজকের রায়কোলা। আরো দুটি গ্রাম রয়েছে এখানে। রায়পুর রাণীহাটী। রায় রাজেন্দ্র বাহাদুরের নামে রায়পুর ও রাণীহাটির সাথে রাণীর কথা যুক্ত করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন প্রজাগণ।

গ্রাম রায়কোলাতে দরবেশবৃন্দ অবস্থানকালে এলাকার মানুষের সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করার প্রয়াসে শিক্ষা গ্রহণ করেন বাংলা ভাষা। তারপর তাঁরা ছড়িয়ে পড়েন বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে।

কয়েক'শ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। মলিন হয়ে গেছে কত স্মৃতি। কিন্তু রায়কোলার ধুলিকণায় অমলিন হয়ে রয়েছে আউলিয়াগণের অবস্থানের পবিত্র স্মৃতি। আজো সে ভূখন্ড "বাইশ আউলিয়ার স্থান নামে" মুখর হয়ে রয়েছে নির্বাক ভাষ্যে।



লোকনায়ক লোকনাথ ব্রহ্মচারী

"রণে বনে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়িবে
আমাকে স্মরণ করিও, আমি রক্ষা করিব।"

ঘরে ঘরে ধূপের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন তাঁর ছবি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের গায়ে, সেবাশ্রমের মাথায়, বিপণির পরিচয়ে সর্বত্রই একটি নাম—লোকনাথ। পরম সৌভাগ্য আমাদের সেই মহান সাধক যাঁকে স্মরণ করে মানুষ নিত্য খুঁজে পায় সংসার সংগ্রামে বেঁচে থাকার বিশ্বাস—তাঁর পুণ্য আবির্ভাব দেগঙ্গারই এক গ্রাম—চাকলা। বাংলায় তখন মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন চলছে। পুণ্যবতী মহিলা কমলাদেবীর গর্ভে ১১৩৭ সালে চাকলায় ভূমিষ্ঠ হন লোকনাথ। পিতার নাম রাম কানাই ঘোষাল। চাকলার 'ঘোষালের ভিটা' আজো বহন করছে তাঁর জন্মভূমির পবিত্র স্মৃতি।

লোকনাথ দীক্ষা নেন ভগবান গাঙ্গুলীর নিকট। গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলীর বাড়ি ছিল পাশেই বসিরহাট মহাকুমার কচুয়াতে। সেখানেও শুরু হয়েছে লোকনাথ স্মরণে মন্দির নির্মাণ। বেণীমাধব ছিলেন লোকনাথের সখা, আবাল্য সহচর এবং গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী'র শিষ্যও। উপনয়ন দানের পর দুই তাপসকে নিয়ে গ্রামের অসংখ্য নর-নারীর অশ্রুপাতের মধ্য দিয়ে গুরুদেব গৃহত্যাগ করেন চিরকালের জন্য।

একান্নপীঠের মধ্যে কালীঘাট এক প্রধান পীঠ। 'সবতীর্থ সার, তাই মা তোমার পাশে এসেছি আবার।' ধর্ম জগতের তিন জ্যোতিষ্ক প্রথমেই এলেন সেই মহাতীর্থ কালীঘাটে। আজকের আধুনিক কালীঘাট তখন ছিল জঙ্গলে ঘেরা। বাঘ, ভাল্লুক নিরাপদে ঘুরে বেড়াতো। গড়ের মাঠ সহ আশপাশ ছিলো ডাকাতদের নিরাপদ ভূমি। দিনের বেলাতেই নেমে আসতো সন্ধ্যার জমাট অন্ধকার। এই পুণ্যতীর্থে বেশ কিছু দিন অবস্থান করেন তিন পুণ্যার্থী।

তারপর তাঁরা রওনা দেন দুর্গম হিমালয়ের পথে। প্রকৃতির অসীম সৌন্দর্য দিয়ে মোড়া তুষারমৌলি হিমালয়—অনাদি অনন্তকাল থেকে মুনিঋষিদের কাছে তপস্যার শ্রেষ্ঠ স্থান বলে বিবেচিত হয়েছে। গিরিরাজ হিমালয়ের গুহায় লোকনাথ বেশ কয়েক বছর কাটালেন যোগ সাধনা করে। ঝড়, বৃষ্টি, তুষারপাতের মধ্যেও কঠিন আত্মশাসনের পথে সিদ্ধি লাভ করলেন ব্রহ্মচারী, ঈশ্বর দর্শনে সক্ষম হলেন লোকপাবন লোকনাথ।

ভগবান লোকনাথের জীবন নিয়ে কত যে অলৌকিক কথা-কাহিনী ছড়িয়ে রয়েছে তা বলে ওঠা যাবে না। একটি কাহিনীর কথাই বলি।

লোকনাথ দীর্ঘ কয়েক মাস অবস্থান করেন চন্দ্রনাথ পাহাড়ে। বনের হিংস্র জীব-জন্তুও তাঁকে আপন করে নিয়েছিলো এ সময়। একদিন ব্রহ্মচারী বসে আছেন পাহাড়ের আশ্রমে। হঠাৎ একটি বাঘিনী তাঁর সামনে এসে চিৎকার করে উঠলো। লোকনাথ দেখলেন বাঘিনীটি তার কয়েকটি বাচ্চাকে সেখানে নামিয়ে রেখে কি যেন বলতে চায়। অন্তর্যামী বুঝলেন বাঘিনীর অন্তরের কথা। বুঝলেন—বাচ্চাগুলোকে আশ্রয়ে নিরাপদে রেখে মা বাঘিনী যেতে চায় শিকারে। তিনি হাসলেন। কি যেন ইঙ্গিত করলেন—চলে গেলো বাঘিনী। একদিন নয়, দুদিন নয় যতদিন বাচ্চাগুলো বড় না হয়েছে ততদিন সাধকের কাছে সেগুলিকে রেখে দিয়ে গিয়েছে। একথা শুনলে শিহরণ অনুভব করি—কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা বনের হিংস্র জীবজন্তুও ব্রহ্মচারীকে কত আপনার করে নিয়েছিল।

ব্যাসদেব থেকে শুরু করে বহু সাধকের সাধনার পীঠস্থান পবিত্র কাশী। এখানে মহাসাধক তৈলঙ্গস্বামীর সাথে তিনি অতিবাহিত করেছেন বহুদিন। আবার এখানেই হারিয়েছেন আবাল্য পথ নির্দেশক গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলীকে। কাশীর মণিকর্ণিকার ঘাটে শাস্ত্রীয় মতে শিষ্যদ্বয় শ্রাদ্ধকার্যাদি সুসম্পন্ন করে আবার বেরিয়ে পড়েন। ঘুরলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। অনেক দেশ ঘোরার পর তিনি উপস্থিত হলেন মক্কা শরিফে। এখানকার মুসলমান সাধকেরা হিন্দু সাধককে জানান আন্তরিক আমন্ত্রণ। মক্কায় আলাপ ও ঘনিষ্ঠতা হয় আব্দুল গফুরের সাথে। পারস্পরিক ধর্মীয় আলোচনায় উভয়েই আত্মিক প্রীতি লাভ করেন। পরবর্তী কালে বিভিন্ন সময় তিনি গল্প করতে

গিয়ে বলতেন—"আমি মক্কায় আব্দুল গফুর নামে একজন ব্রাহ্মণকে দেখে এসেছি।"

সবাই অবাক হতেন। গফুর নাম তো মুসলমান জানি। তিনি আবার ব্রাহ্মণ হলেন কি করে ?

যোগীবর লোকনাথ ব্রাহ্মণ শব্দের অর্থ করে বলতেন—"যিনি ব্রহ্মকে বা বিধাতাকে জানেন তিনিই তো প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ। সেই অর্থে গফুর সত্যিকারের ব্রাহ্মণ।"

আরব গমন শেষ করে তিনি যান তুরস্ক, চীন, ইতালি, গ্রীস প্রভৃতি দেশে। এ সব দেশ পরিভ্রমণ কালে তিনি তুলে ধরেন ভারতের সনাতন ধর্মকে। গুপ্তচর সন্দেহে চীন সরকার লোকনাথকে বেশ কিছুদিন আটক করে রাখেন জেলে। পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সরকার জানতে পারেন যে তিনি একজন সত্যিকারের সাধক—তখন তাঁকে মুক্ত করে দেন।

সাধু সন্ন্যাসীরা গৃহ ত্যাগ করার পর একবার ফিরে আসেন আপন জন্মভূমিতে—এটাই নিয়ম। নিয়মরক্ষা করতে লোকনাথও এসেছিলেন আপন জন্মভূমি চাকলাতে। স্মৃতিবাহিত সে কথা শুনেছি চাকলা থেকে—জেনেছি জীবনী-গ্রন্থ পড়েও।

জন্মভূমি চাকলাতে আসার সময় তাঁর সাথে ছিলেন গুরুদেব ভগবান গাঙ্গুলী ও সহচর বেণীমাধব। গ্রামে এসে যে অশ্বত্থগাছ তলাতে তাঁরা অবস্থান করেছিলেন সে গাছটি আজো সজীব। সেই গাছটির গায়ে সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে—

"এই সেই অশ্বত্থ গাছ যেখানে বাবা লোকনাথ, গুরু ভগবান গাঙ্গুলী ও বেণী মাধব ৭দিন অবস্হান করেন।"

প্রথমদিকে গ্রামের সবাই তাঁকে চিনতে না পারলেও পেরেছিলেন একজন, তিনি ছিলেন তাঁর বাল্যসঙ্গিনী, বিশ্বাস বাড়ির মেয়ে। নাম তার মাধবী। বাল্যসঙ্গিনী এখন বয়সে যুবতী। প্রথম থেকেই তিনি তাঁর সেবা শুরু করেন। ফলে গভীর ভালবাসা জন্মে তাঁদের মধ্যে। এনিয়ে গ্রামে গুঞ্জনও উঠে দারুণ ভাবে। নানা লোক নানা কথা বলতে শুরু করে। বিদ্রোহ করে ওঠে লোকনাথেরও মন। ভাবতে থাকেন দীর্ঘ সাধনা কি বিফলে যাবে ? যোগীশ্রেষ্ঠ লোকনাথ চাইলেন তৎক্ষনাৎ চাকলা পরিত্যাগ করতে। গুরুদেবকে বললেনও সে কথা। কিন্তু গুরুদেব নির্বিকার—তিনি যেন শুনেও শুনছেন না। মনে মনে তাঁর জন্মাতে থাকে ক্ষোভ। অবশেষে রাগে পড়েন

ফেটে। সহ্য করতে না পেরে একদিন একখণ্ড কাঠের চেলা নিয়ে মারতে উদ্যত হন গুরুদেবকে।

এতদিন নিশ্চুপ ছিলেন গুরুদেব। এবার বললেন—"আমার পরিশ্রম সার্থক হয়েছে। তোমার যথার্থ মোহ কেটেছে দেখে মুগ্ধ হলাম। এবার স্থান ত্যাগ করো।" আবার বেরিয়ে পড়লেন পথে। ঘুরলেন সারা ভারতের তীর্থ স্থানগুলি।

সবশেষে এলেন অধুনা বাংলাদেশের ঢাকার কাছে বারুদী গ্রামে। ঢাকার বারুদীতে গড়ে তুললেন আশ্রম। বারুদী আশ্রমে থাকাকালীন বহু ধনী, নির্ধন, জমিদার, ভিখারী, মৃত্যুপথযাত্রী তাঁর আশীর্বাদ পেয়ে নতুন জীবন লাভ করেছেন। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, ব্রহ্মানন্দ ভারতী, রজনী ব্রহ্মচারী, রামকুমার চক্রবর্তী, রাজনৈতিক নেতা জ্যোতি বসুর পিতা ডাঃ নিশিকান্ত বসু, ঢাকা শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা মথুরা মোহন চক্রবর্তী প্রভৃতি সম্মানীয় ব্যক্তিবৃন্দ ছিলেন তাঁর পরম শিষ্য।

যদি ধন্য হতে চান্ চাকলা দর্শন করে—দু'দিক দিয়ে পৌঁছানো যায় সেখানে। শ্যামবাজার থেকে ৭৯, ৭৯এ, ৭৯সি বাসে এসে নামতে হবে বেড়াচাঁপাতে। এসপ্লানেড থেকে সরকারী পরিবহন আপনাকে নামিয়ে দেবে এখানেই। কিছু পাকা কিছু কাঁচা রাস্তা ধরে ৮।৯ কিলোমিটারের রাস্তা বয়ে ভ্যান বা রিক্সা নিয়ে যাবে সঠিক ঠিকানায়। আবার শ্যামবাজার বা বারাসাত থেকে বনগাঁর বাসে যশোর রোড ধরে নামতে হবে গুমাতে। এখানেও ভ্যান বা রিক্সা তরুচ্ছায়ামাখা গ্রাম্যপথ ধরে চলবে শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে অবস্থিত ইপ্সিত ভূমিতে।

গ্রাম চাকলার মাটিতে আরো রয়েছে ডাকাতে-কালী। তিনশো বছরেরও আগে এর প্রতিষ্ঠাকাল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ১০৮ বিঘা জমি দানে একদা সমৃদ্ধ হয়েছিলো এর পরিচালন ব্যবস্থা। গ্রামখানিও ছিল উন্নত। কয়েকশো বছর আগের অধিবাসীদের অনেকেই গ্রাম পরিত্যাগ করে চলে গেছেন অন্যত্র কিন্তু তাঁদের পরিত্যক্ত বিশাল বিশাল বাড়িগুলো কঙ্কালসার দেহ নিয়ে নতজানু হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

১২৯৭ সালের ১৯শে জ্যৈষ্ঠ্য রবিবার বেলা ১১-১৫ মিনিট ঢাকার বারুদীতে মহাপ্রয়াণ ঘটে মহাতাপসের। সেখানে নির্মিত হয়েছে পুণ্যাশ্রম। ছিল না জন্মভূমি চাকলার ঘোষালের ভিটায়

কোনো স্মৃতি-মন্দির। সে কাজ সমাধান করতে এগিয়ে এসেছেন শত শত ভক্ত ; সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন চাকলা গ্রামের অধিবাসীগণ ; এগিয়ে এসেছেন ঢাকার বারুদীর নাগচৌধুরী জমিদার, যে পরিবার আবহমান কাল থেকে তাঁর পরম সেবক। কথা বলেছিলাম তাঁর সাথে (বর্তমানে তিনি প্রয়াত)। মন্দির নির্মাণে তাঁর ও তাঁর আত্মীয়বর্গের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়। শুরু হয়েছে মন্দিরের নির্মাণ কাজ। পরে তৈরি হবে যাত্রীনিবাস।

লোকনাথ চরণরেণু ধন্য চাকলা আজও চঞ্চল। প্রতিদিন আসেন ভক্ত। জন্ম ভিটায় দাঁড়ালে জাগে শিহরণ। জন্মদিন ১৯শে জ্যৈষ্ঠ। প্রতি বছর ঐদিন গ্রীষ্মের দাবদাহ উপেক্ষা করে চাকলার পথে নামে যাত্রীর ঢল। পবিত্র অঙ্গণে উপস্থিত হয়ে তাঁর নাম গান করে তাঁরা। প্রার্থনা করে—

"লোক পাবনায় ভক্ত বৎসলায়
সকল বাঞ্ছা-পূরণ-কারনায়
রণে বনে দুর্গমে জলেবানলে
ত্রাতা পাতা দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ।"



এক যে ছিল রাজা

রাণীর চোখে জল।

রাজা চলেছেন যুদ্ধে কি জানি কি হয় ভেবে। এক অশুভ চিন্তা রাণীর মনকে কুরে কুরে খাচ্ছে, 'যদি পরাজিত হই কোথায় গিয়ে দাঁড়াবো, কার কাছে গিয়ে দাঁড়াবো।'

ভয় নেই বললেন রাজা—যুদ্ধে আমাদেরই জয় হবে। তবে পায়রা দুটো কেন? কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করলো রাণী।

জয়ের সংবাদ নিয়ে আসবে এই সাদা পায়রা, বুঝলে রাণী বলে রাজা তাঁর হাত দুটো বুলিয়ে দিলেন সাদা পায়রার গায়ে। রাণীর মুখে ফুটে উঠলো হাসি। পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গেল। মুখের ওপর কে যেন লেপে দিলো কালো কালি।

আর যদি পরাজিত হই, উড়ে আসবে এই কালো পায়রাটা—রাজাও যেন আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁরও চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে এল। অশ্বের পিঠে উঠে বসলেন রাজা। রাজবাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে অশ্ব টগবগিয়ে ছুটে চললো দূরে, আরো দূরে। এক সময় বাতাসে মিলিয়ে গেল অশ্বের খুরধ্বনি। রাণী তখনও অবাক নেত্রে চেয়ে আছেন পথের দিকে। শুধুমাত্র কপালে দুটি হাত ঠেকালেন।

বলি সে রাজার কথা। যিনি এইমাত্র যুদ্ধে গেলেন। রাজা চন্দ্রকেতু। দেউলিয়া বা আজকের দেবালয় ছিল তাঁর রাজধানী। রাজা বিয়ে করেন তমলুকের রাজ-কন্যাকে। শত্রু পক্ষের আক্রমণ প্রতিহত ও রাজপ্রাসাদকে সুরক্ষা করতে নির্মাণ করেছিলেন বর্তমান গড়টিকে। তবে তা ছিল কাদা মাটির। গড়টি প্রায় ধ্বংস হতে চলেছে। কর্তৃপক্ষের চরম উদাসীন্য ও স্থানীয় মানুষের কোদাল-কুড়ুলের নির্মম ব্যবহারই ঐতিহাসিক সম্পদটির বিনষ্ট হওয়ার প্রধান কারণ।

গড় ও রাজবাড়ি কিভাবে তৈরি হয়েছিলো তা নিয়ে রয়েছে এক সুন্দর গল্প গাথা।

হামা-দামা ছিল দু'ভাই। চন্দ্রকেতুর বিশ্বস্ত অনুচরও বটে। তাদের শক্তি ও সাহসও ছিল বিরাট। তাদের শক্তি ও সাহসের কথা বহুযুগ পার করেও গল্প ও ছন্দোবদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়ায় লোকমুখে।

"লম্বা দেহ ভীষণ তাদের আকার
হামা-দামা দু ভাই মিলে বাধলো বিরাট প্রাকার।"

ভীষণ আকারের দু ভাইকে চন্দ্রকেতু লাগিয়ে দিলেন গড় ও বাড়ী তৈরির কাজে। বেশ দূর থেকে বিরাট আকারের চুপড়ি করে তারা মাটি বয়ে আনছিলো। যেখানে গড় তৈরি হচ্ছিলো সেখানে মাটি রেখে আবার আনতে যাওয়ার পথে চুপড়ির গায়ে লেগে থাকা মাটি ঝেড়ে ফেলছিলো একস্থানে। এভাবে মাটির পরে মাটি জমে তৈরি হলো বিশাল ঢিপি। সে জায়গাটায় যে গ্রাম তার নাম হলো 'চুপড়ি ঝাড়া'। আবার যেখান থেকে দুভাই মাটি কেটে আনছিলো সে গ্রামের নাম হলো 'হামাদামা'। দুটি গ্রাম চুপড়িঝাড়া ও হামাদামা কল্পনার গল্প নিয়ে আজও বহাল তবিয়তে বেঁচে রয়েছে।

রাজা চন্দ্রকেতু রাণী ও পারিষদবর্গ নিয়ে ভালই চালাচ্ছিলেন তাঁর রাজত্ব। কিন্তু গ্রহের ফের। নিদারুণ বিষাদময় ঘটন বেঁধে ফেললো তাঁকে। ইতিহাসের সে গল্প কাহিনী শোনা দরকার। সুদূর তপ্ত বালির দেশ আরব। সেখান থেকে হজরত আব্বাস আলি নরম মাটির দেশ বাংলায় এলেন ইসলাম ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়ে। রাজা চন্দ্রকেতুর সাথে পীর সাহেবের ধর্ম নিয়ে অনেক আলোচনা হলো। কিন্তু চন্দ্রকেতু গোরাচাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেও রাজী হলেন না সনাতন ধর্ম পরিত্যাগ করতে। শোনা যায় এ সময় রাজ মহিষী কমলাদেবী—গোরাচাঁদের মত দেখতে সুন্দর তাই পীরসাহেবকে অভিহিত করেন গোরাচাঁদ নামে।

পীর গোরাচাঁদ এ সময় তাঁর অলৌকিক নানা কলা-কৌশল প্রদর্শন করলেন সকলের সম্মুখে। বেড়ার গায়ে ফোটালেন চাঁপাফুল। তাই গ্রামের নাম হলো বেড়াচাঁপা। তবুও রাজী হলেন না রাজা তাঁর ধর্ম ত্যাগ করতে, চিন্তায় পড়লেন পীর সাহেব। কারণ রাজা চন্দ্রকেতুকে তাঁর ধর্ম গ্রহণ করাতে না পারলে

প্রজারা তো গ্রহণ করবেনই না। অনেক ভেবে চিন্তে পীর সাহেব গ্রহণ করলেন অন্য পথ। দেবী গঙ্গা আসছিলেন রাজা চন্দ্রকেতুর পুত্রের অন্নপ্রাশনে। তাঁকেও দিলেন ফিরিয়ে। সেকথা বলেছি 'দেগঙ্গার জন্ম উৎস'—অধ্যায়ে।

গল্পের ফাঁকে একটা কথা বলে রাখি। সে এক অন্য কাহিনী। চন্দ্রকেতুগড়ের মাটি খুঁড়ে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগেকার এক বিস্ময়কর ইতিহাস। সংগৃহীত হয়েছে এক রূপবতী নগরীর পরিপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। সে প্রসঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে "প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি—চন্দ্রকেতুগড়" প্রবন্ধে।" আবার আগিয়ে যাই সে গল্প গাথায়।

এদিকে সবাই বসে আছে ভোজ বাড়িতে। গঙ্গাদেবী আসবেন বলে। অনেক পরে চন্দ্রকেতু শুনলেন গঙ্গাদেবীর ফিরে যাওয়ার কথা। আত্মীয় স্বজন অনেকে চলে গেলেন খাদ্য গ্রহণ না করে। ব্যাপারটা বুঝলেনও সব। কিন্তু রাজা অচঞ্চল। পীর গোরাচাঁদ দেখলেন এতেও কিছু হোল না। তিনি অভিযোগ করলেন দিল্লীর বাদশাহ আলাউদ্দিনের কাছে। অভিযোগ করলেন চন্দ্রকেতু প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাচ্ছে। বাদশাহ থাকেন সদাব্যস্ত। অভিযোগগুলি অলীক কিনা দেখার সময় কোথায় তাঁর? তিনি দিল্লি থেকে খবর দিলেন গৌড়রাজকে ব্যাপারটা দেখার জন্য। দিল্লীর আদেশে গৌড়রাজ আবার পাঠালেন জবরদস্ত সেনাপতি পীর শাহকে। পীর শাহ এসে বোঝালেন চন্দ্রকেতুকে তাঁর ধর্ম পরিত্যাগ করতে। বিনীতভাবে এবারও রাজা ফিরিয়ে দিলেন সে প্রস্তাব। ক্ষোভে ফেটে পড়লেন বাদশাহ প্রতিনিধি পীরশাহ।

যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলো। ধর্ম আনলো তরবারির ঝন্‌ঝনানি। রাজাও প্রস্তুত যুদ্ধের জন্য। নরম মাটির দুর্বল সবল ছোট বড় সব মানুষই শক্ত হয়ে উঠলো ধর্ম রক্ষায়। 'রণখোলা' গ্রাম সেদিনের রক্তস্নাত যুদ্ধ স্থান আজো রয়েছে। বোবা কান্না নিয়ে 'রণখোলা' নির্জনে নির্বাসিতের দিন কাটাচ্ছে, এমনি ভাবে রয়েছে 'ঘুমগড়' যেখানে বিশ্রাম করতো সৈন্য সামন্ত, 'ঘোড়াপোতায়' ছিল ঘোড়ার আস্তাবল, হাতি থাকতো 'হাদীপুরে', রাজপুরীতে প্রবেশের প্রধান দ্বার 'সিংহেরআটী', রাজপরিবারের সকলে স্নান করতো 'শানপুকুরে', পুজা হোত 'মঠবাড়িতে', লবণ থাকতো 'নুনগোলাতে', 'ধনপোতায়' ছিল রাজকোষের টাকা পয়সা, দেশ-বিদেশের ফল ফলতো

রাজার বাগান-এ। রাজা নেই, রাজ্যও নেই। ঘুমগড়, ঘোড়াপোতা, হাদীপুর, সিংহেরআটি, শানপুকুর, মঠবাড়ি, নুনগোলা, ধনপোতা, রাজারবাগান প্রভৃতিতে রাজকীয় ব্যবস্হা হারিয়ে গেছে কবে, মিশে গেছে মাটির সাথে, মাটি শুধুমাত্র ধরে রেখেছে রাজার আমলের নামগুলো।

যাক ফিরে যাই রণ-খোলার মাঠে যেখানে যুদ্ধ চলছে চন্দ্রকেতুর সাথে পীরশাহ ও গোরাচাঁদের। রণখোলার প্রান্তরে বিজয়লক্ষ্মী যখন চন্দ্রকেতুর প্রতি সুপ্রসন্না, জয় যখন অবশ্যম্ভাবী সেই সময় ঘটলো এক নিদারুণ ঘটনা।

সবার অলক্ষ্যে রণখোলার প্রাঙ্গন থেকে উড়ে গেল কালো পায়রা। কে করল, কারা করলো, কেউ বলতে পারে না। তবে অনুমান বলে শত্রুপক্ষের সাথে যুক্ত হয়ে কেউ এ সর্বনাশ কাজ করেছে। কালো পায়রা উড়ে গেছে শুনে চন্দ্রকেতুর সৈন্যদের মধ্যেও বিষাদ নেমে এল। চক্রান্ত আর অপকৌশলের অসহায় আবহাওয়ায় ঢেকে দিল আকাশ। দুর্যোগের ঘনঘটা রাজার সুখময় দিনগুলোকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিলো। রাজাও যেন কেমন হয়ে পড়লেন। জয় হাতের মধ্যে এসেও রাজাই পরাজিত ও বন্দী হলেন।

এদিকে রাণী অবাক হয়ে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন সকাল থেকে। ওকি ঐ যে উড়ে আসছে কালো পায়রা। রাণী দু'হাত দিয়ে মুখ ঢাকলেন। রাজপুরীতে নেমে এলো কালো রাত্রি। চিরকালের জন্য সৌভাগ্য সূর্য অস্তমিত হলো এক রাজ পরিবারের জীবনে। বর্ণনা করা যায় না সে করুণ দৃশ্যের কথা। ধীরে ধীরে রাণী উঠলেন নৌকায়। নৌকার তলদেশ দিলেন ছিদ্র করে। আত্মসম্মান রক্ষায় ডুবে মরলেন রাজপ্রাসাদের পদ্মাকরে। এখনও আছে সে দহ। নেই তাতে জল কিম্বা গভীরতা। শুধুমাত্র গ্রামের মানুষ গড়ের কাছের শোকগাথা জড়ানো এক স্থানকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বলে ঐ যে 'দ'।

ও দিকে রাজা চন্দ্রকেতু বন্দী হয়ে আটকে রইলেন, ছাড়া পেলেন না। নিদারুণ শোকের মধ্যে শুনলেন রাণীর আত্মবিসর্জনের কথা।

ইতিহাসের গল্প বলে রাজা চন্দ্রকেতু এ সময় সব কিছু হারান বা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে 'দেউলিয়া' হয়ে পড়েন। তাই গ্রামের

নাম হয় দেউলিয়া। আবার অনেকে বলেন তা নয়, এক সময় এ গ্রাম ছিল দেউল বা মন্দিরে পরিপূর্ণ। তা থেকেই হয়েছে দেউলিয়া নাম। থাক সে কথা, যুদ্ধে জয় লাভ করে গোরাচাঁদ এগিয়ে গেলেন সুন্দরবনের দুর্গম অঞ্চলে। সেখানে দেখা হলো বীরভদ্রের সাথে। জায়গা জমি আর ধর্মকর্ম নিয়ে থাকে বীরভদ্র। চন্দ্রকেতুকে পরাজিত করে গোরাচাঁদ আসছেন শুনে জোত-জমা ফেলে বিগ্রহ নিয়ে চলে গেলেন খড়দহে।

কিংবদন্তী আরো বলে হাতিয়াগড় বা হেতেগড়ের অধিপতি ছিলো মহিদানন্দ। তার আবার দুই পুত্র আঁকানন্দ, বাঁকানন্দ। গায়ে তাদের ভীষণ জোর। একধারে শিবভক্ত অপরদিকে চন্দ্রকেতুর দক্ষিণ হস্ত।

লোকগাথায় ধরা আছে সে কথা—

নাম আমার আঁকানন্দ
বাঁকানন্দ আমার ভাই
পেয়েছি শিবের বর
রোজ করি মনুষ্য আহার।
মজবুত শক্ত দেহ
যার খুশি আসুক কেহ
দেখাইব মজা তাহার।

আঁকানন্দ বাঁকানন্দ সম্পর্কে এমন ভয়ানক কথা শুনেও গোরাচাঁদ এগিয়ে গেলেন। তাঁদের সাথে দেখা করে বল্লেন—তোমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো।

শুনে ক্রোধে ফেটে পড়লো দু'ভাই। ইতিমধ্যে যুদ্ধে চন্দ্রকেতুর বিপর্যয়ের সংবাদ তারাও পেয়েছে! হঠাৎ ক্রোধের বশে আঁকানন্দ শিব প্রদত্ত দৈব অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলো গোরাচাঁদকে।

পীর গোরাচাঁদ ও প্রস্তুত ছিলেন। তিনিও আরবী তরবারির সাহায্যে জোর আঘাত করলেন দু'ভাইকে। দুভাই গেল মারা। কিন্তু গোরাচাঁদও আহত হলেন দারুণ ভাবে।

যুদ্ধের কথা আজো লেখা আছে লোকছন্দে—

"আঁকানন্দ বাঁকানন্দ রাবণের শালা,
তার সঙ্গে যুদ্ধ হইল আড়াই পক্ষ বেলা।
কি জানি আল্লার মর্জ্জি নসিবের ফের
চেকোবানে গোরাচাঁদের কাটা গেল ছের।"

আহত হয়ে তিনি নির্দেশ দিলেন তার সেবা শুশ্রূষাকারীদের পান', চুন, সুরকী সংগ্রহ করে ক্ষতস্থানে লাগাতে। গোরাচাঁদ বললেন—

"ক্ষত স্থানে দাও পান চূণ সুরকি লাগাইয়া
এখনই দেখিবে সব আল্লারই দোয়া।"

দুঃখের বিষয় শত চেষ্টা করেও সংগ্রহ করা গেল না এগুলি। তাই এলাকাতে সংস্কার ছিল চূণ সুরকি দিয়ে কোন কোঠাবাড়ি না তৈরীর। আজ আর অবশ্য সে সংস্কার মানে না অনেকেই। কানু ঘোষ, কানাই ঘোষ ও অনুরাগীদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও গোরাচাঁদ আর সুস্থ হয়ে উঠতে পারলেন না। ৭৬০ বঙ্গাব্দের ১২ ফাল্গুন অনন্তকালের জন্য শয্যা নিলেন হাড়োয়ার মাটিতে।

এতদিন চন্দ্রকেতু ছিলেন বন্দী। বন্দী চন্দ্রকেতু ছাড়া পেলেন দীর্ঘদিন পর। ফিরে এলেন আপন রাজধানী দেউলিয়াতে। বেড়াচাঁপা বলেই অনেকে স্থানটিকে চেনেন। দীর্ঘদিন পর রাজধানীতে ফিরে এসে আবার বসলেন সিংহাসনে। সিংহাসনে বসে চন্দ্রকেতু রাজ্যের অবস্থা শুনলেন, শুনলেন তার অনুরক্ত ভক্ত আকানন্দ বাকানন্দের নিহত হওয়ার সংবাদ। মর্মাহত হলেন খুবই। নিহত হওয়ার পশ্চাতে কে কে ছিলো এ সংবাদ তাঁর কাছে পৌঁছে দিলো তাঁর আর এক একান্ত প্রিয়জন রাম হাজরা। আহত সিংহের মত গর্জে উঠলেন তিনি। সৈন্য পাঠিয়ে ধরেও আনলেন তাদের। কিন্তু ক্ষমা করে দিলেন সবাইকে।

চন্দ্রকেতু আবার রাজা। পাত্র, মিত্র, প্রজা সবাই আবার আসছে তাঁর কাছে। কিন্তু রাজার মনে শান্তি নেই। চলে গেছে সব আপনজন, চলে গেছে প্রিয়তমা রাণী। যুদ্ধে যাওয়ার সময় রাজা দেখেছিলেন রাণী'র চোখে জল, সে করুণ দৃশ্য বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে। মানসিক দিক দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত রাজা শেষ পর্যন্ত সে দুঃখ সহ্য করতে পারলেন না।

রাণী যে জলপূর্ণ স্থানটিতে ডুব দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন রাজাও ঠিক সেই একইস্থানে একদিন ডুব দিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

আর উঠলেন না, হারিয়ে গেল এক যে ছিল রাজা।

●

কল্পনার জালে
মাইজোল-কাঁকজোল

বেড়াচাঁপা-দেউলিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের সম্মুখ দিয়ে পাকা রাস্তা ধরে আগিয়ে যান্ গড়ের দিকে। গড়ের গা বেয়ে শানপুকুরের দিকে গেলেই সবাই দেখিয়ে দেবে দুটি মাঠ। মাঠ দুটির মাথা কখনও ভর্তি সবুজ চিকুরজাল। কখনও সে নেড়া। মাইজোল, কাঁকজোল তার নাম। কেন এ রকম নাম? সে কথা শুনতে গেলে শুনতে হবে কল্পনার জালে জড়ানো এক গল্প উপাখ্যান।

দু'ভাই ছিল হামু মুখোপাধ্যায়, দামু মুখোপাধ্যায়। লোকে ডাকতো হামা-দামা বলে। ওদের নামে এখনও আছে হামাদামা গ্রাম। দু'ভাই এর গায়ে ছিলো বিরাট জোর। এত বড় বীর ছিলো যে এক রাতেই দু'ভাই মিলে আড়াই কোপ দিয়ে কয়েক বিঘার এক পুকুর কেটে ফেলেছিলো। এখনও রয়েছে আড়াই কোপের পুকুর। দু'ভাই একবার মন কষাকষি করে লড়াই লাগায় নিজেদের মধ্যে। লড়াই স্থানকে আজো সবাই ডাকে বীরখোলা নামে। কেউ কোনো দিন পারেনি ওদের হারাতে। এত শক্তি কোথা থেকে পায় অনেকেই চেষ্টা করেছে জানতে কিন্তু পারেনি কেউ সে রহস্য উদ্ঘাটন করতে।

অনেক অনুসন্ধানের পর গায়ে এত শক্তি হওয়ার ব্যাপারটা জানা গেল গোপনে। ব্যাপারটা হলো কি—দু'ভাইয়ের জন্যে ভাত রান্না হলে 'আগ ভাত' বা হাঁড়ীর প্রথম ভাত তারাই খাবে। ওরা না খাওয়া পর্য্যন্ত কেউ খেতে পারবে না সে ভাত। যদি কোনদিন সে "আগ ভাত" তাদের না খাইয়ে কোনো সাদা কাককে খাওয়ানো যায় তা হ'লেই শক্তিহীন হয়ে পড়বে দু'ভাই, ক্ষমতাও আর থাকবে না।

কিন্তু আগ-ভাত সংগ্রহ করা কঠিন কাজ। কারণ দু'ভাই-ই আগে থেকে মাকে নিষেধ করে রেখেছে তাদের না খাওয়া পর্যন্ত

কোনদিন যেন কাউকে ভাত না দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় বাড়িরও কেউ যেন না খায়।

এ দিকে তাদের শক্তিহীন করতে না পারলে দেউলিয়ার রাজাকে পরাস্ত করা যাচ্ছে না, কারণ হামা-দামাই তো রাজার প্রধান ভরসা।

একদিন হলো কি রাজার বিপক্ষে থাকা পীর সাহেব দুপুর বেলা হামা-দামার বাড়িতে এসে দুটো ভাত চাইলেন। প্রথমে না করলেও একে অতিথি তার ওপর দুপুর বেলা ভাত চাইছেন দেখে চুপ করে থাকতে পারলো না হামা-দামার মা। কারণ মহিলা শক্তিময়ী বটে কিন্তু দয়াবতীও।

পীর সাহেবকে ভাত দিলেন হামা-দামার মা। তারপর যা করার পীর সাহেব করলেন। ব্যস্ শুরু হলো খেল। ও দিকে রাজবাড়িতে বসে থাকা হামা-দামার দেহ ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে পড়ছে, গায়ের জোর যেন কমে আসছে।

"নিস্তেজ হইয়া পড়ে দুই ভাই দেহ
অসি না ধরিতে পারে কোনো ভাই কেহ।"

প্রথম দিকে অতশত বুঝতে পারে নি দু'ভাই। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। সব রাগ গিয়ে পড়লো মা'র ওপর। রাগে ভাল মন্দ জ্ঞান হারিয়ে ফেললো তারা। কোন্ রকমে এলো বাড়িতে। বাড়িতে এসে রাগের চোটে মাকে টানতে টানতে নিয়ে চললো রাজার কাছে। বিচার চাই। কিন্তু পারবে কেন? মার তো ছিল বিরাট দেহ, তার ওপর আগের মত তো আর শক্তি নেই হামা-দামার গায়ে। হিঁচড়োতে হিঁচড়োতে দু'ভাই কোনো রকমে এনে ফেললো রাজার বাড়ির সামনের মাঠে। আর যেতে পারছে না। হাঁফিয়ে পড়েছে তারা।

হামা-দামা বিশাল বপুর অধিকারিণী মাকে যেখানে রাখলো ভারের চোটে সেখানকার মাটি গেল চেপে, ছোটো খাটো খালই হয়ে গেল। সেই যায়গাটার নাম লোকে আজো বলে মাইজোল বা মায়ের জোল। জোল কথার মানে হলো "অপরিসর খাল"। এর আগে দু'ভাই হাঁফিয়ে পড়েছিলো বলে দাঁড়িয়ে ছিলো আর এক মাঠে কিছুক্ষণের জন্য। যে মাঠটিতে দাঁড়িয়েছিলো সেখানে মা'র কাঁকের হাড় গিয়েছিলো ভেঙে—তাই সে জায়গাটির নাম হলো কাঁকজোল। কল্পনার কথার কম্বল জড়িয়ে মায়জোল—কাঁকজোল এখনও রয়েছে। একদিন আপনিও দাঁড়াতে পারেন এই জোলে এসে।

জগৎশেঠের জলাশয়
তিনশো বছরের মাটির প্রতিমা
মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান

সেই থেকে ধনলক্ষ্মী বাঁধা পড়লো শেঠদের ঘরে। কবে থেকে ?

সুবে বাংলার নবাব আলীবর্দী অসুস্থ। কোনো চিকিৎসাই পারলো না তাঁকে সুস্থ করতে। অভাব নেই অর্থের। হলে কী হবে ? তাই বিষণ্ণতায় ভরা সকলের মন।

এরই মধ্যে দুরারোগ্য রোগকে নিরাময় করে তুলতে আগিয়ে এলেন এক মহিলা। সবাই অবাক। আরো অবাক হলো সবাই যখন তিনিই শেষ পর্যন্ত সারিয়েও তুললেন নবাবকে। এই মহিলা আর কেউ নন। তিনি হলেন ধনকুবের জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মাতা।

বিনিময়ে বিনীতভাবে নবাব পুরস্কৃত করতে চাইলেন জগৎ শেঠ মাতাকে। কি চাই তাঁর ? স্বর্ণ মুদ্রা, অলঙ্কার, সম্পত্তি ?

না, এসবের কিছুই তিনি চান না। সবাই বিস্মিত। জগৎ শেঠ মাতা নবাবের কাছে পেশ করলেন এক অদ্ভুত দাবি।

আগামী কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন সন্ধ্যায় আপনার রাজ্যে কোথাও যেন আলো না জ্বলে একমাত্র আমার ঘর ছাড়া। এই আমার দাবী, এই আমার প্রার্থনা।

কেন তা আর জিজ্ঞাসা না করে, মৃদু হাসি দিয়ে নবাব উত্তর দিলেন—বেশ তাই হবে।

এল সেই আকাঙ্খিত লগ্ন। কোজাগরী লক্ষ্মী পুজোর দিন। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন ধনলক্ষ্মী। দেবী ঘুরছেন নগরে নগরে। ভক্তের পুজো নেওয়ার জন্যে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার কোথাও আলো নেই কেন ? ক্ষুব্ধ হলেন তিনি। তাঁরই আজ পুজো—অথচ সকলের ঘর অন্ধকার। ক্ষোভে অভিমানে ফিরে যাবেন স্বর্গ রাজ্যে—এমন

সময় দেখেন নগরের একটি মাত্র ঘরে আলো জ্বলছে। আনন্দে উল্লাসে উপস্থিত হলেন সে ঘরে। সোৎসাহে ঘরে ঢুকতে যাবেন সেখানেও বাধা। অবাক হলেন লক্ষ্মীদেবী। এমন সময় করজোড়ে এগিয়ে এলেন শেঠ মাতা। ভক্তি নম্র চিত্তে তিনি দেবী লক্ষ্মীকে বললেন, আপনার চরণ যুগল ধুয়ে দেওয়ার জন্যে কাছের পুষ্করিণী থেকে এক ঘড়া জল আনতে যাচ্ছি। আপনি যদি দুয়ারে একটু অপেক্ষা করেন।

হাসি মুখে দেবী লক্ষ্মী সম্মতি জানালেন সে কথায়।

কিন্তু না শেঠ মাতা আর ফিরে আসেন নি। দেবী লক্ষ্মীকে চিরকালের জন্য গৃহ দুয়ারে আটকানোর উদ্দেশ্যে তিনি কলসী নিয়ে জলে ডুব দিয়ে দিয়েছিলেন—আর ওঠেন নি।

লক্ষ্মী দেবীও আর চলে যেতে পারেন নি। তিনি তো কথা দিয়েছিলেন শেঠ মাতাকে জল নিয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন। সেই থেকে ধনলক্ষ্মী বাঁধা পড়লো শেঠদের দুয়ারে। তাই তাদের বাড় বাড়ন্ত। ধনকুবেরও বলা হতো শেঠদের। শেঠেরাই মায়ের স্মরণে শ্বেতপুরে খনন করেন দীঘি। আজও আছে সে দীঘি। অনেক কাল আগে থেকেই চলে আসা এ কাহিনী এখনও ভোলেনি গ্রামের মানুষ। যদি কোনদিন যান্ এ গ্রামে আপনিও শুনতে পাবেন এ কথা। তাই তো এ গ্রামের নাম হয়েছে শেঠপুকুর তা থেকেই আজকের শ্বেতপুর। বারাসতের 'শেঠ পুকুর' নাকি কেটে ছিলেন মাণিকচাঁদ জগৎশেঠের বংশধর রামচন্দ্র জগৎ শেঠ।

শ্বেতপুরে এসে মৃন্ময়ী মূর্তি দর্শন করে আপনি ধন্য হবেন। তার কথা বলার আগে একটু বলে নিই এ গ্রামে নিঃশব্দে ঘটে যাওয়া আধুনিক কালের এক সংবাদ। সূর্যোদয়ের দেশ জাপান ভারতীয় একটি সংস্থার মাধ্যমে তৈরি করতে দেন মাটির তৈরি জালার ন্যায় আকারের বিভিন্ন পরিমাপের বৈচিত্র্যময় পাত্র যার গায়ে থাকবে নানা অলঙ্করণ। ভারতবর্ষের অনেক স্থানে সম্ভব হয় নি এ কাজ সম্পন্ন করার। পরম গৌরবের কথা সূক্ষ্ম কারুকৃতি সম্পন্ন কাজগুলি সম্পন্ন করতে পেরেছেন মৃৎ শিল্পে পারঙ্গম এ গ্রামের কুম্ভকারেরা। কয়েক পুরুষ ধরে এ কার্যে নিযুক্ত শিল্পীরা আজ আর্থিক কারণে চরম দুর্যোগের সম্মুখীন। তার মধ্য দিয়েও তাঁদের এমন অবিশ্বাস্য শিল্পকীর্তি বঙ্গ গৌরবকেই বৃদ্ধি করেছে। সম্ভবত

এগুলি ব্যবহৃত হবে জাপান দেশের রুচিশীল পরিবারে 'বনসাই, গাছ লাগানোর কারণে।

শ্বেতপুর, বাজিতপুর, বেতানী, মামুদপুর এই চার নিয়ে শ্বেতপুর।

শ্বেতপুর সৃষ্টির গল্প কাহিনী বললাম—বলা হয়নি শ্বেতপুরের আঙিনায় প্রতিষ্ঠিত দেবী কালী কাহিনী।

তিনশো বছর আগেকার কথা। এক সন্ন্যাসিনী ঠাকুরিনী তান্ত্রিক মতে মূর্তি স্থাপন করে কালী সাধনা করেন বিদ্যাধরীর তীরে। স্থানটি জলাজঙ্গলময় ও কাঁটার বাদায় ভর্তি। সেই দুর্গম স্থানটিই তিনি বেছে নেন সাধনার শ্রেষ্ঠ স্থান রূপে। আজ সাধিকা নেই কিন্তু তাঁর সাধনার স্থানটুকুকে আজো লোকে ডাকে "ঠাকুরানীর ভূমি বলে।"

ঠাকুরানী একদিন ঠাকুরের চরণে স্থান নিলেন, স্বর্গ লাভ করলেন। কিন্তু তাঁর আরাধিত দেবী পুজো প্রায় বন্ধ হয়ে গেল। প্রত্যহ কে করবে পুজো? কে নিত্য দেবী পদে পত্র পুষ্প দেবে? যিনি জগৎ পালিকা যিনি সকলকে দেখা শোনা করেন—অভাব হলো তাঁকেই দেখা শোনার মানুষের।

হঠাৎ এ সময় স্বপ্ন পেলেন গ্রামের রায় পরিবারের একজন। রায় পরিবার নদী তীর থেকে দেবীকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন নিজ ভদ্রাসনে। পূজারতি ভাল ভাবেই চলছিলো। দেখা শোনা করছিলেন অকৃতদার জগন্নাথ রায়। কিন্তু দেখা দিলো গণ্ডগোল। নিত্য পূজা করলে, পূজারী ব্রাহ্মণ হলে পুত্র কন্যাদের স্বশ্রেণীতে বিয়ে দেওয়া কঠিন হবে—এমন কানা ঘুসা শুরু হলো। সামাজিক দোষও ঘটবে। একথা জানতে পেরে মধ্যম ভ্রাতা রামবল্লভ সমস্ত ঘটনা জানিয়ে পত্র লিখলেন নদীয়ার মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে, একথাও জানানো হলো কালী মায়ের পূজা বন্ধ হওয়ার সামিল। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দান ধ্যানের কথা সকলেরই জানা। ধর্মের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল অসীম।

মহারাজ এ কথা জানতে পেরেই মন্দির পরিচালনার জন্যে ৬০ বিঘা জমি দান তো করলেনই এবং শ্বেতপুর থেকে দুশো উনত্রিশ বছর আগে লেখা পত্রের উত্তরে লিখলেন—

"শ্রীরাম বল্লভ রায় সুচরিতেষু নমস্কার প্রয়োজন বিশেষ পরগণে আনোয়ারপুর শ্বেতপুর গ্রামের প্রান্ত ভাগে নোনা গাছের ধারে ভৈরবীর স্থাপিত এক ঠাকুরাণী ছিলেন। ভৈরবী মহাশয়ার মৃত্যু হওয়ায় তথায় ঠাকুরাণীর পূজাদি সেবা না হওয়ায় তুমি তথা হইতে

মহামায়াকে আপন ভদ্রাসনে স্থাপিত করিয়াছ। তুমি নিজে পূজাদি করিলে জাত্যাংশে কলঙ্ক হয় এবং সেবাইত ব্রাহ্মণ রাখিয়া পূজাদি করাইবার ক্ষমতা নাই! পরগণা উখড়া আনোয়ার পরগণার ৬০ বিঘা ভুমি দেওয়া হইল (জমির বিবরণ লায়েক ইত্যাদি)। দেবোত্তর ভুমি আপন দখলে রাখিয়া উহার উপসত্ব হইতে সেবাইত ব্রাহ্মণ রাখিয়া মহামায়ার পূজাদি সেবা করাইবা। কোন মতে অন্যথা না হয়।" সন ১১৬৫ সাল ১২ই ফাল্গুন।

না আর অন্যথা হয়নি। দানপত্র এলো তিন ভাইয়ের নামে রাম বল্লভ রায়, জগন্নাথ রায়, রামাচরণ রায়। পুজো করার হাত থেকে তিন ভাই নিষ্কৃতি পেলেন। প্রথম পূজার দায়িত্ব পেলেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ রামসুন্দর চক্রবর্তী। মধ্যমগ্রামের অদূরে বধিষ্ণু গ্রাম বাদুতে তাঁর বাড়ি। পরে আসেন নদীয়ার শান্তিপুর থেকে নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী। তাঁরই উত্তর পুরুষ সত্যানন্দ গোস্বামী বর্ত্তমানে পরিচালনা করেন নিত্য পূজার কাজ। মন্দিরের আয় অতি সামান্য। কায়ক্লেশে চলে তাঁর দিন।

প্রতিদিন পুজো হয়—বিশেষ পুজো হয় শনি মঙ্গলবার সহ মাঘ মাসে রটন্ডী পূজা, শ্যামা পূজা হয় কার্তিক মাসে। সেদিন থেকে কত ভক্ত এসেছেন শ্বেতপুরের মাটিতে তার হিসাব মেলানো কঠিন।

শ্বেতপুর গ্রামে রয়েছে বাংলা ছায়াচিত্র জগতের প্রখ্যাত শিল্পী জহর গাঙ্গুলীর বাড়ী।

শ্বেতপুর কালিবাড়ীর সম্মুখে রয়েছে সুন্দর এক শিব মন্দির। ১২৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরটি ও শিবলিঙ্গ আজো ঔজ্জ্বল্যে ভরপুর। কিন্তু প্রাচীন কালী বাড়ির অবস্থা খুবই সঙ্গীন। ১৩২৭ সালে পাশের গ্রাম মীর্জাপুরের ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের অর্থানুকুল্যে একবার সংস্কার হয়। বর্তমানে ছাদের অবস্থা শোচনীয়, দেওয়ালের পলেস্তারা খসে পড়ছে। দরজা-জানালাও ভগ্নপ্রায়। তারই ওপর ভক্তজন ঈপ্সিত আকাঙ্খা পূরণের আশায় বেঁধে রেখে গেছে ইষ্টক খণ্ড। প্রতিমাটি মাটির তৈরি। প্রায় তিনশো বছর ধরে এ দেহ নিয়েই তিনি বিরাজ করছেন ভক্ত মাঝে। বিপদ হবে এ আশঙ্কায় আজও পর্যন্ত কেউ সাহস করেনি মাটির প্রতিমার পরিবর্তন ঘটিয়ে পাথরে বা অন্য ধাতুতে প্রস্তুত করতে। তাই তিনি আজও মৃন্ময়ী। যিনি আনন্দময়ী তিনিই দুর্গা, তিনিই কালী, তিনিই জানেন তাঁর কীইচ্ছা!

●

কামদেবকাঠি, ঠাকুরবর হাট

জীবনপুর চৌরাশীর চওড়া মাটির রাস্তা ধরে ভেঙে পড়া নীলকুঠীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান্ কলসুরের দিকে। পদ্মার ধার বরাবর গেলেই চলবে। চৌকিপোতা পার হয়ে শেষ করুন আপনার পথ চলা। একটু বাঁ পাশেই ঠাকুরবর হাট। এ অঞ্চলেরই শেষ সীমানায় কামদেবকাঠি গ্রাম। এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যুক্ত কাহিনী পার হয়ে এসেছে প্রায় চারশ বছরের পথ রেখা। স্থান দুটির নামের সাথে জড়িয়ে থাকা যে মহান মানুষটির কথা বলতে চলেছি, জনশ্রুতি তিনি নাকি প্রকৃতির শান্ত সমৃদ্ধ এ সকল এলাকায় আপনমনে ঘুরতেন— অবস্থানও করতেন মাঝে মধ্যে। সে সাধকের নামে সাধা বেদনামধুর কাহিনী শুনতে গেলে কিছুক্ষণের জন্য আপনাকে যেতে হবে বাংলাদেশের যশোর জেলায়।

লাউজানী গ্রাম, জেলা যশোর। সেখানকার রাজা ছিলেন মুকুট রায়। ধর্ম্মের প্রতি তাঁর ছিল প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ঘটনাচক্রে তাঁরই জীবনে নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। মুকুট রায়ের সাথে যুদ্ধ হয় পীর বড় খাঁ গাজীর। যুদ্ধে পরাজিত হন মুকুট রায়। রাজা মুকুট রায়ের ছিল এক পুত্র ও এক কন্যা। পুত্রের নাম কামদেব রায়, আর অপরূপা রূপবতী কন্যা চম্পাবতী। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাজা বাধ্য হোন কন্যা চম্পাবতীকে বড় খাঁ গাজীর সাথে বিয়ে দিতে। গাজী সাহেব চম্পাবতীকে নিয়ে রওনা দেন বাড়ীর পথ লাবসা গ্রামের দিকে। পাল্কী করে চলছিলো চম্পাবতী। তাকে বিয়ে করার জন্য রাস্তায় অনুষ্ঠিত উৎসবের ধরণ-ধারণ দেখে পাল্কীর মধ্যেই আত্মহত্যা করে চম্পাবতী। অনেকে বলেন না,—তিনি মানসিক যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে শ্বশুর বাড়ী থেকে পালিয়ে এসে আশ্রয় নেন সাতক্ষীরার গণরাজার কাছে। সেখানে বাকী জীবন কাটান ধর্ম্ম সাধনায়। সবাই তাঁকে এ সময় 'মা' বলে ডাকতো। মৃত্যুর পর তাঁর স্মরণে লাবসা গ্রামে তৈরী হয়

'মাঈচম্পার দরগা'। আজো সকল ধর্ম্মমতের মানুষ সম্মান জানায় মাঈচম্পার দরগাকে।

চম্পাবতীর ভাই কামদেবও ছিলেন বাবার মত ধর্ম্ম ভীরু মানুষ। বোনের বিয়ের পর তাঁরও নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতে হয়। মনের দুঃখে গৃহত্যাগ করেন তিনি। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসেন চারঘাট গ্রামে। মসলন্দপুরের কাছে যমুনার তীরে অবস্থিত চারঘাট গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ মুগ্ধ করে কামদেবকে। চারঘাটকে বেছে নেন সাধনাস্থল রূপে। সেখানেই অতিবাহিত করেন জীবনের শেষ দিন পযন্ত। তাঁর জীবনধারণের বৈশিষ্ট্য হলো— মুসলমান হয়েও তাঁর জীবন যাপনের পদ্ধতি ছিলো হিন্দু প্রথায় চলা। চারঘাটে তাঁর সমাধির গায়ে আছে পৈতা। সেখানে দৈনিক পূজায় আজো ব্যবহৃত হয় ফুল বেলপাতা। এখানেই গভীর সাধনার ফলে 'কামদেব ঠাকুর' ঈশ্বরের 'বর' বা আশীর্ব্বাদ লাভ করেন। কামদেব জনসাধারণের কাছে পরিচিত হন 'ঠাকুরবর' নামে। 'ঠাকুরবর' হন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। মহারাজ প্রতাপাদিত্য সিংহাসনে আসীন ছিলেন ১৫৬০-১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, তিনিও মাঝে মাঝে ঠাকুরবরের কাছে আসতেন তাঁর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করতে। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই তাঁকে ভাল বাসতো নিবিড় শ্রদ্ধার আসনে বসিয়ে।

কামদেব স্মরণে চিহ্নিত হয়েছে দুটি স্থান কামদেবকাঠি ও ঠাকুর হাঠ। ঠাকুরবর হাটে রয়েছে নজরগাহ; গ্রাম কামদেবকাঠি এখন ওপার বাংলায় মানুষের স্থায়ী ঠিকানা। আরো একটা গ্রাম আছে কামদেবপুর, আমডাঙ্গা থানায়। ঠাকুরবর হাট বসে শনি-মঙ্গলবারে। আগে নজরগাহে ফকির—মিসকিন আসতো। এখন আর কেউ আসে না। আগে মানত করতো, এখন কেউ করে না। সামনে কোলাহল মুখরিত দোকানপাট, পশ্চাতে নিস্তব্ধ নীরব ভগ্ন নজরগাহ। সামনেই বিদ্যুতের আলোর ঝলকানি কিন্তু নজরগাহে জ্বালেনা প্রদীপের আলোর পবিত্র শিখাও, নজরগাহ পড়ে আছে অনাদরে অবহেলায়, সকলের নজরের বাইরে।



স্থাপত্যের অপূর্ব নজীর—
সাত গম্বুজ মসজিদ

স্থাপত্য শিল্পের এমন নজীর অন্ততঃ ২৪ পরগণার মসজিদ নির্মান ক্ষেত্রে নেই বললেই চলে। নগরীর কোলাহল থেকে বহু দূরে শান্ত রসাস্পদ এমন স্থানই বোধ হয় প্রার্থনার শ্রেষ্ঠ স্থান। স্থাপয়িতা নেই—কিন্তু আপনা থেকেই তাঁর ওপর এসে পড়ে অসীম শ্রদ্ধা।

শুক্রবার। সমবেত মানুষের প্রার্থনার পূর্বে বাতাসে ভেসে উঠেছে আজানের সুমধুর ধ্বনি। মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করুন। ভিতরের অকল্পনীয় গাম্ভীর্য আপনাকে করে তুলবে বিস্মিত; বাইরের নৈঃশব্দে আপনি হবেন পরম মুগ্ধ। তিনশো বছর পার হয়ে গেছে রায়কোলার শাহী মসজিদের নির্মাণ কাল। তখন দিল্লীর সিংহাসনে সম্রাট ঔরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭)। ১১০৪ হিজরী, বাংলা ১০৯১ সাল ইংরাজী ১৬৮৫ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত রায়কোলার শাহী মসজিদ শুধুমাত্র দেগঙ্গার ক্ষেত্রে নয় বাঙালার মসজিদ নির্মাণ পর্বের এক উজ্জ্বল ও উত্তম নিদর্শন।

পর পর সাতটি সুউচ্চ গম্বুজ বা গোলাকার ছাদ দূর থেকেও আকৃষ্ট করে পথচারীকে। শিখর ভাগে রয়েছে সিমেণ্ট বা ঐ জাতীয় মসলা দ্বারা নির্মিত সরু দন্ড। নির্মাণ কালে দীর্ঘ মসজিদ অভ্যন্তরে ছিল না কোনো স্তম্ভ বা প্রাচীর। প্রস্তুত রীতিতে কারিগরী বিদ্যার এমন আশ্চর্য কৌশল আধুনিক কালের স্থপতিদেরও ভাবিয়ে তোলে। ১৩৪৫ সালে একবার সংস্কার হয়েছিলো এটি। কালের নিয়মে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভবনায় বর্ত্তমানে ভিতর অংশে তৈরী করা হয়েছে তিনটি স্তম্ভ।

প্রসঙ্গক্রমে ভেসে ওঠে প্রথম তৈরী হুগলীর জাফর খাঁর মসজিদের কথা। বাংলার এ মসজিদটি তৈরী হয়েছিলো ৬১৮ হিজরী বা ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দ। আমরা আর এক গৌরবের

অধিকারী—প্রতিবেশী বসিরহাটের শালিক বা শাহী মসজিদ নিয়ে। তৈরী করেন উলুখ খাঁ নামে আমীর। ১৪৬৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত মসজিদটি বয়সের হিসাবে বাংলার দ্বিতীয়। অবশ্য আমরা বঞ্চিত হয়েছি বাংলার মালদাহ জেলার গঙ্গারামপুরের অপর এক পুরাতন মসজিদ দর্শন থেকে। শিলালিপিতে যার নির্মাণকালে ৬৪৭ হিজরী বা ১২৪৮ খ্রীস্টাব্দ উল্লেখ থাকলেও খুঁজে পাওয়া যাই নি মসজিদটির অস্তিত্ব। কিন্তু আজও সুন্দর—সৌন্দর্যময় অস্তিত্ব নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে রায়কোলার শাহী মসজিদ—যার দৈর্ঘ্য ১৪৪ ফুট, প্রস্থ ১৫ ফুট, গম্বুরের দৈর্ঘ্যতা ১২৮ ফুট, ৬ ফুট পুরু এর প্রাচীর।

এ কথাও শোনা যায় অনেকেরই মুখে—এটি নাকি একদা দুর্গ ছিল। রাজ্য রক্ষায় নবাব বাদশারা সৈন্যদের থাকার জন্য নির্মাণ করেছিলেন এটিকে। কিন্তু এ ব্যাপারে জোরালো স্বাক্ষ্য দেয় না ইতিহাস।

নদীয়া-রাজের দানের সীমা পরিসীমা নেই। উদারচেতা মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র প্রকৃতির সুন্দরতম লীলা নিকেতনে অবস্থিত শাহী মসজিদের যথোপযুক্ত ভাবে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দান করেন একশো বিঘা জমি। অবশ্য সে জমি আজ আর মসজিদের নামে নেই। খাদেম বা সেবায়েত বৃন্দ বণ্টন করে নিয়েছেন নিজেদের মধ্যে।

উদ্বেল কিন্তু বিনয়ার্দ্র চিত্তে প্রতি জুম্মাবার অর্থাৎ শুক্রবারে সমবেত হন কাছের ও দূরের বহু নারী-পুরুষ-শিশু। হাতে তাঁদের মাটির কিম্বা কাঁচের আধার। পানি অথবা তেলে পূর্ণ সেগুলি। গভীর বিশ্বাস নিয়ে আনা পাত্রগুলি রাখেন এখানে। কোন অলৌকিক কিছু স্পর্শ করে যায় এর তরল তরঙ্গে। অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে ব্যবহার করেন তাঁরা। মুক্ত হন মনের বেদনা থেকে, সুস্থ হন শারীরিক অসুস্থতা থেকে। বহু যুগের ওপার হতে চলে আসা এ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজও বইছে সমানভাবে।

কয়েক গজ দূরে চলছে আগুন আর ধোঁয়ার খেলা। মানত করেছিলেন এঁরা, রান্না হচ্ছে। ফকির-মিসকিনকে দান করবেন—নিজেরাও গ্রহণ করবেন। দুর-দুরান্তের নর-নারীই বেশি। ইটিন্ডাঘাট পার হয়ে সীমান্তের কাছাকাছি গ্রাম থেকে সুন্দর দেহের গড়ন নিয়ে আসা তরুণীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কিসের

জন্য মানত? লজ্জা জড়ানো মুখে হেসে উঠেছিলো সেই স্বাস্থ্যবতী। উত্তর পাইনি। উত্তর দিয়েছিলো বাদুড়িয়ার তেঁতুলিয়া ব্রীজের কাছ থেকে আসা এক জননী। কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছিলো তাঁর প্রিয়তম সন্তান। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান তাকে নাকি পারে নি সুস্থ করে তুলতে। মানত করেছিলেন এখানে। জননীর আকুল প্রার্থনা তিনি শুনেছেন। তাই আজ আবার এসেছেন। রীতি নীতি অনুযায়ী তিনিও প্রস্তুত হচ্ছেন রান্না করা খাদ্যবস্তু ফকির মিসকিনকে দান করতে। খিলখিলিয়ে হেসে উঠলো জননীর সুস্থ হওয়া শিশুটি। একই সাথে পাখির কলকাকলিতে ছোট্ট বনানী হয়ে উঠলো মুখরিত।

তুলে ধরতে পারি রায়কোলা'র অদূরে দক্ষিণ কলসুরের মুন্সী পাড়ার মসজিদের দৃষ্টান্ত। তিন গম্বুজ যুক্ত মসজিদটি আকারে ছোট হলেও মনে হয় এটি নির্মিত হয়েছিলো শাহী মসজিদের অনুকরণেই। দীর্ঘ দিন ঢাকা পড়ে ছিলো জঙ্গলে। প্রাচীরের গায়ে জমে থাকা ছেদলা সরিয়ে দেখলাম স্থাপিত হওয়ার তারিখ ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দ। মসজিদ প্রাঙ্গণে বর্তমানে শুরু হয়েছে মক্তব। আজথেকে দুশো পঁচিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে কত ধর্ম প্রাণ মানুষের প্রার্থনায় মুখরিত হয়ে উঠেছে এ মসজিদ প্রাঙ্গণ কে জানে।

রায়কোলার শাহী মসজিদের পূর্ব-প্রান্তে রয়েছে শাহ সৈয়দ হজরত মোকতার রহমাতুল্লা'র সমাধি। ধর্মপ্রাণ শাহ সৈয়দ এসেছিলেন সুদূর আরব দেশ থেকে। অনাবিল আনন্দময় রায়কোলাতেই তিনি থেকে যান। পদ্মার শাখা তখন এ গ্রামের পাশ দিয়েই বইতো আপন ছন্দে। তাঁর সমাধির ওপর উৎকীর্ণ রয়েছে ১২৪২ হিজরী বা ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে। সুরম্য মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথের সম্মুখেই তিনি ঘুমিয়ে আছেন চিরকালের জন্য। প্রকৃতির মহান আঙিনা, বটবৃক্ষের শীতল ছায়া, মসজিদ থেকে ভেসে ওঠা আজানের সুমধুর ধ্বনি—পরম প্রশান্তিতে ঢেকে রেখেছে শাহ সৈয়দকে।



রবিকৃষ্ণ দর্শনে এসেছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব

সুরধনী গঙ্গার ধার বরাবর খড়দহ, পাণিহাটি, ওদিকে রয়েছে আগরপাড়া। এখানকার পথে প্রান্তরে মন্দিরে যে সব সুমধুর কথার মালা গাঁথা রয়েছে তার অনেকাংশ বেড়াচাঁপা, দেউলিয়া, চৌরাশী, দেগঙ্গাকে কেন্দ্র করে। সে সব কথা শুনে মুগ্ধ হতে হয়, হতে হয় অবাক। বার বার এখানকার পথ পরিক্রমাকালে হারানো দিনের সুবাসিত ঘ্রাণ নিতে নিতে একদিন দাঁড়ালাম দোল মঞ্চের সম্মুখে এসে।

দোল মঞ্চ, ফাল্গুনী পূর্ণিমায় খড়দহের দোল উৎসবের খ্যাতি সর্বত্র। কিন্তু পঞ্চম দোল? এতো নতুন কথা? বাংলাদেশে এ দোল প্রথম প্রবর্তন করেন রাঘব পণ্ডিত। ধর্ম, অর্থ, কাম, ক্রোধ, মোক্ষ, পঞ্চম পুরুষত্ব প্রেমের প্রতিফলন ঘটেছে পঞ্চম দোলে। খড়দহের উৎসবের পাঁচদিনের মাথায় পাণিহাটিতে শুরু হয় পঞ্চম দোল। মদন মোহন আরোহণ করেন মঞ্চে। এখন আর করেন না। প্রায় কুড়ি ফুট উঁচু মঞ্চের চারপাশই উন্মুক্ত। সব দিক দিয়েই দর্শন করা যেত তাঁকে। মূল মন্দিরের দিকে থাকতো তাঁর সম্মুখ ভাগ। দেউলিয়ার রাজা চন্দ্রকেতু তৈরি করেন এ দোল মঞ্চ। আজও একথা স্মরণে রেখেছে পাণিহাটির নর-নারী। রাজা চন্দ্রকেতু নিত্য এখানে আসতেন গঙ্গা স্নানে—সেই ঘাট বা যেখানে তিনি প্রত্যহ নামতেন নৌকা থেকে তাঁর চিহ্ন কালের প্রহরে মলিন হলেও গঙ্গার স্রোত আজো বোনে সেই অতীত স্মৃতির ঢেউ। ইতিহাস বলে—বেড়াচাঁপা-দেগঙ্গা থেকে পানিহাটি পর্যন্ত যাতায়াতের জন্য রাস্তাও তৈরি করে দিয়েছিলেন রাজা চন্দ্রকেতু। আজ নেই তবে বেশ কিছু আগেও সেটেলমেণ্ট রেকর্ডে রাস্তার নামটি চিহ্নিত ছিল চন্দ্রকেতুর নামে। পয়ঃপ্রণালী নিদর্শনটিও তাঁর তৈরী। এসব এলাকা 'ভবানীগড়' ছিল দেউলিয়ার রাজার অধীন। যে দোল মঞ্চে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত রাধা কৃষ্ণ আরোহণ করতেন, যার

পাদপীঠে ঘটতো হাজারো ভক্তের সমাবেশ সে মঞ্চ আজ পরিত্যক্ত। শঙ্কিত হয়ে পড়ি এ দৃশ্য দেখে মধুর স্মৃতি-বিজড়িত দোল মঞ্চের সারা দেহ ঘিরে ফাটল ধরেছে। গাছপালা ভর করেছে তার গায়ে। স্থাপত্য শিল্পটির রূপ হয়েছে কঙ্কালসার। জমি হয়েছে হস্তান্তরিত। আর কয়েক দিনের মধ্যেই হারিয়ে যাবে লক্ষ্মণ সেনের পর বাংলার শেষ হিন্দু রাজার স্মৃতি চিহ্নটি।

কয়েক মাস পর আবার গিয়েছিলাম পবিত্র সেই অঙ্গন দর্শন করতে। বলার মত এক কীর্তি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। অবলুপ্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছে দোল মঞ্চটি। ঐতিহাসিক সম্পদটি সংস্কার করে দিয়েছেন বিপ্রদাস চট্টোপাধ্যায়। উদ্বোধন হয়েছে ১৯শে ফাল্গুন '৯৪ অর্থাৎ পবিত্র দোল পূর্ণিমায়। দেহ আজ তার আবার ভরে উঠেছে যৌবনশ্রীতে।

পায়ে পায়ে একটু আগিয়ে যান্। গঙ্গার তীরে রয়েছে বিশাল কালী মন্দির। গঠনশৈলী গর্বিত করে সকলের। কথিত আছে মন্দিরে পূজিতা তারামা তো ছিল রাজা চন্দ্রকেতুর গৃহে। দেউলিয়াতেই একদিন ছিল এ মূর্তি। পুজো হতো রাজার ঘরে। তারপর এক অশুভ মুহূর্তে রাজ পরিবারে নেমে এল দুর্যোগের ঘনঘটা। এক যুদ্ধে রাজা হন বন্দী। পরিবারের সবাই ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়লো। আপনজন যারা তারা পালালো এদিক ওদিক। গৃহদেবী তারামার পায়ে পড়ে না পুষ্প বিল্বপত্র। আশ্চর্যভাবে তারা মা দীর্ঘ দিন পড়ে রইলেন গঙ্গার গড়ের তীরের জলে।

কলস্বনা গঙ্গার তীরবরাবর ছড়িয়ে রয়েছে বহু ধর্মীয় আশ্রম। পরার্থে উৎসর্গীকৃত প্রাণনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মময় জীবনের বহু কিছু মহান কর্ম ছড়িয়ে রয়েছে পানিহাটিতে। একদিন রাত্রে ভক্ত প্রাণনাথ স্বপ্ন দেখেন।

ওরে আমি অনেককাল পড়ে আছি গঙ্গার গড়পারে। চন্দ্রকেতু আমায় পুজো করতো। তুই তুলে এনে আমায় প্রতিষ্ঠা কর।

ঘুম ভেঙে গেল প্রাণনাথের। গঙ্গার তীরে তৈরি করলেন সুবিশাল মন্দির। গঙ্গা থেকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করলেন দেবীকে। যদিও সময়ের বিচারে ঠিব ভাবে মেলে না। অপূর্ব এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ। যদি কোনো দিন অবসর পান—রক্তিম আলো ছড়িয়ে সূর্য যখন অস্তাচলে যাচ্ছে সেই দুর্লভ মুহর্তে দাঁড়ান এসে প্রাণনাথের বিরাট মন্দিরাঙ্গনে। গঙ্গা গা বয়ে বয়ে চলেছে

আপন ছন্দে। অপূর্ব অনুভূতি সঞ্চারিত হবে আপনার দেহ মনে।

দুঃখের বিষয়—প্রাণনাথ যাঁদের ওপর দায়িত্ব দিয়ে গিয়েছিলেন দেবসেবার ও মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের তাঁদের বর্তমান আর্থিক অবস্থা দারুণ শোচনীয়। এখনই নিত্য সেবাই প্রায় অনিত্যে এসেছে, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ সে তো দূরের কথা। সে কথা ভেবেই এখন থেকে হয়ে পড়ি বিষণ্ণ।

এলাকা ছিল ভবানীগড়ের অধীন। ভবানীগড়ে ছিল দেউলিয়ারই রাজার ভবানী মন্দির। আগরপাড়াতে রয়েছে তারাপুকুর। তারাপুকুর ঘিরে থাকা গল্পটাও শুনতে পারি আমরা।

একবার যুদ্ধ বাধে তারশা পীরের সাথে রাজা চন্দ্রকেতুর। যুদ্ধে পীর পরাজিত ও নিহত হন। পীরের নামে মেলা বসে সে সময় থেকেই। এভাবেই মেলা সৃষ্টি করে শ্রদ্ধা জানায় শিষ্যগণ। সে মেলা শুরুর অন্য আর এক প্রবাদ সুষমাময় হয়ে বেঁচে রয়েছে। মাতারা ছিলো রাজা চন্দ্রকেতুর আরাধ্য দেবী। কালী-করাল বদনার আর এক নামই তো তারা। এক যুদ্ধে দুঃখের রাত্রি নেমে আসে রাজার জীবনে। বংশের সকলে হন ধ্বংস। গৃহ দেবী মাতারা আশ্রয় নেন তারা পুকুরের কোন এক স্থানে। সেই পুণ্য কারণেই নাকি স্থানটি পরিচিত হয়ে ওঠে তারাপুকুর নামে।

দেগঙ্গা-চৌরাশীকে কেন্দ্র করে অতীত স্মৃতির জালে জড়ানো সবচেয়ে মহিমাময় কাহিনী বলা হয়নি এখনও। সে মিষ্টি কথা ভাবতে গিয়ে আনন্দে আবেগে ভরে ওঠে মন; সে কথা ভাবতে গিয়ে অনুভব করি অলৌকিক শিহরণ।

গঙ্গাপ্রসাদ চতুর্বেদী রাজা চন্দ্রকেতুর কুলপুরোহিত। হাদীপুরের অল্প দূরে দুই বীর ভাইয়ের নামে হামাদামা গ্রাম। সেখানে রাজার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে তিনি ফিরছেন পানিহাটিতে। পদ্মাকে আদর করে অনেকে গঙ্গা বলতো। গঙ্গা বেয়ে নৌকা আসছে তরতরিয়ে। এমন সময় নদীর তীরে দাড়িয়ে রয়েছে একটি বালক ও একটি বালিকা। দূর থেকে হাত তুলে বালক-বালিকাদ্বয় ডাকছে নৌকার মাঝিকে। আশপাশ জনশূন্য। লোকজন নেই কোথাও। ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

আচ্ছা নৌকাটাকে ওদের কাছে নিয়ে চলো। দেখি ওরা কি বলে—বললেন চতুর্বেদী পণ্ডিত।

নদীতীরে নৌকা পৌঁছালো। বালক-বালিকাদ্বয় করুণ স্বরে বলে উঠলো—আমরা যেতে পারছি না। তোমাদের নৌকায় আমাদের একটু নিয়ে চলো না।

ঠিক আছে তুলে নাও ওদের—বললেন চতুর্বেদী। একথা বলতেই মাঝি ওদের তুলে নিয়ে নৌকা আবার চলতে শুরু করলো।

পুরোহিত মশাই গল্পে ব্যস্ত নৌকার অন্যান্য সহযাত্রীদের সাথে। ইতি মধ্যে চাটুজ্জ্যেদের বাড়ীর সামনে আসতেই টপ করে নেমে পড়লো বালক-বালিকাদ্বয়। দেখতে পেলো সবাই। কিন্তু গুরুত্ব দিলো না কেউ। তার মধ্যে আবার একজন বলে উঠলো—ভালই হয়েছে নেমে গেছে, একটু হাল্কা হয়েছে।

যে যার ঘরে ফিরে গেছে পাণিহাটিতে এসে। কিন্তু ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন রাজ-পুরোহিত গঙ্গাপ্রসাদ। কে যেন বলছে ওরে আমাদের তুই চিনতে পারলি নে। সারা জীবন ধরে যারে তুই খুঁজছিস আমরা তো সেই ই। আমাদের এনে প্রতিষ্ঠা কর। তোর আর কোন দুঃখই থাকবে না।

ঘুম ভেঙে গেল চতুর্বেদীর। সূর্যোদয়ের আগেই ছুটলেন দেগঙ্গার চাটুজ্জ্যেদের পুষ্করিণীর কাছে যেখানে ওরা নেমে পড়েছিলো, সেখানে শুদ্ধ চিত্তে ডুব মারলেন চতুর্বেদী। ডুব মারতেই হাত পড়লো এক খন্ড কালো রঙের প্রস্তর। তাকে তুললেন ওপরে। কিন্তু একি—এযে শুধু এক খন্ড প্রস্তর নয়। এক অপরূপ রূপ নিয়ে স্নিগ্ধ নয়ন মেলে চেয়ে আছেন মদনমোহন। বুকে জড়িয়ে ধরে তাঁকে নিয়ে এলেন আপন ঘরে। নিবিড় শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করলেন পাণিহাটিতে। তাঁর সেবায় নিযুক্ত হলো প্রপৌত্র পরম কৃষ্ণপ্রেমী রাঘব পন্ডিত। বাংলার শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব তীর্থে পাটবাড়ি রাঘব ভবনের সাথে জড়িয়ে পড়লো দ্বিগঙ্গার নাম।
মহৎ কর্মকান্ড পরিচালনায় রয়েছেন পাণিহাটি বৈষ্ণব স্মৃতি সংরক্ষণ সমিতি। রাঘব ভবন সহ বিশাল চত্বর নির্মাণ করে দিয়েছেন উদার চেতা ভক্ত রবীন রাহা. পুণ্যময় এমন অক্ষয় কাজ করে তিনি অর্জন করেছেন সবার গভীর শ্রদ্ধা।

কিন্তু কোথায় যেন শূন্যতা থেকে যাচ্ছে। শূন্যতা তা থাকবেই। কারণ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয় রাধা নেই তাঁর পাশে। যুগল মূর্তি দর্শন করতে না পেরে ভক্তকুল যেন ব্যথিত। কে যেন একদিন চতুর্বেদীকে

বললেন—মাধবকে যেখানে পেয়েছিস সেখানেই খোঁজ। সেখানেই তাঁকে পেয়ে যাবি। আবার ছুটলেন চতুর্বেদী সেই চাটুজ্যেদের পুকুরে।

আমরাও খুঁজেছি চাটুজ্যেদের পুকুর। পেয়েছি সেই পুণ্য জলাশয়। গল্প শুধু গল্প নয়। সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে এর সৃষ্টি। চৌরাশী গ্রামের হরিহর হালদারের ভিটের কাছে এখনও রয়েছে চাটুজ্যেদের পুকুর। হরিহরের বাবা মারা গেলে মা সহমরণে যান। লোকে বলতো হরিহরের মা 'সতী' হয়েছে। সে কথা অনেক কাল আগের কিন্তু এখনও মনে আছে দু একজন বৃদ্ধার। বলছিলাম চাটুজ্যেদের পুকুরের কথা। চাটুজ্যেরা ছিল এক সময় এখানকার জমিদার। সে সময় তাঁদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল বিরাট। আজও শোনা যায় তাঁদের নিয়ে রচিত প্রবাদ ছড়া—

"চৌরাশীর চাটুজ্যে ছিল বড়ই ধন-মানে
সেই বংশ হইল ধ্বংশ কাল পরিবর্তনে।"

এখন জমিদারী নেই—তারাও গ্রাম ছেড়ে চলে গেছেন এদিকে ওদিকে। শুনেছি তাঁদের পরিবারের এক তরুণী বিমান চালনায় দক্ষতার পরিচয় দিয়ে প্রচুর অভিনন্দন পেয়েছেন। তাঁদের জমি জমা পড়ে আছে। পড়ে আছে সে জলাশয়। এক সময় এ পুকুরের জল নিয়েই পূজা-পার্বনাদি সহ শুদ্ধ কাজ সম্পন্ন হোত। তাই সেদিন থেকে আজো একে ডাকে 'পূণ্য পুকুর' বলে। পরিমাপ ছিল ৭।৮ বিঘার মত। শান বাঁধনো ঘাটের ইটগুলিই জোরের সাথে বলছে সে পুরাতন। একদা এ জলাশয়ের সাথে সংযোগ ছিল পদ্মার।

দৃঢ় বিশ্বাস এই সেই 'পুণ্য-পুকুর' যেখান থেকে চতুর্বেদী খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর প্রাণের বংশীবদনকে। সেখান থেকেই পুনরায় খুঁজে মাথায় করে নিয়ে এলেন রাধাকে। প্রতিষ্ঠা করলেন কৃষ্ণ পার্শ্বে। বেজে উঠলো কাঁসর ঘন্টা। বিনম্র চিত্তে ভক্তগণ চেয়ে থাকেন যুগল মূর্তির দিকে। তবুও কোথায় যেন আবারও শূন্যতা রয়ে যাচ্ছে। উৎসবে যেন প্রাণ নেই।

ব্যথা নিয়ে দিন কাটাচ্ছেন গঙ্গাপ্রসাদ প্রপৌত্র কৃষ্ণপ্রেমী রাঘব পন্ডিত। তিনিই তো অনেকদিন হলো তুলে নিয়েছেন তাঁকে সেবা করার।

রাঘবের কেন যেন মনে হচ্ছে মহাপ্রভু চৈতন্যদেবে এলেই সব ইচ্ছা তাঁর পরিপূর্ণ হবে। প্রাণ ফিরে পাবে তাঁর প্রাণের ঠাকুর। মহাপ্রভু'র অন্তরে পেঁছোলো সে কথা। ঠাকুর এসেছেন খড়দহে,

নিত্যানন্দ তাঁর সাথে, রয়েছে আরো পার্ষদ। সেখান থেকে তিনি এলেন পাণিহাটিতে। পাণিহাটি তখন তীর্থভূমি। গঙ্গার তীর বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা তখন বৈষ্ণব ও তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান। পাণিহাটির সে পরিচয় ফুটে ওঠে ষোড়শ শতাব্দীর সপ্তম দশকে জয়ানন্দ রচিত চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে—

"পাণিহাটি সম গ্রাম নাহি গঙ্গা তীরে—
বড় বড় সমাজ সব পতাকা মন্দিরে।"

ইতিমধ্যে যুগল মূর্তি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে দেগঙ্গার সাথে পাণিহাটির সম্পর্ক হয়ে উঠেছে গভীর ও আত্মিক।

শ্রীচৈতন্যদেব রাঘবের আন্তরিক আহ্বানে নিত্যানন্দকে নিয়ে পদার্পণ করলেন পাণিহাটিতে। বৈষ্ণব তীর্থে ঢেউ উঠলো আনন্দের। শ্রীচৈতন্যদেবের রাঘব ভবনে আগমনের কথা লেখা আছে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী'র শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যলীলায়—

"প্রভু আইলা বলি লোকের হইল কোলাহল
মনুষ্য ভরিল সব জলস্থল।
রাঘব পন্ডিত আসি প্রভু লঞা গেলা
পথে যাইতে লোক ভিড় কষ্ট সৃষ্ট্যে আইলা।"

প্রভু এসে বসলেন রাধা মাধবের সম্মুখে। বিগ্রহ থেকে যেন বিচ্ছুরিত হচ্ছে স্বর্গীয় সুষমা। অপূর্ব সে দৃশ্য। মুগ্ধ হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। দর্শন করে ধন্য হলেন দ্বিগঙ্গার যুগল মূর্তি। বিগ্রহ পাওয়ার রোমাঞ্চকর কাহিনী আগেই শুনেছেন সবাই। বিগ্রহ ঘিরে পাটবাড়ি রাঘব ভবন হয়ে উঠলো বৈষ্ণবতীর্থ। সময়টা ছিল বাংলা ৯২১ সাল। পূর্ণ হলো রাঘবের বহু দিনের একান্ত ইচ্ছা। স্মরণীয় সে কথা ছন্দ হয়ে ভেসে ওঠে স্মৃতির পর্দায়—

দেবতা দ্বারকানাথ মিলে দ্বিগঙ্গা নগরে—
পাণিহাটি গঙ্গাতীরে স্থাপে ভক্তি ভরে।
চৈতন্য আনন্দ পায়, দরশিয়া মুরতি
আলিঙ্গনিয়া রাঘবেরে, জানায় প্রীতি॥

তাঁর পূত চরণ স্পর্শে পাণিহাটি ধন্য হলো। প্রাণ ফিরে পেলো প্রাণের ঠাকুর। মন্দিরের অবয়ব বা ঐশ্বর্যই বড় কথা নয়, বড় কথা তাঁর হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে নিয়ে, বড় কথা তার প্রাণের ঠাকুরকে নিয়ে। অসীম শ্রদ্ধা নিয়ে কান পাতলে শোনা যায় দেবতা বংশীধরের বাঁশী'র সুরে আজোও বাজে দেগঙ্গার ঠিকানা। জীবন মাঝে এ এক দুর্লভ সঞ্চয়। শত কাজের মধ্যেও সময় করে নিন একদিন। ধন্য হোন সে মূর্তি দর্শন করে, ধন্য হোন সে কথা শ্রবণ করে, ধন্য হোক্ জীবন।

●

"মুন্সী আমীর তত দূর"

রাজা-জমিদারদের দিনের সমাপ্তি ঘটেছে। নেই সেই হাঁক-ডাক কিম্বা তাঁদের তর্জন-গর্জন। কিন্তু পরিমণ্ডল আজো গুমরে রয়েছে সেদিনের নিদারুণ ঘটনা গুচ্ছে। দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড একদা ছিল বঙ্গখ্যাত বেশ কয়েকজন জমিদারদের অধীন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন গোবরডাঙ্গার মুখোপাধ্যায়, কোলকাতার লাহাবাবু, ধান্যকুড়িয়ার সাউ, কোন্নগরের ভূস্বামী, রাজা রামমোহন রায়, পুণ্যবতী রাণী রাসমণি প্রমুখ ভূস্বামীরা। কাছারি বাড়ি থেকেই পরিচালিত হতো এঁদের জমিদারি। কিন্তু জমিদার মুন্সী আমীরের বাড়ীই ছিল এখানে অর্থাৎ গ্রাম গোঁসাইপুরে এবং সেখান থেকেই পরিচালিত হতো তাঁর জমিদারি। জমিদার-তন্ত্র শেষ। তার শেষ কথা বলার জন্য শুরু নয়। বলতে চেয়েছি প্রজাবৎসল একজন মানুষের কীতি ও ঘটনার কথা, উল্লেখ করতে চেয়েছি বিপরীত চরিত্র পুত্রের জীবনধারা—যা আজো স্পর্শ করে সকলকে।

বাংলার মাটিতে মুন্সী আমীর এসেছিলেন সুদূর আরবদেশ থেকে। অনেকে বলেন, না তাঁর বাড়ি ছিল উত্তর প্রদেশের কোনো এক গ্রামে। এর আগে গোঁসাইরা ছিলেন গোঁসাইপুরের জমিদার। শেষ মালকিন পুত্র-কন্যাহীনা বিধবা বত্রিশ হাজার টাকায় জমিদারি বিক্রি করে দেন আমীরকে। চলে যান্ কাশীতে। সেখানেই বিধবা রমণী জীবনের অবশিষ্ট সময় কাটান পুণ্যের আশায়।

এ ব্যাপারে মর্মস্পর্শী ভিন্ন মত শুনেছিলাম কোনো এক বিকালের পড়ন্ত বেলায়। ঋণ পরিশোধ করতে পারেন নি জমিদারের বিধবা পত্নী। ঋণের দায়ে নীলামে ওঠে জমিদারি। নিলামে কিনে নেন মুন্সী আমীর। দখল নেওয়ার দিন বয়েছে আনন্দের বন্যা। বাজী-বাজনা-বরকন্দাজ নিয়ে জমিদার মুন্সী প্রবেশ করেন গোঁসাইপুরে। চরম দুঃখ পান একজন। নিষ্ঠাবতী হিন্দু রমণীর জমিদারির দেওয়ান ছিলেন দেনাতুল্লা তরফদার। বিশাল সম্পত্তি দেখা শোনার ব্যাপারে

তিনিই ছিলেন বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল ব্যক্তি। প্রভু'র এই অসম্মানে চরম আঘাত পান দেনাতুল্লা। বহুদিন একারণে ঘরের বাইরে আসেননি তিনি। হিন্দু বিধবা জমিদার, মুসলমান দেওয়ান—তাঁর অনুভূতির প্রকাশ আজো ছুঁয়ে যায় সকলের মনকে। নুন খেয়ে গুণ গাওয়ার এমন নজীর—নজীর হয়ে থাকবে অনেক কালের জন্য।

জমিদার মুন্সী আমীর নির্মিত ঐতিহাসিক "গড় বাড়ি" এখনও রয়েছে। আমীরের বিনানুমতিতে কারো অধিকার ছিল না গড়বাড়িতে প্রবেশের। গড়বাড়ির ওপরেই ছিল মুন্সী আমীরের বাড়ি। গড় বলতে চোখের সামনে যে বিশাল দুর্গ বা কেল্লার ছবি ভেসে ওঠে তেমন নয়। তবে সে দিনের ভাঙ্গা ইঁটের টুকরো এখনও ছড়িয়ে আছে এখানে ওখানে।

মুর্শিদাবাদের 'মতিঝিলের' কথা শোনেননি এমন মানুষ বাঙলায় বোধ হয় নেই। নবাবী কায়দায় এখানেও একসময় নির্মিত হয়েছিলো মতিঝিল। মতিঝিলের স্বচ্ছ জলের বুকে সে সময় জমিদারের নৌকা নেচে উঠতো। মতিঝিল দেখতে অনেকটা 'এস' আকারের মত। কতদিন পার হয়ে গেছে পুরাপুরি জলহারা না হয়েও মতিঝিল এখনও সুখ স্মৃতি নিয়ে বেঁচে রয়েছে সকলকে দেখা দেওয়ার জন্য।

পিপাসার্ত মানুষের জন্য জমিদার কয়েকটি দীঘিও খনন করেন। শানপুকুর গ্রামের মুন্সীদীঘি তাঁরই সুকীর্তি। মহরমের মেলা বসতো গোঁসাইপুরের মাটিতে। উপস্থিত হতো সকল ধর্মের মানুষ। 'জাতের নামে বজ্জাতি' নয়—হিন্দু-মুসলমান সব জাতের মানুষই তাঁর কাছে সমান বিচার পেতো। বর্তমানে তাঁর পৌত্রীর পুত্র-কন্যার। কেউ বা থাকেন কোলকাতায় কেউ বা ঢাকায়।

কোলকাতার শিয়ালদহে 'মুন্সী বাজার' সুস্পষ্ট ভাবে মুন্সী আমীরের কথা বলে। বৈঠকখানায় নির্মাণ করেছিলেন "নিয়ামতখানা"। হজযাত্রার পূর্বে গ্রাম থেকে কোলকাতায় এসে নিয়ামতখানায় যে ক'দিন খুশি অবস্থান করতে পারতেন তীর্থযাত্রীরা। থাকা-খাওয়ার বিনিময়ে তাঁদের পয়সা লাগতো না একটিও। সাতক্ষীরার 'ধর' ও বিখ্যাত 'লাহাবাবুদের' সাথে তাঁর সংযোগ ও সখ্যতা ছিল গভীর। ঝিকরা গ্রামের 'বাড়ুজ্জেদে'র আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়লে শিল্প-শোভন-পূর্ণ চণ্ডী মণ্ডপের বেশ কিছু দারুস্তম্ভ কিনে নিয়ে উন্নত মানসিকতার পরিচয় দেন

মুন্সী আমীর। ভারতের সর্বত্রই ছিল তাঁর জমিদারি। তাঁর কিছু অনুমান করা যায় আজও প্রচলিত লোক ছড়ায়—

'তাল, তেঁতুল যতদুর
মুন্সী আমীর ততদুর।'

জমিদার আমীর চেয়েছিলেন তাঁর মৃত্যুর পর তাঁকে যেন মাটি দেওয়া হয় গ্রামের মাটিতেই। পূরণ করা হয় তাঁরই ইচ্ছা। মুন্সী আমীর পরম শান্তিতে ঘুমিয়ে রয়েছেন নিজ গ্রাম গোঁসাইপুরের মাটিতে।

বিশাল জমিদারির সবই শেষ হয়ে যায় পুত্রের সময়ে এসে। বড় ফজলে করীম ছিলেন পিতৃগুণে গুণান্বিত। ছোট বজলে ছিলেন সম্পূর্ণ বিপরীত চরিত্রের। উচ্ছৃঙ্খলতা, অমিতব্যয়িতা, যথেচ্ছচারীতাই ছিল তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। ভয়ার্তকণ্ঠে বলা সে গল্প আজো শুনি আমরা। তাঁর সম্মুখ দিয়ে কোনো নারীর আত্মসম্মান নিয়ে যাতায়াত ছিল অসম্ভব ব্যাপার। কোনো কুমারীর বিয়ে হতে পারতো না তাঁর অনুমতি ব্যতীত। শাসনের কারণে বিনীত পিতা মুন্সী আমীরকে মাঝে মধ্যে কঠোর হতেই হয়েছিলো ঠিকই কিন্তু পীড়িত করে পুত্র বজলের দুঃস্বপ্নের মত আচরণ।

বজলে চলতেন সাত ঘোড়ার গাড়ি চেপে। সাত ঘোড়ার গাড়ি করেই জমিদারি প্রদক্ষিণ করতেন। ঘোড়া ছোটার পায়ের শব্দ পেলে প্রজাকুলের শুরু হতো মাথা নীচু করা। তাঁর চলাকালীন রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে আনত মস্তকে বজলেকে সম্মান জানানো ছিল বাধ্যতা মূলক। ভোগের চরমাকার বজলে খালি মদের বোতলগুলো আগুন ধরিয়ে আনন্দোৎসব করতেন। ঠাণ্ডা পানীয় গরম করা হোত নোটের বাণ্ডিল জ্বালিয়ে। অমিত ব্যয়িতাই একদিন টেনে আনে অকল্পনীয় আর্থিক সঙ্কট। দিন চলার জন্য সাহায্য আসতো ভূপাল নবাবের দরবার থেকে। নবাবের এ উদারতার দান চলেছিলও বহুদিন পর্যন্ত।

বাদ গিয়েছে যে কথা। ইংরাজ রাজত্বকালে মুন্সী আমীর ছিলেন এক ভয়ঙ্কর ক্ষমতার অধিকারী। যে ক্ষমতা সমকালীন যুগে অনেক দোর্দণ্ড প্রতাপ জমিদারও পাননি। সাতটি পর্যন্ত মানুষ তিনি খুন করতে পারতেন। সে অপরাধের বিনিময়ে তাঁর কোনো শাস্তি পেতে হবে না। অর্থাৎ 'সাত খুন মাপ'।

চমকে উঠি একস্থানে দাঁড়িয়ে। কয়েক বছর আগে যখন প্রথম দেখি তখন অল্প গভীর ছিল স্থানটি। এখন সমান হয়ে গেছে। ভয়ঙ্কর এ চিহ্ন স্থানটিকে কেউ বলেন 'খুনগাড়ি' কেউ বা বলেন 'খুনবাড়ি'। এক সময় এটি ছিল কূপের মত গভীর। জমিদারের চোখে অন্যায় হলে হতভাগ্যদের দেহ খণ্ড খণ্ড করে নিক্ষেপ করা হোত এর অভ্যন্তরে কিম্বা জীবন্ত শরীরকে ফেলা দেওয়া হতো গর্তের মধ্যে। হয়তো আজো খুন-বাড়ির গভীরে খুঁজলে পাওয়া যাবে সেই হতভাগ্যদের কঙ্কাল কিম্বা শুধু গল্পই হতে পারে।

পদ্ম-পাতায় জলের মত একদিন জীবন নাটকের নেমে আসে যবনিকা, চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায় সব দম্ভ। কালের নিয়মে পরিত্যক্ত গড়ের ধ্বংসস্তূপের বুকে ও মতিঝিলের জলে ভেসে ওঠে ফেলে আসা দিনের স্মৃতি। আর নিষ্ঠুর ইতিহাসের চরম স্বাক্ষী খুন-বাড়ির চারপাশের বাতাস গভীর নিশীথে যেন গুমরে ওঠে দুঃস্বপ্ন ভরা দীর্ঘশ্বাসে।



মক্কাতীর্থে প্রোজ্জ্বল এক রমনীর রমনীয় কীর্তি

"মসজিদ হইতে আজান হাঁকিছে
বড় সকরুণ সুর,
মোর জীবনের রোজ কেয়ামৎ
ভাসিতেছে কতদূর ?"

—কবি জসীমউদ্দিন

শাশ্বত সত্যকে শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে যাঁরা পৃথিবীর বুকে মহান স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁদের মধ্যে একজনের জন্মভূমিতে পৌঁছোনো যায় দেগঙ্গা-আমিনপুরের মধ্য দিয়ে। রেলপথে গেলে নামতে হবে 'ভাসিলা' কিম্বা 'লেবুতলা' স্টেশনে। রোদ ও ছায়ার খেলায় ব্যস্ত দুটি গ্রাম ভাসলিয়া ও সাতহাতিয়া দাঁড়িয়ে আছে যমজ ভাইয়ের মত। ভাসলিয়া ও সাতহাতিয়া গ্রাম দুটির কেন এরকম নাম হলো এ নিয়ে রয়েছে বর্ণাঢ্য ব্যাখ্যা। আগে সে কথাই তুলে ধরি।

'কাবা ঘুরে এলাম' গ্রন্থের লেখক মুহম্মদ মোতাদাইয়েন বলেন— "ভাসলিয়া" নাম আরবী। "আসিলা আল্লাহ" হইতে বুৎপন্ন—এর অর্থ সেকালে এই গ্রামে বহু ধার্মিক ও আল্লাহর সহিত সম্পর্কযুক্ত পুণ্যবান ধর্মশীল সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের বসবাস ছিল এই কাবণে এ গ্রামের নাম ভাসলিয়া।"

অন্যমতে দেখি—পীর গোরাচাঁদ ভাসলিয়াতে তাঁর প্রিয় অনুরাগীবৃন্দের সাথে মিলিত হয়ে রওনা দেন বারগোপপুরের উদ্দেশ্যে। রওনা দেওয়ার স্মরণীয় তারিখ ছিল ৭৭৩ হিজরাব্দ বা বাংলা ৭৬০ সালের ৬ই ফাল্গুন। আজকের ভাসলিয়া এসেছে "ওয়াশলিয়া" শব্দ থেকে। মাওলানা মোঃ আব্দুল খালেকের ব্যাখ্যায় 'ওয়াশলিয়া' শব্দের অর্থ 'মিলনক্ষেত্র'।

হাতে হাত মিলিয়ে রয়েছে ভাসলিয়া ও সাতহাতিয়া গ্রাম। এ গ্রামের নাম নিয়েও আছে রমণীয় ব্যাখ্যা। পীর সাহেব এখানে অবস্থানকালে বেঁধে রেখেছিলেন সাতটি হাতি। যে স্থানটিতে সাতটি হাতি বাঁধা

ছিল বলে জনপ্রবাদ, তার ধ্বংশাবশেষের শেষ চিহ্ন এখনও টিঁকে আছে বট ও আগাছার আষ্টে পিষ্টে বাঁধনে। সাতটি হাতি বাঁধা থেকেই গ্রামের নাম হয়েছিলো সাতহাতিয়া।

মক্কায় যাঁর কীর্ত্তি আজও অম্লান সেই ধর্ম্ম-নিষ্ঠাবতী সাওলাতউন্নিসা ভাসলিয়াতে ভূমিষ্ঠ হন ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দে। পিতার নাম হজরতউল্লা। কোলকাতা-বেলেঘাটার জমিদার লাতাফৎ হোসেন বিয়ে করেন সাওলাতউন্নিসাকে। আজো কোলকাতায় লাতাফৎ হোসেন রোড তাঁর স্বামীর স্মৃতিই বহন করছে। ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তিনি কোলকাতাতে নির্মাণ করে দিয়েছিলেন ছাত্রাবাস। জন্মভূমি ভাসলিয়ার প্রতি তাঁর কর্তব্যও স্মরণ যোগ্য। বিনাবেতনে পড়ার সুযোগ করে দিয়ে ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে স্বগ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন মাদ্রাসা। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে মাদ্রাসাটি পরিণত হয় মিডল ইংলিশ স্কুলে। অবশ্য কয়েক বছর আগেই "দি ভাসলিয়া সাওলাতিয়া এম, ই" অনুমোদন লাভ করেছে উচ্চ বিদ্যালয় রূপে।

১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দে সাড়ম্বরে তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রীর পৌরহিত্যে উদযাপিত হয় শতবার্ষিকী উৎসব। বয়সের তুলনায় প্রতিষ্ঠানটির ভবন ঠিকমত হয়ে উঠতে না পারলেও এটি গৌরবের বিষয়, দেগঙ্গা ব্লকের একমাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেটি অতিক্রম করেছে শতবর্ষ।

প্রতিটি মুসলমানের কাছেই মক্কার মাটি পবিত্র। যান্ত্রিক সভ্যতার যুগেই সেখানে যাওয়া যেমন কষ্টসাধ্য তেমনি ব্যয়সাধ্যও বটে। ১২৯০ হিজরীতে পুণ্যার্থী সাওলাতউন্নিসা গিয়েছিলেন পুণ্যভূমি মক্কাতে তীর্থ করতে। সেখানে তিনি রেখে আসেন জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি। মক্কাতে প্রখ্যাত হিন্দুস্থানী আলেম মৌলানা মুহম্মদ রহমাতুল্লাহর হাতে তুলে দেন ত্রিশ হাজার টাকা। সেই অর্থে জমি ক্রয় করে নির্মিত হয় মসজিদ ও সাওলাতউন্নিসা'র নামে "সাওলাতিয়া হিন্দিয়া মাদ্রাসা"।

হজ প্রত্যাগত যাত্রীর কাছে শুনেছি মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ যদি জানতে পারেন তিনি এসেছেন সাওলাতউন্নিসার বাড়ীর কাছাকাছি কোনো গ্রাম থেকে তাহলে সেখানে লাভ করেন বিশেষ সমাদর। তাঁরা আরও জানতে চান ধর্ম্ম নিষ্ঠাবতী রমণীর জীবন কথা। শুনতে চান মহিয়সী মহিলার জন্মভূমির বিবরণ। আরো যে কথা শুনে আনন্দে অভিভূত হতে হয় তাঁর নামে সেখানে নির্মিত হয়েছে নিয়ামতখানা ও তাঁর নামাঙ্কিত মাদ্রাসাটি রূপান্তরিত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাঁর কীর্ত্তি গুণে তিনি গুণান্বিত আমরা সে গরবে গরীয়ান।

পরমপুরুষ রামকৃষ্ণ, ভোলানাথ ও ভূতনাথ

তিনমহলা বিশাল বাড়িটি একসময় জনসমাগম আর সমৃদ্ধির উত্তাপে উষ্ণ ছিল; দোল-দুর্গোৎসবের মতো উৎসবে মুখর হয়ে উঠতো এ গৃহ-অঙ্গন। সে উষ্ণতার কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। প্রাচীরে বিশাল ফাটল হাঁ করে আছে; কোথাও কোথাও সংস্কার করার প্রয়াসও চোখে পড়ে। তথাপি নিরাপদে ও নির্বিবাদে বেড়েই চলেছে গৃহগাত্রে আশ্রয় খুঁজে নেওয়া গাছপালাগুলো। এ বাড়ির বর্তমান উত্তরাধিকারীদের কেউ কেউ নিকটে বা দূরে বাড়ি করে চলে গেছেন। বয়সের ভারে ক্লান্ত বাড়িটিতে আর আগের মত জনসমাগমের উষ্ণতা নেই, শুধু আছে স্মৃতি, একরাশ মুখর স্মৃতি।

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ভূতনাথ মুখোপাধ্যায়—দুই সহোদর ভ্রাতা ছিলেন চৌরাশীর সন্তান এবং দুই ভাই-ই পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের পরমসান্নিধ্য-সৌভাগ্য ও স্নেহ-প্রীতি লাভে ধন্য হয়েছিলেন। ঠাকুরের বহু সমস্যার সমাধানে এবং আবেদন-আবদার পুরণের সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভোলানাথ। ঠাকুরের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য তাঁরা লাভ করেছিলেন রাণী রাসমণির জমিদারিতে কাজ করার সুবাদে। রাণী রাসমণির খাজাঞ্চী ভোলানাথ লাভ করেছিলেন প্রেমময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অক্ষয় ভালোবাসা।

ভোলানাথের শ্রীরামকৃষ্ণ সান্নিধ্যলাভের স্মৃতিভাষ্য ছড়িয়ে আছে অসংখ্য গ্রন্থ ও স্মৃতিচারণায়। এমনকি মহাগ্রন্থ 'শ্রীম কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' ও একাধিক স্থানে উল্লিখিত হয়েছে ভোলানাথ-ভূতনাথ দুই ভ্রাতার নাম।

খাজাঞ্চী ভোলানাথ থাকতেন দক্ষিণেশ্বরে দক্ষিণ দিকে যে সারি সারি দপ্তরখানা ছিল সেখানে। যদি অতিথি, সাধু, অতিথিশালায় বসে রান্না করা খাদ্যদ্রব্য না খেতে চান পরিবর্তে চান 'সিধা' অর্থাৎ

চাল, ডাল সিদ্ধ করে খাওয়ার যোগ্য দ্রব্যাদি, তার জন্য ভাণ্ডারীকে অবশ্যই অনুমতি নিতে হতো খাজাঞ্চীর কাছ থেকে। এমনিই প্রভাব বা ক্ষমতা ছিল ভোলানাথের।

একদিন ভক্ত পরিবৃত হয়ে বসে আছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সে আলোচনা সভা মুখরিত। কিন্তু খাজাঞ্চী ভোলানাথ যেন অন্যমনস্ক। অন্যমনস্ক ভোলানাথের দিকে নজর পড়ল মা সারদামণির। মায়ের চোখে কিছুই এড়িয়ে যাওয়ার নয়। খাজাঞ্চীকে প্রকাশ্যে বললেন মা—তুমি যেন দিনে দিনে বৈষয়িক হয়ে পড়ছো। লজ্জিত হলেন ভোলানাথ। কোষাধ্যক্ষ খাজাঞ্চীর দায়িত্ব একান্তই বৈষয়িক—টাকা, পয়সা, ভূমি, সম্পদ রক্ষাণাবেক্ষণ করা—একথা অস্বীকার তো করা যায় না। তাই প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বৈষয়িক চিন্তায় তাঁকে মগ্ন হতেই হয়। পরমজ্ঞানী ঠাকুর জানেন সে কথা, তাই তিনিই এগিয়ে এলেন ত্রাণকর্তারূপে, মায়ের কথার প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন—ওর যা খুশী ও হোক্।

জ্যেষ্ঠ ভোলানাথ সহোদর ভূতনাথকে গ্রাম চৌরাশী থেকে নিয়ে যান রাণীর জমিদারিতে কর্ম-নিয়োগের উদ্দেশ্যে। সেখানে রন্ধনশালার দায়িত্বসহ ঠাকুরের প্রসাদ তৈরীর দায়িত্বও অর্পিত হয় ভূতনাথের উপর। ভূতনাথের জীবনে এ এক পরম সৌভাগ্যময় অধ্যায়। কিন্তু অধ্যায় ছিল সংক্ষিপ্ত; এ দায়িত্বে বেশিদিন তিনি থাকতে পারেন নি। প্রখর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে রাণী রাসমণি ভূতনাথকে পাঠিয়ে দেন পশ্চিম-দিনাজপুর জেলায়, তথায় শালবাড়ি পরগণার নায়েব পদে নিযুক্ত হন তিনি। সেখান থেকেই তিনি প্রায়শঃই আসতেন দেশগ্রাম চৌরাশীতে। আসার সময় হাতির পিঠে চাপিয়ে আনতেন বস্তা ভর্তি রূপোর টাকা।

মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সজ্জন, নায়েব পদে থাকাকালে নিজ পুত্রের অন্যায়-আচরণও তিনি সহ্য করেন নি। তাঁর পুত্র কালিদাস একদিন স্থানীয় এক দোকান থেকে মূল্য না দিয়েই মিষ্টি খায়। নায়েব পুত্র বলে দোকানীও সাহস করেনি মূল্য চাইতে। পরে এ ঘটনা গোচরে আসে ভূতনাথের। তিনি নিজে এসে দোকানীকে উপযুক্ত মূল্যদান করেন।

রামায়ণ-মহাভারত নিয়ে প্রচুর জ্ঞান ছিল ভূতনাথ-জ্যেষ্ঠ ভোলানাথের। ভোলানাথের অন্যতম দায়িত্ব ছিল ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে

মহাভারত পাঠ করে শোনানো। ঠাকুরও প্রায়শঃই মহাভারতীয় প্রসঙ্গের জন্য শরণাপন্ন হতেন ভোলানাথের—দেখতো ভোলানাথ—ও জায়গাটায় ভারতে কি বলছে।

ঠাকুর মহাভারতকে 'ভারত' বলতেন।

সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, ইসলাম, খ্রীস্টান—সকল সাধন ধারাই সমান শ্রদ্ধার লাভ করেছে পরম পুরুষের ভাবচেতনায়—"বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।"

একদিন ঠাকুরের ইচ্ছা জাগলো খ্রীস্টীয় সাধন ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। বিশ্ব জননীকে ব্যাকুল হয়ে তিনি বললেন—মা তোর খ্রীস্টান ভক্তেরা কিরূপে ডাকে দেখবো, আমায় নিয়ে চ।

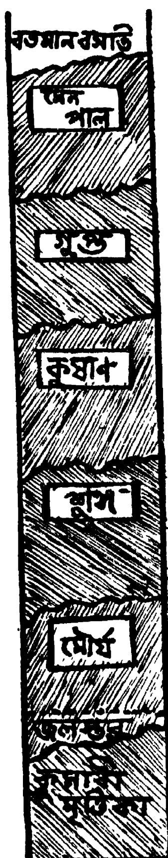
কিছুদিন পরে ভোলানাথের সঙ্গে কোলকাতায় এলেন ঠাকুর. গীর্জার পাশে দাঁড়িয়ে সবকিছুই দেখলেন। ফিরে গিয়ে ভক্তদের বললেন—আমি খাজাঞ্চীর ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসিনি, ভাবলাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না দেয়।

প্রশ্রয়-স্নেহ-প্রেম-প্রীতির রসে জারিত ঠাকুরের এমন অপার করুণাধারা লাভ করেছিলেন খাজাঞ্চী ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়। দক্ষিণেশ্বরের পুণ্যভূমিতে দেহ রেখেছিলেন ভোলানাথ, কণিষ্ঠ ভূতনাথের শেষ আশ্রয় ছিল চৌরাশীর মাটি। পরম-পুরুষের প্রীতিধন্য পরমসৌভাগ্যবান সেই মহত্তম মানুষদুটির অম্লান স্মৃতি বহন করে চলেছে সেই তিনমহলা বাড়ি।



প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি - চন্দ্রকেতুগড়

উজ্জয়িনী, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী, তাম্রলিপ্তের মত চন্দ্রকেতুগড় একদা প্রতিষ্ঠিত ছিল মর্যাদার আসনে। মাটির ওপর থেকে হঠাৎ করে পাওয়া, পুষ্করিণী খনন ও কৃষকের লাঙল কিম্বা কোদালের আগায় উঠে আসা আশ্চর্য সব নিদর্শন এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম কর্তৃক ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে পর পর কয়েকটি ঋতুতে বিজ্ঞান ভিত্তিক উৎখননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে আড়াই হাজার বছর আগেকার নানা মূল্যবান নিদর্শন ও এক বনেদি বন্দর-নগরী। মাটির মধ্যে চাপা পড়ে রয়েছে মনুষ্য বসবাসের বাড়ি ঘর।



আশুতোষ মিউজিয়মের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও প্রত্নবিজ্ঞানী দেবপ্রসাদ ঘোষ 'ভারতীয় শিল্পধারা, প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত' গ্রন্থে লিখেছেন—"চন্দ্রকেতুগড়ে উৎখননের ফলে মৌর্যযুগ থেকে শুরু করে শুঙ্গ-কুশান ও গুপ্ত পরবর্তী সময় কাল পর্যন্ত মনুষ্য বসতির একটা ধারাবাহিক তথ্য পাওয়া গেছে।"

আড়াই হাজার বছর পূর্বে পত্তন হওয়া এ নগরী বেঁচে ছিল এক হাজার বছরেরও বেশি সময়। তারপর কোনো এক সময় অগ্নিকাণ্ড, প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা ধর্মীয় কারণে নগরবাসীরা নগর ছেড়ে চলে যায় অন্যত্র। তাই সে সময়ের নগরের ও নগরবাসীর নানা চিহ্ন দেখা গেলেও ধ্বংস স্তূপের তলায় দেখা যায়নি কোনো মৃতদেহ বা নর-কঙ্কাল।

কি কি জিনিস পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে, ভারতবর্ষের আর কোন্ কোন্ ঐতিহাসিক স্থানে এ রকম নিদর্শন পাওয়া গেছে—এ প্রশ্ন আজ প্রতিটি উৎসাহী মানুষের। বিশাল ও বর্ণময় হবে সে তালিকা—তবে চেষ্টা করছি সংক্ষেপে তার বর্ণনা দেওয়ার।

প্রত্নতীর্থ চন্দ্রকেতুগড়ের চারদিকের মাঠে যদি কোনো দিন কিছু সময়ের জন্য দাঁড়াবার অবসর পান, দেখতে পাবেন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ভাঙ্গা মাটির পাত্রের অগুন্তি টুকরো। ধুলো-কাদা মাখা বস্তুগুলি দেখতে অতি সাধারণ কিন্তু পুরাবিদ্‌দের কাছে এর মূল্য অসীম। ভাঙ্গা ব্যতীত আস্ত পাত্রের মধ্যে রয়েছে থালা, পানপাত্র, হাঁড়ি, কলসি, ঢাকনি, প্রদীপ, বেলুনাকৃতি পাত্র, দইয়ের ভাঁড় প্রভৃতি। এর মধ্যে রয়েছে উত্তর ভারতীয় কালো পালিশ করা পাত্র (Northern Black Pottery) ও বুলেট মৃৎপাত্র যেগুলি নিঃসন্দেহে মৌর্য ও শুঙ্গযুগের ব্যবহৃত মহাসম্পদ। অনেক পাত্রের গায়ে রয়েছে রোম গ্রীসের ছাপ। চন্দ্রকেতুগড়ের ঘাটে ঘাটে একদা ভিড়তো ভিনদেশী তরী; পাত্রগুলি বহন করছে তারই ছায়া। রোম দেশীয় দেবী ছিল 'আথি'—'আথি' দেবী 'আথেনার' নাম পরিচায়ক। পেচককে দেখা যায় 'আথেনার' বাহন রূপে। 'আথি' লেখ বিশিষ্ট রোমক মুদ্রার অনুকৃতি মৃন্ময় দোলক ও রোমান পাত্র প্রভৃতি এখানে পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায় যে সে সময় চন্দ্রকেতুগড়ের সাথে যোগাযোগ ছিল রোম ও গ্রীসের এবং সে কথার সমর্থনও মেলে ইন্ডিয়ান মিউজিয়ম বুলেটিনে (জুলাই, ১৯৬৬) 'Chandraketugarh shows also signs of Foreign Contacts with Greco-Roman world in her art objects.'

চন্দ্রকেতুগড় কোনো ক্রমেই সভ্যতার এক বিচ্ছিন্ন কেন্দ্র ছিল না। এ নগরীর সাথে ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের একটা নিবিড় যোগাযোগ ছিল। শুধু তাই নয় এ নগরী বহু দূরের দেশের সাথেও যে সংযোগ রেখে চলতো তার পশ্চাতে আছে অজস্র সাক্ষ্য।

সুদূর অতীতে কোনো এক সময় যাযাবর মানুষের দল চায় স্থায়ী হতে, বাঁধতে চায় বাসা, গড়ে ওঠে ঘর, গ্রাম, নগর। নগর চন্দ্রকেতুগড়ের নাগরিকদের বাসগৃহের নিদর্শন স্বরূপ মাটির গভীরে দেখা গেছে কাঠের খুঁটি, বাঁশ, টালি প্রভৃতি। তখন দেওয়াল ছিল ছিটে বেড়ার তৈরি, তখনও ঘর তৈরি হতো দক্ষিণমুখ করে।

ইঁটের তৈরি বিশাল আকারের বাড়িও রয়েছে চন্দ্রকেতুগড়ের মাটির গভীরে। দেখা গেছে কনক্রীটের ন্যায় ছাদ যা গাঁইতি, হাতুড়ি ব্যবহার করেও ভাঙতে কষ্ট হয়েছে। এগুলি সম্ভবত

গুপ্ত যুগের। কারণ সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ইটের ব্যবহার শুরু হয়েছিলো গুপ্ত বা প্রাক্ গুপ্ত আমল থেকে।

খাদ্যের পাশাপাশি বাসগৃহের কথা উঠবেই। বলা হয়নি তখনকার বাঙালিদের খাদ্য তালিকায় কী কী বস্তু ছিল। সবগুলির সন্ধান না মিললেও মিলেছে ধান, ধানের খোসার তুষ, যবের চিহ্ন, মাছের কাঁটা ইত্যাদি। এরই মধ্যে পাওয়া গেছে মুখ আটকানো ঘট, ঘটের মধ্যে রয়েছে ধান, এটি নিশ্চয়ই নগরীর রহস্যময় দিক। মনে হয় এগুলি দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হতো।

ভারতীয় রমণীর অলঙ্কার সজ্জা বিদেশ থেকে আসে নি, নিজস্ব রুচি বোধই তাকে সজ্জিত করেছে ভূষণালঙ্কারে। তারই প্রথম পাঠ হিসাবে মোহেন-জো-দারোতে যেমন দেখা গেছে মাটির তৈরি অলঙ্কার তেমনি চন্দ্রকেতুগড়েও। দেখা যায় এখানকার কর্ষিত ক্ষেত্রে পড়ে আছে গোলাকার, চ্যাপ্টা নানা ধরনের বস্তু। এগুলি মাটি দিয়েই তৈরি এবং ব্যবহৃত হতো রমণীর অলঙ্কার রূপে। সেদিনের সমাজে যে বিত্তবান শ্রেণী ছিলো তার পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় চন্দ্রকেতুগড়ে লব্ধ অজস্র প্রায় মূল্যবান পাথরের মাল্যগুটিকার দ্বারা। অন্যদিকে কম সঙ্গতিপন্ন সাধারণ মানুষ যে শিল্পবোধ সম্পন্ন ছিল তারও অমোঘ প্রমাণ পাওয়া গেছে পোড়ামাটির মাল্যদানার দোলকে, কর্ণকুন্তলে। চন্দ্রকেতুগড়ের স্বর্ণকার, মণিকারদের দ্বারা পরিত্যক্ত পোড়ামাটির অলঙ্কারের ছাঁচও আমাদের দৃষ্টিকে প্রসারিত করে দেয় অতীতের সুন্দর রুচিবোধের দিকে।

চন্দ্রকেতুগড়ের সুবৃহৎ প্রত্নক্ষেত্রের সামান্য অংশই উৎখনিত হয়েছে। চরম আক্ষেপের বিষয় এতবড় প্রত্নক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ খনন করে বাংলার ইতিহাসকে আলোকিত করে তোলার প্রচেষ্টা আজও স্তিমিত। নির্বিচার লুণ্ঠনের মাধ্যমে অজস্র নিদর্শন চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে; একদল মানুষের ইচ্ছাকৃত অপরাধ স্মৃতিযুক্ত চন্দ্রকেতুগড় এর অস্তিত্ব টুকুও আজ বিপন্ন করে দিয়েছে। দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিবাদ ও সরকারের প্রতিরোধই পারে ঐতিহাসিক সম্পদটিকে বাঁচাতে।

অসম্পূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের মধ্যেও দেশবাসী বিস্মিত হয়েছে আশ্চর্য এক ব্যবস্থা দেখে। মাটির তেরো চোদ্দ ফুট গভীরে খনন কার্যের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে পয়ঃপ্রণালী। পয়ঃপ্রণালীর নলগুলি ছিলো পোড়ামাটিতে তৈরি। নলগুলির দৈর্ঘ্য ২ ফুট ৭ ইঞ্চি। জলনিষ্কাশনের

এ ব্যবস্থা নগর চন্দ্রকেতুগড়ের এক অভিজ্ঞাত দিক। মোহেন-জো-দারোতেও ছিল এ ব্যবস্থা কিন্তু সেগুলি ছিল পাকা ইটে তৈরি। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাক্ মৌর্য বা মৌর্য সময় কালের এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র পূর্ত পরিকল্পনার উল্লেখযোগ্য ঘটনা নয় ভারত সভ্যতার ইতিহাসে এক সুমহান দিক।

আধুনিক কালের মত সেদিনও সুসমৃদ্ধ নগর চন্দ্রকেতুগড়ে ছিল বিজ্ঞান সম্মত নানা ব্যবস্থা। সুপ্ত মৃত্তিকার গভীরে পাওয়া আবর্জনাকুন্ড বা 'ডাস্টবিন' তার এক সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রতিচ্ছবি। চন্দ্রকেতুগড়ের সমসাময়িক তক্ষশীলাতেও রয়েছে অনুরূপ 'ডাস্টবিন'।

চন্দ্রকেতুগড়ের নাগরিকেরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাপারে যে সজাগ ছিল তার আর এক উজ্জ্বল উদাহরণ মাটির বেড় সাজিয়ে তৈরি পাতকুয়া। দেউলিয়া বা দেবালয় গ্রাম ঘিরে আবিষ্কৃত পাতকুয়াগুলির কাছাকাছি বাঁশ বা কাঠের বিভিন্ন চিহ্ন স্মরণ করিয়ে দেয় নাগরিকদের বাসগৃহের কথা। মনটাকে একবার ক্ষণেকের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যান হাজারো বছর আগের কোন এক দিনে। স্মৃতির পর্দায় ভেসে উঠবে এক প্রাণবন্ত শহরের ছবি, এক ঐশ্বর্যময় নগরীর মুখ।

অদূরের শুষ্ক পদ্মা তখন ছিল স্রোতস্বিনী, বেগবতী পদ্মা আজ বেগহীনা হলেও তার দুর্বার ফুলে ফেঁপে ওঠা বুকে সেদিন বিচরণ করতো দেশী-বিদেশী জলযান।

তবে এটাও ঠিক নয় সুদূর সে সময়ে বিদেশের দিকে মুখ চেয়ে চন্দ্রকেতুগড়ের দিন কেটেছে। একথা সঠিক যে এখানে একদিকে যেমন রোমক বৃত্তীয় অলংকারের কালোমৃৎপাত্র পাওয়া গেছে তেমনি পাওয়া গেছে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব ক্ষেত্রের সুপরিচিত নানা সম্পদ। তার মধ্যে ব্রাহ্মী (i) লিপিযুক্ত মুল্যবান সীল চন্দ্রকেতুগড়ের মূল্যবান সম্পদ। "প্রাচীন পুঁথির পাতায় লিপি পাওয়ার কথা বললেও পাল আমলের পুর্বেকার কোনো পুঁথি এখনও পর্যন্ত ভারতবর্ষে পাওয়া যায়নি।"

কিন্তু দগ্ধ ও অদগ্ধ মাটির তৈরি সীলে রয়েছে কত লেখা এবং তা চলে আসছে মোহেন-জো-দারোর কাল থেকেই। ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ণ চন্দ্রকেতুগড়ের সীলগুলির সামান্য কিছু পাঠোদ্ধার হলেও

অধিকাংশই অকথিত কথা নিয়ে অপেক্ষা করছে নতুন কথা শোনাবার।

চব্বিশশো বছর আগেকার রূপা ও তামার তৈরি অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড় থেকে, পাওয়া গেছে স্বর্ণ মুদ্রাও। তখন অবশ্য রৌপ্য মুদ্রাকে বলা হোত 'পুরাণ' তামার মুদ্রাকে বলা হোত 'কার্ষাপণ'। স্বর্ণ মুদ্রাও পাওয়া গেছে তবে সেগুলি সংখ্যায় কম। তখন স্বর্ণ মুদ্রাকে বলা হোত 'দীণার'। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করি বাঙলার এক গৌরবময় কথা। ভারতে প্রাচীনতম মুদ্রা বলে স্বীকৃত 'সিলভার পাঞ্চ মার্ক কয়েন'ও বহু সংখ্যক পাওয়া গেছে চন্দ্রকেতুগড়ে।

ভারতবর্ষের মধ্যে মাটির তৈরি পুতুলের সমাবেশ ঘটেছে চন্দ্রকেতগড়, বানগড়, তাম্রলিপ্ত, হরিনারায়ণপুর, দেউলপোতা, আটঘরা, পোখরান, তিলদা, মহানাদ, মঙ্গলকোট, অহিচ্ছত্র, কৌশাম্বী, ভিটা, বেনারস, হস্তিনাপুর, মথুরা প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে। কিন্তু সব মূতির ভিড়ে চন্দ্রকেতুগড়ের মৃতিকা বা পুতুল দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন মহিমা নিয়ে। ঝুড়ি ঝুড়ি শায়িত পুতুলের মধ্যে রয়েছে মাতৃমূতি, দেবী লক্ষ্মী, দেবতা সূর্য, দেবরাজ ইন্দ্র, দেবতা অগ্নি, শ্রীগণেশ, ধন দেবতা কুবের, নানা লোক কাহিনী যুক্ত ফলক, ভগবান বিষ্ণু, উমা-মহেশ্বর, জৈন তীর্থঙ্কর, রাক্ষস, ব্যাঘ্র দেবতা, যক্ষ-যক্ষিণী মূতি প্রভৃতি। "চন্দ্রকেতুগড়ে পোড়ামাটির খেলনা গাড়ির মাঝে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের সূর্য রথের অবস্থিতি অত্যন্ত বিস্ময়কর। অনুরূপ সূর্যরথ পশ্চিম ভারতে প্রায় সমকালীন যুগে ভাজা চৈত্য গুহার ঢোকবার পাশে চিত্রায়িত করা হয়েছিল।"

চন্দ্রকেতুগড়ের নদীমাতৃক পেলবতার মনোমুগ্ধকর চিহ্ন ধরা রয়েছে যক্ষিণী নামে পরিচিতা নারী প্রতিমার মাধ্যমে। উত্তর ভারতের অন্যান্য কেন্দ্রের শুঙ্গ-কুশান যুগীয় নারীমূতির সঙ্গে এগুলির সাদৃশ্য থাকলেও সৌন্দর্য ও নিখুঁত শিল্পকাজের বিচারে চন্দ্রকেতুগড়ের মূতিগুলি ভারতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। এখানে সংগৃহীত বহু সংখ্যক যক্ষিণী বা রূপসীর মধ্যে উল্লেখ করছি একটির প্রসঙ্গ।

মেদিনীপুরের তমলুক বা তাম্রলিপ্ত বন্দরের একদা খ্যাতি ছিল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। তমলুকেও সংগৃহীত হয়েছে চন্দ্রকেতুগড়ের ন্যায় অসংখ্য পুরাদ্রব্য। তমলুক থেকে খ্রস্টীয় প্রথম—দ্বিতীয়

শতাব্দীর একটি যক্ষিণী কয়েক বছর আগে রহস্য জনক ভাবে চলে যায় লন্ডনে। সেখানে 'এসমোলিয়ন মিউজিয়মে' রক্ষিত মূর্তিটি সারা বিশ্বে পরিচিতি লাভ করেছে 'অকসফোর্ড যক্ষিণী' নামে।

গভীর গৌরবের কথা সম্পূর্ণরূপে একই শিল্প ধারায় সৃষ্ট 'অকসফোর্ড যক্ষিণী'র ন্যায় অনুরূপ রূপলাবণ্য সমৃদ্ধ যক্ষিণী সংগৃহীত হয়েছে প্রত্নগর্ভা চন্দ্রকেতুগড় থেকেও। বর্তমানে দুর্লভ মূল্যবান মূর্তিটি প্রদর্শিত হচ্ছে বেড়াচাঁপাস্থিত দেবালয় চন্দ্রকেতুগড় সংগ্রহশালার কক্ষে।

যক্ষিণী মূর্তিগুলি আদিমকাল থেকে নিম্নভাগের অধিবাসীরা পূজা করতো শষ্যদাত্রী রূপে, ও বৃষ্টিপাতের জন্য। ভারতের বিভিন্ন কৃষিভিত্তিক সমাজে এঁরা মাতৃ মূর্তিরূপেও পূজা পেতেন।

এসে পড়ে খাজুরাহ, ইলোরা, কোণারকের কথা বিশ্বজনের কাছে পৌঁছে গেছে এ সকল মন্দির গাত্রের মিথুন ভাস্কর্যের তথ্য। কিন্তু চন্দ্রকেতুগড়ের দু'হাজার বছরের মিথুন ফলকগুলির দৃশ্য উপভোগ্য ও আকর্ষণীয় হয়েও রয়ে গেল সকলের দৃষ্টির অন্তরালে। এখানকার মাঠে মাঠে কেন এত মিথুনের সমাবেশ? আজও মনে মনে এ প্রশ্ন উচ্চারিত হতে দেখা যায় অনেকের। প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্য দেখে বলা যায় একদিকে যেমন এগুলি মাঙ্গলিক কারণে গৃহে রাখা হোত, অন্যদিকে মথুরা, সাঁচী, ভারহুতের ন্যায় চন্দ্রকেতুগড়ের নটীরাও একান্ত গোপন স্থান উন্মুক্ত ও কামরসের নানা কৌশল প্রদর্শন করে আহ্বান জানাত বিদেশীরও। মৃৎফলকে ধরা রয়েছে তারই প্রতিফলিত রূপ। এমনও হতে পারে বিদেশী বণিক ও স্বদেশী নাগরিকেরা উত্তপ্ত যৌবনের অবারিত রূপ গ্রহণ করেই তৃপ্ত হতো না। সমুদ্র বক্ষে ভিন দেশে পাড়ি জমাবার কালে দীপ্তি মাখা কামকলাপূর্ণ ফলকগুলি সাথে করে নিয়ে যেতো অবদমিত কামপ্রবৃত্তির মোহনায় সুখানুভূতির পরশ আনতে।

তবে এ কথা চিন্তা করলে ভুল করা হবে সেই সময় অর্থাৎ শুঙ্গ-কুশান কালে এখানকার নাগরিকদের দিন কাটতো ভোগ-লালসার মধ্য দিয়ে। ধর্মীয় চিন্তা চেতনাতেও মগ্ন ছিল নাগরিকেরা। সনাতন হিন্দু ধর্মের সাথে যুক্ত দেব-দেবীর পাশাপাশি মিলেছে জৈন তীর্থঙ্কর ও বৌদ্ধ নিদর্শন সমূহ। চন্দ্রকেতুগড়ে লব্ধ পোড়ামাটির পঞ্চশিষ্য সহ ব্যাখ্যান মুদ্রায় প্রদর্শিত বুদ্ধ মূর্তিটির সাথে সারনাথের যেমন সাদৃশ্য রয়েছে তেমনি অভয় মুদ্রায় এক হাত উত্তোলিত অপর বুদ্ধ

মূর্তিটি গর্বিত করে আমাদের। শুধু তাই নয় লাল বেলে পাথরের অপর একটি মূর্তির শিল্প সৌন্দর্য তুলে ধরে সমকালীন মথুরার শিল্প সৌকর্যের কথাই।

"পাষাণের মৌন তটে যে বাণী রয়েছে চির স্থির—
কোলাহল ভেদ করি শত শতাব্দীর
আকাশে উঠিছে অবিরাম
অমেয় প্রেমের মন্ত্র 'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।"

চন্দ্রকেতুগড়ে পাষাণের মৌণতটে স্হির হয়ে নেই ঠিকই কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট চিহ্নাদি ও মৃন্ময় ফলকে আঁকা বুদ্ধ মূর্তিসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয় বন্দর-নগরীর জনজীবনের উপর বৌদ্ধ ধর্মের করুণাময় প্রভাবের কথা; উচ্চারণ করে নাগরিকদের একাংশের তথাগত বুদ্ধের নিকট শরণ বা আশ্রয় লওয়ার কথাই।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে পুরাতত্ত্বপ্রাণ কয়েকজন অনুসন্ধানী চন্দ্রকেতুগড়ে এসেছেন; এসেছেন মোহেন-জো-দারো আবিষ্কারক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববিশ্রুত রাখালদাস বেড়াচাঁপাতে এসেছিলেন ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে। বেড়াচাঁপা তথা চন্দ্রকেতুগড়ের পক্ষে সে সংবাদ যেমন স্মরণে রাখার মত তেমনি গৌরবেরও। ঐতিহাসিক রাখালদাসের রেখে যাওয়া স্মরণযোগ্য সুদীর্ঘ বক্তব্যের অংশ বিশেষ থেকে জানতে পারি —

'চন্দ্রকেতুগড়ে যে সমস্ত অতি প্রাচীন নিদর্শন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা দেখিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় স্থানটি ভারতবর্ষের অতি পুরাতন স্থানগুলির মধ্যে অন্যতম।'

সুদীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও গবেষণার দ্বারা আজ সে কথাই যথার্থ প্রমাণিত হয়েছে।

ভূপৃষ্ঠের গভীরে শায়িত রয়েছে ভারত শিল্পে অনন্য, অসংখ্য পোড়ামাটির ভাস্কর্য; মাটির নিচে চাপা পড়ে রয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার সভ্যতার পদচিহ্ন আঁকা কর্মচঞ্চল এক রূপবতী নগরী। তার চঞ্চল প্রাণের সুমধুর ধ্বনি আজ স্তব্ধ হয়ে এলেও একদিন চন্দ্রকেতুগড়ে—

'কতকাল দলে দলে গেছে কত লোকে
সুদীর্ঘ অতীতে
জয়োদ্ধত প্রবল গতিতে।

*　　*　　*　　*

বিজয় রথের চাকা
উড়ায়েছে ধূলিজাল, উড়িয়াছে বিজয় পতাকা।'

খনা মিহিরের ঢিপি

বিশাল সমুদ্র। অগণন তার ঢেউ, এরই মধ্যে একটি পাত্র ভাসতে ভাসতে চলেছে। মধ্যে তার একটি শিশু। এক সময় পাত্রটি পেঁছালো সিংহলের উপকূলে। সিংহলের রাজার কানে পেঁছালো একথা। কিজানি কী ভেবে তিনি সযত্নে তুলে আনতে বললেন শিশুটিকে। ভালো রকম যত্নের মধ্য দিয়েই শিশুটি বড় হতে লাগলো রাজ-বাড়িতে। সমবয়সের আরও একজন শিশু বড় হচ্ছিলো রাজ-পুরীতে। সে আর কেউ নয়, রাজারই কন্যা, নাম তার খনা। ভেসে আসা শিশুটিও ছিল ভারত-খ্যাত জ্যোতিষী বরাহের পুত্র, নাম তার মিহির। বাতাসে ভেসে উঠতে দেরি হলো না একথা। জলে ভাসানোর পশ্চাতের কারণ ছিলো, পুত্র ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর পিতা বরাহ গণনা করে দেখেছিলেন যে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের বেশি বাঁচবে না শিশুটি। ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে ভাসিয়ে দিলেন অজানার উদ্দেশ্যে। এ ঘটনা জানতে পেরেছিলেন সিংহল রাজ। নিজ কন্যা খনা ও মিহিরকে একই সাথে পারদর্শী করে তললেন জ্যোতিষ বিদ্যায়। বড় হলে বিয়ে দিয়ে দু'জনকে পাঠিয়ে দিলেন ভারতের উজ্জয়িনীতে মিহিরের পিতার কাছে। পিতা বরাহ তখন গুপ্ত রাজ বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার একজন। তিনি সুদীর্ঘকাল পর পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে খুশিই হলেন। পরম সমাদরে গ্রহণও করলেন তাদের। কিন্তু কিছু দিন পরেই প্রভাতের আলো ঢেকে গেল কালো মেঘে।

একদিন হলো কি রাজা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত জ্যোতিষী বরাহ ও পুত্র মিহিরকে জিজ্ঞাসা করলেন আকাশ যে অগণিত তারার মালা সাজিয়ে দীপালি উৎসব করছে সে তারার সংখ্যা কত? বড় কঠিন প্রশ্ন। উত্তর দিতে অক্ষম হন পিতা পুত্র। সবাইকে অবাক করে দিয়ে খনা উত্তর দেন তার। এ রকম ভাবেই খনা কঠিন কঠিন প্রশ্নেরই সমাধান করে দেন, মাঝে মধ্যে ভবিষ্যৎ গণনাও সঠিক

হয়। ছড়িয়ে পড়ে খনার খ্যাতি। প্রীত ও মুগ্ধ হন রাজা। তিনি খনাকে রাজসভায় এনে যথাযোগ্য স্থান দিতে চান। এতে অসম্মান বোধ করেন শ্বশুর ও স্বামী। শুরু হয় মান অভিমানের টানাপোড়েন। বুদ্ধিমতী খনার ব্যাপারটা বুঝতে দেরি হলো না। মনে মনে দুঃখও পেলেন তিনি। নিজে নিজে নিলেন এক মর্মান্তিক সিদ্ধান্ত। কোনো উত্তরই যাতে কোনদিন তাঁকে আর দিতে না হয় তাই তিনি একদিন নিজের জিহ্বা-ছেদন করলেন। চিরতরে বধির হয়ে রইলেন অমোঘ-ভাষিনী।

খনা ও মিহিরকে নিয়ে এ রকম জনশ্রুতি চলে আসছে যুগ-যুগান্তর ধরে। বিশ্বাস অবিশ্বাস সে তো অন্য ব্যাপার। অনেকে আবার বলেন খনা সিংহলের নয় বাংলারই মেয়ে।

কোথায় ছিল খনার বাড়ি? কোথায় তিনি বসবাস করতেন—এ নিয়েও নানা মানুষ নানা প্রশ্ন তুলেছেন। তবে কতকাল তা বলা যাবে না। অনেক কাল আগে থেকেই খনা মিহিরের নামে বেড়াচাঁপাতে রয়েছে এক ঢিপি। যতদূর জানা গেছে একমাত্র বেড়াচাঁপা ব্যতীত অবিভক্ত বাংলার কোন স্থানে ঐ নাম জড়িয়ে কোনো ধ্বংসস্তূপ পাওয়া যায়নি। স্মৃতি বাহিত হয়ে এ কথাই চলে আসছে যে খনা মিহির বেড়াচাঁপার খনা-মিহিরের নামাঙ্কিত ঢিপিতে বসবাস করতেন; জ্যোতিষ চর্চা করতেন এখান থেকেই। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট নানা নিদর্শনও পাওয়া গেছে এখানে; যার মধ্যে রয়েছে চুনী, পান্না, পোখরাজ, মৃৎফলক ও প্রস্তর ফলকে রাশিচক্র। আজও যেমন মানুষ বিপদ-আপদ, দৈব-দুর্বিপাকের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য পাথর গ্রহণ করে, ব্যবহার করে মাদুলি, তাবিজ—সেদিনও এগুলি ব্যবহৃত হতো একই কারণে।

খনা মিহিরের ঢিপি কিভাবে আবিষ্কৃত হলো তা নিয়ে পুরাতন কথাটা তুলে ধরি।

১৯০৬ খ্রীস্টাব্দের কথা। ভারত সরকারের প্রত্ন বিভাগের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার ইংরাজ সুপারিনটেনডেন্ট মিঃ লঙ হার্স্ট ঢিপিটি পরিদর্শন করে মন্তব্য করেছিলেন—"Another site more promising for excavation that the fort is mound known as Varaha Mihir's house just to the north east of the Berachampa railway Station."

তখন বেড়াচাঁপায় রেল স্টেসন ছিল। স্টেসনের উত্তর-পূর্ব

দিকে খনা-মিহিরের বাড়ী বলে কথিত দুর্গটিকে খনন কার্যের পক্ষে উজ্জ্বল সম্ভাবনাময় স্থান বলে উল্লেখ করলেন। সাহেবের এই প্রতিবেদন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ১৯২২-২৩ খ্রীস্টাব্দের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশিত হয়। দুঃখের ও দুর্ভাগ্যের বিষয় সে সময় গড় সংলগ্ন বা খনা মিহিরের ঢিপি কোনোটিতেই গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা বা বিজ্ঞান ভিত্তিক বিশ্লেষণ হয়নি।

দীর্ঘদিন মাটির পিঞ্জরে বন্দী থাকার পর ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে খুঁড়া-খুঁড়ি হল খনা মিহিরের ঢিপিটাকে। খুঁড়লেন কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম। সবটুকু খুঁড়তে পারেননি তাঁরা—যেটুকু খুঁড়লেন তা দেখেই তাঁরা চমকে উঠলেন। তাঁরা বললেন এটি একটি মন্দির ছিল। মন্দিরের ভিত্তিভূমি ৩০০ ফুট দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ১০০ ফুট; প্রধান মন্দিরটির আবার চার পাশই বিস্তৃত ৬৩ ফুট করে। মণ্ডপও ছিল। উত্তর দিকের মণ্ডপে মনে হয় ধর্মালোচনা, কথকথা, নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান বসতো এবং মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিলো গুপ্ত রাজত্বকালে বা এখন থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বে।

বড় মন্দিরটির কাছেই একটি ছোট মন্দিরের উৎখননের সময় একটি ফলকে পদ্মফুল লক্ষ্য করা যায়। পদ্মের পাপড়ির মধ্যে কিছু কিছু মূল্যবান পাথরও পাওয়া গিয়েছে, খুব সম্ভবতঃ ফলকটি ভিত্তি ফলক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

গাঁয়ের মানুষ আবার ঢিপিটাকে দমদমাও বলে। দমদমা কথার অর্থ হলো উঁচু ঢিপি। এক সময় ঢিপিটা ছিল জঙ্গলে ভর্তি। পুরানো বটগাছের ডাল-পালাতে ঝুলতো অজস্র বাদুড়, সন্ধ্যা নামার আগে থেকেই পথিকের ভয় করতো এ রাস্তায় যাওয়া আসা করতে।

পুরাবিদেরা জঙ্গল কেটে ঢিপিটাকে খুঁড়ে পেলেন এক আশ্চর্য বাঁধুনিযুক্ত ও সুন্দর পালিশ করা ইঁটের সাহায্যে নির্মিত গহ্বর। অপূর্ব কলা কৌশলে নির্মিত গহ্বরটির স্থাপত্য শৈলী প্রত্ন ইতিহাসের এক অতুলনীয় নজির। গহ্বরটির গভীরতা ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি যার চারদিকই ১১ ফুট প্রস্থ দিয়ে ঘেরা। ৩৭টি ধাপ তির্যকভাবে হ্রাস প্রাপ্ত হয়ে পৌঁচেছে জলস্তরে। গাঠনিক প্রয়োজনে ধাপে ধাপে সেগুলি ভিত্তিভমি পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। সেখানে পরিলক্ষিত হয়েছে ইট বিছানো একটি চাতাল যার পরিমাপ ২ ফুট ১০ বর্গ ইঞ্চি।

বিশিষ্ট প্রত্ন বিজ্ঞানীর অভিমত অনুযায়ী উৎখননের ফলে মন্দিরটির সামগ্রিক গঠন প্রণালীর যে চিত্রটি পাওয়া গিয়েছে তার দ্বারা মন্দিরটিকে গুপ্তযুগীয় সারনাথ এবং নালন্দার মন্দিরের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা সঠিক কাজ হবে যে, খনা-মিহিরের ঢিপির গর্তের মধ্যে যে সব দ্রব্য পাওয়া গেল সে কথা বলার। প্রাপ্ত দ্রব্য তালিকায় রয়েছে জাহাজ চিহ্ন যুক্ত মদ্রা, অশ্ব, হস্তী চিহ্ন যুক্ত রূপার তৈরি মুদ্রা, হাতির দাঁতে প্রস্তুত সামগ্রী, ব্রঞ্জে নির্মিত সিংহের ওপর দেবীদুর্গা, পাথরে রূপায়িত ভগবান বিষ্ণু, সৌন্দর্য সুষমামাখা রমণী প্রভৃতি। ছোট মন্দিরটি উৎখননের সময় একটি ফলকে শুধুমাত্র পদ্মফুলই পাওয়া গেছে তা নয় তার পাপড়ির মধ্যে রয়েছে মূল্যবান পাথর।

ভিতরে দেখা গেছে চুনের ভাটা। চুন তৈরীর কাজে লাগতো, সম্ভবত সে কারণেই ভাটার পাশে পড়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে শামুক।

একথা উল্লেখ করতেই হয় খনার নাম জড়িয়ে কোনো ঢিপি বা ধ্বংসাবশেষ বেড়াচাঁপা বা দেবালয় ব্যতীত বাংলার কোথাও দেখা যায়নি । সে দিক দিয়ে বেড়াচাঁপা এক বিশেষ কৌলিন্যের অধিকারী।

মঙ্গলে ঊষা, বুধে পা, যথা ইচ্ছা তথা যা।

*　　　*　　　*

তিনশো ষাট ঝাড় কলা রুয়ে
থাকগে চাষী মাচায় শুয়ে,

*　　　*　　　*

যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্যি দেশ।

জ্যোতিষী খনার মুখ নিঃসৃত এরকম বচন কৃষি প্রধান বাংলায় বর্তমান দিনেও জীবন্ত হয়ে রয়েছে। আজো বহুজন পুষ্করিণী খনন কালে, বৃক্ষরোপণ সময়ে, চাষ-আবাদের শুরুতে, দূর দেশে যাত্রাকালে স্মরণ করে জ্যোতির্বিদ্যায় পারঙ্গমা খনার বচনকে।

এবার বলি পাশেই থাকা জলাশয়ের মাহাত্মের কাহিনী। দুটি জলাশয়ের মাঝখানের সীমারেখা উঠে গিয়ে একটিতে

পরিণত হলেও গ্রামবাসী ডাকে অমিত্তোকুণ্ডু, জীয়ৎকুন্ডু বলে। শুদ্ধ কথায় দীঘি দু'টির নাম অমৃতকুন্ড, জীবৎকুন্ড। আসলে পুষ্করিণী দুটি তৈরি হয়েছিলো মন্দিরের প্রয়োজনে।

আজ আর কেউ ফিরে তাকায় না পুষ্করিণীর দিকে; শ্রদ্ধা জাগে না কারো মনে। কিন্তু এক সময় ছিলো যখন নগরবাসী এর জলকে গঙ্গার মত পবিত্র মনে করতো; পান করতো সকলে। অদ্ভুত এক কিংবদন্তীও রয়ে গেছে পুষ্করিণী দুটি ঘিরে। কিংবদন্তী বলে—অমৃতকুন্ড, জীবৎকুন্ডের জল স্পর্শ করলে অসুস্থ মানুষ সুস্থ হয়ে উঠতে পারতো; মৃত সৈনিক ফিরে পেতো জীবন।

এ রকমই দৈব ক্ষমতা ছিলো এর জলের। বাইরের মানুষ শত্রুতা করে এর জলে নিক্ষেপ করে মাংস খন্ড। ফলে বিনষ্ট হয়ে যায় জলের সেই অলৌকিক ক্ষমতা।

কল্পনার আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে বেড়াচাঁপার মত একই কাহিনী বেঁচে রয়েছে পশ্চিম দিনাজপুরের বাণগড় ও হুগলীর পান্ডুয়াতে। সেখানেও রয়েছে অমৃতকুন্ড, জীবৎকুন্ড নামে পুষ্করিণী।

এতো গেল লোক-প্রবাদের কথা। কিন্তু খনা মিহিরের অনবদ্য প্রাচীন স্থাপত্য কীর্তি অনাদরে অবহেলায় চোখের সম্মুখেই প্রতিদিন বিনষ্টের পথে আগিয়ে যাচ্ছে এ সত্য অস্বীকার করবে কে? অমৃতকুন্ডের জলধারার অমৃতশক্তি দূরীভূত হয়ে গেছে ঠিকই, কিন্তু সেই গভীরের অন্তরালে যে অনন্ত, অমূল্য প্রত্ন ঐশ্বর্য আবিষ্কারের অপেক্ষায় দিন গুণছে তার কথা কে বলবে?



মানিকের নামে কভু হেলা করো না

মুস্কিল আসান করো গইলে মাণিকপীর
গইলে হবে সোনার গরু
মাঠে ফলবে ধান
করো মুস্কিল আসান।

দেগঙ্গার ফকির তৈয়ব আলিই এ গান গাইছে ৫২ বছর ধরে। সঠিক ভাবে বলা যাবে না—কোন সুদূর সময়কালে এ গানের শুরু।

গরু-বাছুর গ্রামীণ জনজীবনে এক মহামূল্যবান সম্পদ। গরু-বাছুরকে অসুখের হাত থেকে বাঁচান মাণিকপীর। তাই কৃষি-প্রধান বাংলায় তাঁর কদর খুব বেশি। তাঁর মূর্তি দেখা যায় না, কিন্তু তাঁর স্মরণে "থান" রয়েছে সিরাজপুর, নসীমপুর, দেউলিয়া, মাটিকুমড়া, দক্ষিণ কলসুর, আরজুল্লাপুর, দোগাছিয়া, হড়পুকুর, হাঁসিয়া সহ আরো সব গ্রামে। গাই-বাছুরের অসুখ ভাল হলে গৃহস্থেরা 'থানে' দিয়ে যান প্রথম দিনের দুধ, দিয়ে যান গাছের প্রথম ফল-মূলও।

মাণিক হিন্দু না মুসলমান জিজ্ঞাসার উত্তর আসে দুটি। একদল বলেন তিনি ছিলেন হিন্দু, পিতার নাম মনোহর সওদাগর। আবার হরিসাধন মুখোপাধ্যায় রচিত ও নিশীথরঞ্জন রায় সম্পাদিত "কলিকাতা সেকালের ও একালের" গ্রন্থে দেখি—"আপার সার্কিউলার রোডের ও মাণিকতলা স্ট্রীটের সংযোগস্থলে এই মাণিকপীরের গোরস্থান অবস্থিত। পীর সৈয়দ হোসেনউদ্দিন সাহ উত্তর পশ্চিম প্রদেশ হইতে আসিয়া এই স্থানে ধর্ম-সাধনা করেন।" সাধকের প্রতি শ্রদ্ধার অমর স্বাক্ষর দেগঙ্গার ১০২ নম্বর মৌজা যুক্ত গ্রাম মাণিকপুর ও অদূরে অবস্থিত আর এক গ্রাম মাদারতলা। মাদার ছিল মাণিকের ভাই।

মাণিক-ফকিরেরা গাই-বাছুরের অসুখ সারানোর কাজতো করেই, উপরন্তু তারা ঝাড়-ফুঁকের কাজও করে, টোটকা দাওয়াই

দেয়, এমন কি কলেরা, বসন্ত হলে চিকিৎসাও করে। আর একটা বড় কাজ করে ফকির সাহেবরা—সেটা হলো গ্রাম বাঁধার। গ্রামের তেমাথায় বাঁশের আগায় টাঙিয়ে দেয় সরা। তাতে লেখা থাকে মন্ত্র। ফলে ভুত-প্রেত আর সাহস করেনা গ্রামে ঢুকতে। মাণিকের নামে কেউ সাহস করেনা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে, তাঁকে অবহেলা করলে গৃহস্থের অকল্যাণ হোত, অকল্যাণ হতো পুত্র-কন্যার, বিপদে পড়তো বাড়ির সকলে। ভ্রাম্যমান ফকিরের গলায় গাওয়া এমনি এক গানকে সংগ্রহ করা রয়েছে প্রবীণ গবেষক সত্যেন রায়ের রোজ নামচায়—

"মাণিকের নামে তোমরা হেলা করো না।
মাণিকের নামে থাকলে বিপদ হবে না॥
মাণিকের নামে চাল-পয়সা যে করিবে দান।
গইলে হবে বাছুর, ক্ষেতে ফলবে ধান॥

তবে আগের মত ফকিরদের আর দেখা যায় না গ্রামে গ্রামে ঘুরতে, গানের সুরও আর শোনা যায় না ফকিরের গলায়; তাঁকে স্মরণ করে শিশুদের মাথায় কেউ আর চামরও বোলায় না। কিন্তু চাষ-আবাদে পরিপূর্ণ দেগঙ্গার মানুষ এক সময় বেশি নির্ভর করতো লৌকিক পর্যায়ে উন্নীত এই পীরকে। তাই একদিকে দেখি এখানে পাড়ায় পাড়ায় 'থান' অপরদিকে রয়েছে মানিকের নামে গ্রামের নাম, মেলা এবং লোকশ্রুতি।

তাঁকে স্মরণ করে সবচেয়ে প্রিয় লোকশ্রুতি রয়েছে দেগঙ্গার চিংড়া গ্রামকে কেন্দ্র করে। কোন এক সময় তিনি ঘুরে ঘুরে সবশেষে আসতেন এ গ্রামে, বিশ্রাম নিতেন বটতলায় বসে—এখনও আছে সে বটগাছ। কেউ বলতে পারে না কতযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে এর ওপর দিয়ে। চিংড়াতে মেলাও বসে মাণিকপীরের নামে। কদম্বগাছির মত চিংড়ায় দুশো বছরের প্রাচীন মেলা যখন বৎসরান্তে ২৯শে পৌষ জনসমাগমে মুখর হয়ে ওঠে তখন স্মরণের সরণীতে ভেসে ওঠে মাণিকপীরের নাম—কারণ তিনিই তো করেন মুস্কিল আসান।



লোক-উৎসবে পাঁচশো বছরের চড়ক

পূজা-পার্বণ ও উৎসবাদির ইতিবৃত্তে ২৪ পরগণার মত বাংলাদেশের আর কোথাও এত ব্যাপক সংখ্যায় গাজন বা চড়ক অনুষ্ঠিত হয় না। দেগঙ্গাতেও একই ব্যাপার। এখানেও উৎসবাদির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় চড়ক অনুষ্ঠিত তো হয়ই উপরন্তু সোহাই গ্রামের আঙিনায় ৫০০ বছরের অধিক সময় ধরে অনুষ্ঠিত এ উৎসবের অবিচ্ছেদ্য বহুমনতা শুধু ২৪ পরগণায় নয়, বাংলার লোকোৎসবের ইতিহাসে নতুন কথার জাল বুনেছে।

দেগঙ্গার অনেক গ্রামেই অনুষ্ঠিত হয় চড়কের মেলা। মনে রাখার কথা হলো এর কোনটিই বয়সে নবীন নয়, প্রতিটি মেলাই অতিক্রম করেছে দু'শো, তিন'শো, চার'শো কিম্বা পাঁচ'শো বছর। কিছু কিছু সূত্র বলে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এ মেলা প্রবর্তন করেন। ব্যাপারটা ঠিক নয়। তবে এটাই বোধ হয় সঠিক মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতায় চড়ক উৎসব প্রসার ও প্রচার লাভ করে। তাই আজো তাঁর দান করা সম্পত্তির ওপর অনুষ্ঠিত এ উৎসবকে বলে 'রাজার দেল।' যে সব গ্রামে এ গণ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার মধ্যে রয়েছে ভাসলিয়া, কলিযুগা, আজিজনগর, মৃজাপুর, ঝিকরা, গোলবাটি, চাকলা, রায়পুর, জামালপুর, কলসুর, সিরাজপুর, দক্ষিণ চৌরাশী, উত্তর চৌরাশী, এয়াজপুর, বিশ্বনাথপুর, দেউলিয়া প্রভৃতি।

বর্ষ শেষের শেষ দিনে অনুষ্ঠিত পার্বণ 'চড়ক' কথার অর্থ হলো—"চক্রাকারে ঘূর্ণন বা পাকখাওয়া।" গাজনের মেলাও বলে এ উৎসবকে। শিব-দুর্গা কেন্দ্রিক গান থেকেই লৌকিক শব্দ গাজনের উৎপত্তি।

এক সময় তো এ উৎসবে প্রকাশ ছিল ভয়াবহ। তার নিষ্ঠুর দিক হলো বাঁশের ওপর থেকে লৌহ শলাকার ওপর ঝাঁপ দিয়ে পড়া। এমনও ছিল ভক্তের শির দাঁড়া ছিদ্র করে ঘোরানো হতো তাকে।

ভয়ঙ্কর এ প্রথাকে আইন করে ইংরেজ সরকার বন্ধ করে দেয় ১৮৬০ খৃস্টাব্দে। কিন্তু বন্ধ হয়নি সে উৎসব কিংবা তার আচার অনুষ্ঠান।

স্মরণ করতে পারি দেগঙ্গার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে থাকা সেই সব নামগুলো যেগুলি বহন করছে চড়ক হওয়ার কথা। কয়েকটি স্থানে মেলা বন্ধ হয়ে গেছে কিন্তু চড়ক মেলার স্মৃতিভত স্থান নাম আজো চলে আসছে চড়কডাঙ্গা, চড়কতলা, চড়কপোতা, রাজার দেল, দেল-পোতা পরিচয়ে।

রাজার দেল বলে ডাকে দেউলিয়ার চড়ককেও। এখানকার চড়ক মেলার সবচেয়ে বড় আকর্ষণ ছিল লোকশিল্প। স্থানীয় কুম্ভকারদের মাটিতে তৈরী ঘোড়া, গরু, গরুর গাড়ি, আরোহীসহ গাড়ি, মাতৃমূর্তি প্রভৃতি লোক-নিদর্শনগুলির আঙুলে টিপে তৈরী প্রস্তুত কৌশলে দেখা যায় আদিম ধারার শিল্প-রীতি। এক সময় এগুলির কদর ছিল বিরাট। বর্তমানে অবলুপ্ত হতে চলেছে সেই ঐতিহ্যময় লোক-উপকরণ সমূহ।

কেন বা কোন সূত্রে চড়ক উৎসবের শুরু সে প্রশ্নের উত্তর পাই পুরাণের পৃষ্ঠায়।

'ধর্মসংহিতা' বলে—অনিরুদ্ধ ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। অনিরুদ্ধ প্রেম নিবেদন করেন উষাকে। উষাও ভালবাসতো অনিরুদ্ধকে। কিন্তু উষার পিতা বাণ রাজা এদের ভালবাসাকে ভালবাসতেন না। কারণ রাজা বাণ ছিলেন পরম শিব-উপাসক। আর কৃষ্ণ ছিলেন বিষ্ণু উপাসক বাণের আদৌ ইচ্ছা নয় যে তাঁর কন্যা উষা'র সাথে অনিরুদ্ধের বিয়ে হোক। ব্যাপারটা নিয়ে যখন কোনো মীমাংসায় আসা যাচ্ছে না তখন হঠাৎ করে একদিন অনিরুদ্ধ উষাকে নিয়ে চলে যান। এতে আরো ক্রুদ্ধ হন রাজা বাণ। অনিরুদ্ধকে না পেয়ে তাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণের সাথে যুদ্ধ আরম্ভ করে দেন বাণ রাজা। যুদ্ধে রাজা বাণ পরাজিত হন এবং শ্রীকৃষ্ণের চক্রে তাঁর হাত দুটিও ছিন্ন হয়ে যায়। ছিন্ন হাত নিয়ে বাণ নৃত্য শুরু করেন প্রভু শিবে'র সম্মুখে। শিব প্রীত হন। অমরত্বের বর দান করেন ভক্ত বাণ'কে। এ সুযোগে বাণ আরো একটা বর চেয়ে নেন শিবে'র কাছ থেকে। যে সব ভক্ত তাঁর সম্মুখে আমারই মত নৃত্য করবে তারা যেন দেবাদিবের আশীর্বাদ বা কৃপা থেকে বঞ্চিত না হয়।

ভক্ত বাণের এ প্রস্তাবকে হাসি মুখে মেনে নেন শিব। চৈত্র

সংক্রান্তিতে নীলোৎসবে ঢাকের ওপর কাঠি পড়ে। ভক্তরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে নৃত্য শুরু করে, ক্ষীণ হয়ে এলেও আজকের গাজনের নৃত্য বাণ রাজার নৃত্যেরই প্রতিফলন।

সোহাই গ্রামের গাজন উৎসবের বয়সই শুধু প্রাচীন নয়, এখানে যে শিব মূর্তিটি পূজিত হয় সেটিও প্রাচীন এবং প্রাচীনতার কারণে কিছুটা বিতর্কিতও। মূর্তিটি সারা বৎসর ডুবিয়ে রাখা হয় রায় পরিবারের পুষ্করিণীতে। চড়ক উৎসবের সময় তাকে তুলে এনে প্রতিষ্ঠা করা হয় বেদী মূলে। অনেকে বলেন মূর্তিটি রাজা বল্লাল সেনের শাসন কালের কোনো এক সময়ের; আবার একথাও কিছু জনে বলেন যে সেনাপতি মানসিংহ যে পুষ্করিণী এখানে খনন করেছিলেন বলে কথিত তার গহ্বর থেকেই সংগৃহীত হয় এটি এবং মূর্তিটি মানসিংহের হিন্দু সেনাগণ পূজা করতো বলে ধারণা। বিতর্ক যাই হোক না—শিব মূর্তিটির ইতিহাস যে প্রাচীন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

একথাও উল্লেখ করতে সন্দেহ জাগে না যে, সুদূর সে দিন ২৪ পরগণায় প্রচলিত গণ উৎসবের সঠিক অংশীদার হয়েছিলো দেগঙ্গার বিভিন্ন গ্রাম। শুধু তাই নয় পাঁচশো বছরের অধিককাল ধরে সোহাই গ্রামে ধারাবাহিক ভাবে অনুষ্ঠিত চড়ক উৎসবের প্রাচীন দৃষ্টান্ত বাংলার ইতিহাসে বিরল।



পূজা পার্বণ ও মেলা

বাবনমোল্লা ঃ গিলেবেড়িয়া

বারাসাত-টাকি রোডের ধারেই দেগঙ্গার কোলেই বসে এ মেলা। প্রতি বছর ২৯শে পৌষ শুরু হয়ে, চলে তিন-চারদিন। যাত্রীরা আগে আসতো গরুর গাড়ি করে—এখন অবশ্য সে দৃশ্য আর দেখা যায় না। বর্তমানে তাঁদের বাহন ভ্যান-রিক্সা ইত্যাদি। আসে মিষ্টি-মিঠাইয়ের দোকান ; মনোরঞ্জনের জন্য আসে নাগরদোলা, ম্যাজিকের দল। বছরের নির্দিষ্ট দিন ছাড়া প্রতি মঙ্গলবারে ভক্ত সমাগমও দেখার মত।

যাঁর স্মরণে এ মেলা তিনি ছিলেন একজন শক্তিশালী পীর। নাম তাঁর বাবুর আলি মোল্লা—সংক্ষেপে বলে বাবন মোল্লা। ভাঙড় থানার বাজারআটি গ্রামে তাঁর জন্ম।

শাঁক তৈরি হতো এক সময়—তাই শাঁকসহর বলে—আবার শাঁকশাও বলেন অনেকেই. সেই শাঁকশায় আছে বাবন মোল্লার সমাধি। সেখানে তাঁর স্মরণে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অনুমানের হিসাব বলে গিলেবেড়ের মেলা শুরু হয় ১৩৩০ সাল নাগাদ। এখানে পীর স্মরণে রয়েছে নজরগাহ। ভক্তগণ মানত করেন নানা অসুখ-বিসুখের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার আশায় ; তারা ধূপ, বাতি, বাতাসাও রেখে দেন নজরগাহে।

বামন মোল্লার মন্ত্রপূত তেলের রয়েছে আশ্চর্য ক্ষমতা। মন্ত্রপূত তেল ব্যবহার করলে লোকে নিরাময় লাভ করে দুরারোগ্য রোগ থেকে বিশেষ করে ঘা, পাচড়া বা চর্ম রোগ থেকে, ভালো হয়ে ওঠে শ্রদ্ধাশীল নর-নারী।

বাবন মোল্লা তেল মন্ত্রপূত করার মন্ত্রশক্তি লাভ করেন আর এক পীর মাণিকপীরের কাছ থেকে। মাণিকপীরের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি 'মাণিকের নামে কভু হেলা করো না' তে। মাণিকপুরেও বসে বাবন মোল্লার স্মরণে মেলা—এদিকে জমাট শীত আর জোরালো ভিড়ে জমে ওঠে গিলেবেড়ের বাবন মোল্লার মেলাও।

বাসন্তী পূজা ঃ

চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পূজার জাঁকজমক কিংবা কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত মেলার কথায় আনন্দ এনে দেয়। বসন্তকালে বাসন্তী পূজা ও তদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত মেলাকে কেন্দ্র করে গ্রাম দেবালয় যাত্রী সমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। বাংলা বছরের শেষ কিংবা নতুন বছরের প্রারম্ভেই অনুষ্ঠিত হয় এ উৎসব। যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা, জলসা, নাগরদোলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানতো আছেই; আরো আছে ঘর-সংসারের প্রয়োজনে রকমারি দ্রব্য, মাটির পুতুল আর মনোহারীর রকমারি পসরা।

মেলা শুরু হয় বেলা ৩টে থেকে চলে রাতভোর। বৈদ্যুতিক আলোর রোশনাইয়ে ভরে যায় সারা গ্রাম। সামাজিক পটভূমিকায় আপামর মানুষজনের সর্বজনীন বিনোদনের কথা বাদ দিলেও গ্রামীণ সংস্কৃতি ও কাছের এবং দূর-দূরান্তরের নানা গ্রাম থেকে কুটির শিল্পকলার উপস্থিতি'র পরিপ্রেক্ষিতে উত্তর চব্বিশ পরগণার জনজীবনে দেবালয় তথা বেড়াচাঁপার এ উৎসবের গুরুত্ব অসীম।

ভাটাগাজী ঃ

একদা'র এক জমিদার তাঁর পিতা নসীম মুন্সির নামে এ গাঁয়ের নামকরণ করেন নসিমপুর, নসিমপুরে পদ্মার তীরে রয়েছে ভাটা-গাজীর থান। প্রতি বছরই মেলা বসে এখানে তবে তিথি নক্ষত্র দেখে হয় বলে কোনো সময় সে মেলা অনুষ্ঠিত হয় ৭ই ফাল্গুন কখনও বা ২১শে ফাল্গুন।

ভাটাগাজী কাল্পনিক কোনো পীর বলে ধারণা। পদ্মার জোয়ার ভাটার সাথে এ নামের সম্পর্ক থাকতে পারে। মনোবাঞ্ছা পূরণ হলে ভক্তগণ দুধ কলা দেয় থানে; মানত করে মোরগেরও। খুবই কম দেখা যায় রোজাল বৃক্ষ। রোজাল ও গাম্ভীর গাছের শীতল ছায়ায় রয়েছে ভাটাগাজীর থান।

রথযাত্রা ঃ

হুগলির মাহেশের মত প্রাচীন ও বিশাল না হলেও দেবালয় বা দেউলিয়ার (বেড়াচাঁপা) জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা ছড়িয়ে আছে বাংলার সর্বত্র। দেগঙ্গার আর এক গ্রাম কলসুরেও বসে

রথের মেলা। এক সময় দেউলিয়া'র কাষ্ঠ নির্মিত রথের ভাস্কর্য ছিল অপূর্ব। বর্তমানে অবশ্য সেই শিল্পকার্য সম্পন্ন রথ আর নেই পরিবর্তে স্হান নিয়েছে অপর একটি ছোট আকারের রথ।

মেলা'র অবয়ব আগের মতই আছে, আর আছে কুটির শিল্পজাত দ্রব্য ও নানা ধরনের গাছ-গাছালির চারার সমাবেশ। যতদূর জানা যায় দেউলিয়া'র রথযাত্রা শুরু হয় ১২৪৪ সালে। আবার 'পশ্চিমবঙ্গের পূজা-পার্বণ ও মেলা গ্রন্থ' এবং গ্রামস্হ প্রবীণদের কাছ থেকে পাওয়া তথ্য থেকে জানতে পারি—দুশো বছরের বেশি হবে এর বয়স। রথযাত্রা ও পুণর্যাত্রার পরদিন এখানে মহিলাদের জন্য মেলা বসে ; সাধারণতঃ অন্যত্র খুব একটা দেখা যায় না এ ব্যবস্হা। তবে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত এ মেলা রথযাত্রার মত প্রাচীন নয়, আজকের হিসেবে বছর পনেরো হবে এর বয়স।

বারো মাসে তেরো পার্বণ বাংলা'র আনন্দ যজ্ঞের ভূষণ। পৌরাণিক ও লোকায়ত দেব-দেবীর মধ্যে অন্যত্র পূজা'র মত দেগঙ্গাতেও অনুষ্ঠিত হয় দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, জগদ্ধাত্রী, শীতলা, ওলাইচণ্ডী, মনসা, বৃক্ষ প্রভৃতির পূজা। পৌষ উৎসব প্রভৃতির মত বিভিন্ন লোক-উৎসবের প্রচলনও এখানে আছে।

এয়াজপুর, দেউলিয়া, ভাসলিয়া, হাসিয়া, গাংধুলাট, সাতহাতিয়া, গোঁসাইপুর, গাঙ্গুলিয়া, সোহাই প্রভৃতি এখানকার গ্রামে পীর গোরাচাঁদের নামে 'নজরগাহ' আছে। এসব স্থানের মধ্যে কোথাও মেলা বসে, কোথাও বসে না। তাঁদের উদ্দেশে নির্মিত 'থানে' বা 'নজরগাহে' যেমন মানত করা হয়, শিরনিও দেওয়া হয়।

দেঙ্গগার সংস্কৃতিগত পরিচয়ে ফুটে ওঠে ২৪ পরগণারই ছবি এবং সেটাই স্বাভাবিক। সমগ্র ২৪ পরগণায় ছোট বড় মেলার সংখ্যা ৫০০'র বেশি—তবে অবশ্যই হাট বাদ দিয়ে।

গ্রামীণ জীবনে অর্থনৈতিক কারণে হাটের মূল্য অসীম। দেগঙ্গাতে হাটে'র সংখ্যা ২৩টি। তার মধ্যে বিশেষ করে দেগঙ্গার হাটের ফলমূল ও সব্জিবাজারের খ্যাতি কোলকাতা, হাওড়া, হুগলির সীমানা ছাড়িয়ে সুদূর উত্তর বাংলার জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি পর্যন্ত অনেক আগেই পৌঁছে গেছে।

এয়াজপুর সহ এখানকার কয়েকটি গ্রামে শুধুমাত্র মহরম উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয় না—সেগুলির বয়সও বেশ প্রাচীন। তাই

শতাধিক বৎসরের অধিক মেলার তালিকা প্রস্তুত হলে অবশ্যই দেগঙ্গার স্থান থাকবে সম্মানযোগ্য পর্যায়ে।

মনসাকে কেন্দ্র করে যে রূপময় কাহিনী এখানে বর্তমান—তা প্রকাশ করেছি 'সতী বেহুলা ভাসাইল ভেলা'তে। মূর্তি নির্মাণ করে পুজার পাশাপাশি মনসা গাছের নিচে ঘট বসিয়ে পুজার প্রচলিত সংখ্যাই অধিক। লোকাচার অনুযায়ী সেদিন গ্রামবাসী পালন করেন 'অরন্ধন'।

সবচেয়ে মজার কথা,…… দেগঙ্গা এক সময় সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত থেকেও এখানে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের কোনো মূর্তি নির্মাণ করে পূজা হয় না ; হয় বনদেবী বা বনবিবির পূজা।

তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মেলার সাথে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে লৌকিক ধর্মবোধ। লোকাচারের ন্যায় লৌকিক ধর্মের ক্ষেত্রটিও যেমন বিশাল তেমনি বৈচিত্র্যময়। এক কথায় লোক-জীবনের চিত্রই প্রতিফলিত হয় লোকধর্মে যদিও বর্তমানে সে দৃশ্য অনুপস্থিত মেলা প্রাঙ্গণে সমবেত জনসমুদ্রের আরশিতে।



বাংলার মুখ - গ্রাম কলসুর

দাঁড়িয়ে আছি গৌড়বঙ্গ রাস্তার ওপর। বাংলার বিলুপ্ত রাজধানী গৌড়ের সাথে এ সড়কের নাম যুক্ত হয়ে দক্ষিণ বঙ্গেরই গৌরব বৃদ্ধি পেয়েছে। কয়েক মিনিট আগিয়ে গেলেই নারকেলবেড়িয়া-ওয়াবী আন্দোলনের নায়ক বিদ্রোহী তিতুমিরের ঐতিহাসিক বাঁশের কেল্লা। মসলন্দপুর পার হয়ে যমুনার তীরে ১২২৯ সালে তৈরি গোবরডাঙ্গার জমিদারদের 'প্রসন্নভবন'। বিশাল এ প্রাসাদের সাথে শুধুমাত্র বৈভব প্রতিপত্তি বা হাতির কাহিনী নয়, জড়িয়ে রয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতির অনেক কথা।

এই সেই পথ যার ওপর দিয়ে রাজপুতনার পাহাড় ঘেরা অম্বরের রাজা মানসিংহের নেতৃত্বে মদগর্বী মোগল সেনা এগিয়ে গিয়েছিল যশোহর রাজা প্রতাপাদিত্যকে পরাস্ত করতে। পার হয়েছিলো কলসুরের পদ্মা। ইতিহাস-পৃষ্ঠায় লেখা সে কথা এখনও মুছে যায়নি। গভীর নিশীথে কান পাতলে আজ আর শুনতে পাওয়া যায় না তাদের পদভেরী কিংবা অশ্বেরখুরধ্বনি। তবে ইতিহাসের ঘটনাগুলো ভাবতে মন্দ লাগছিলো না।

প্রবেশ করলাম গ্রাম কলসুরে। বাংলার একদা সমৃদ্ধ অনেক গ্রাম আজ ধুঁকছে, নিস্তব্ধ কিম্বা পরিত্যক্ত প্রায়। কিন্তু না, নিস্তব্ধতা আসেনি এ গাঁয়ের জীবনে।

উন্নয়ন প্রচেষ্টার সাফল্যে রয়েছে গ্রামের সমবেত মানুষের সহযোগিতার প্রয়াস, প্রয়াস রয়েছে উদ্যোগী পুরুষ প্রয়াত ধীরেন্দ্রনাথ মণ্ডলের। রয়েছে উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় সম্মুখে তার নয়ন নন্দন পুষ্পোদ্যান, বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, শিশুদের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, দেব-মন্দির ইত্যাদি। চতুষ্পাঠী, টোল ছিল এক সময়, এখন অবশ্য বন্ধ।

গৌড়বঙ্গ রাস্তা থেকে নেমে অতিক্রম করতে হবে পদ্মার ওপর থাকা সেতু। প্রবাহিতা পদ্মার তীরেই গড়ে উঠেছিলো জনপদ

কলসুর। পদ্মা আজ স্রোতহীনা, মৃতপ্রায়। শুধুমাত্র বর্ষায় সে সামান্য সময়ের জন্য ফিরে পায় জীবন। তার তীরে গড়ে ওঠা নীলকুঠিগুলিও একে একে মিশে গেছে মাটির সাথে।

সামান্য উত্তরে শ্যামসুন্দর জীউয়ের মন্দির। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি। জাগতিক অশান্তির মধ্যেও শান্ত ও নির্বিকার। অর্ধশত বৎসর পূর্বে নব রূপায়ণে রূপায়িত মন্দিরের গঠনশৈলী সাদা-মাঠা। নাট মন্দিরটি বেশ বড় আকারের ও ছিমছাম। দেবভূমি ভারতবর্ষের তীর্থে তীর্থে গিয়ে যাঁরা দেবলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন—কিম্বা যাঁরা করতে পারেননি সবাই আসতে পারেন এখানে। বৃন্দাবনের মত প্রেমময় বংশীধারী একইরূপে বিরাজ করছেন কলসুরের মাটিতে।

এখানকার মূর্তি প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে রয়েছে গল্প করার মত এক অপূর্ব মনোরম কাহিনী। কলসুরের মানুষ ঈশান চন্দ্র মণ্ডল। দীর্ঘ চৌদ্দ বছর নিরুদ্দেশ। কোন খোঁজ নেই। সবশেষে সিদ্ধান্ত হলো ঈশান চন্দ্র মৃত। সে কারণে হিন্দু শাস্ত্রীয় মতে সেদিন বাড়িতে চলছে পারলৌকিক ক্রিয়াদি। আত্মীয় পরিজনের উপস্থিতিতে বাড়ি সেদিন মৌনমুখর। হঠাৎ শমশ্রু গুম্ফধারী এক সাধকের আবির্ভাব। মাথায় তার ব্রজ নন্দনের মূর্তি। জিজ্ঞাসায় জানতে পারা গেল আসছেন বৃন্দাবন থেকে। ভিক্ষা চাইছেন। কেউ চিনতে পারলো না তাঁকে। অনেকে সামান্য বিরক্তও হলো। কিন্তু তিনি নড়লেন না বিন্দুমাত্র। চিনতে অসুবিধা হয়নি একজনের। তিনি মা। বাড়ীতে বিষাদময় পরিবেশ ভেঙে গিয়ে উঠলো আনন্দের জোয়ার। সেটি ছিলো ১১৭৬ সাল। অর্থাৎ আজ থেকে ২১৯ বছর আগেকার কথা। ব্রজধাম থেকে মাথায় করে আনা ব্রজনন্দনকে স্থাপন করা হলো কলসুরের পাশখালিতে। ভক্তজনের যাতায়াতের সুবিধার জন্য পরবর্তী সময়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্থানান্তরিত হন গোঁসাই ঘরে আবার সেখান থেকে বর্তমান স্থানে। গ্রামের উৎসাহী ব্যক্তির কাছে রক্ষিত কুলতালিকায় একথাও দেখেছি শ্যামসুন্দর আরো অনেক পূর্ব থেকেই পূজিত হচ্ছেন কলসুরের মাটিতে। প্রথমে একা পূজা পেতেন তিনি। বৈষ্ণবজনের আন্তরিকতায় পরে ব্রজনন্দনের পাশে বসানো হয় ব্রজবালাকে। প্রাচীন মূর্তিটি কয়েক বছর আগে চুরি হয়ে গেছে, সে স্থানেই নতুন করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন শ্যামসুন্দর।

প্রসঙ্গ ক্রমে এসে পড়ে দয়ারাম মণ্ডলের নাম। আঞ্চলিক ইতিহাসের এক স্মরণযোগ্য ব্যক্তি। তাঁরই উদ্যোগে নির্মিত

রাসমঞ্চটি শতবর্ষ পার করেও বেঁচে রয়েছে উজ্জ্বলতা নিয়ে। মঞ্চটি প্রথমো ছিল খড়ের ছাউনি যুক্ত এবং সেটি তৈরির বৎসর ১১৫৯ সাল। পরে চোখে পড়ার মত পাকা ইমারত হয় ১১৯৫ সালে অর্থাৎ আজকের হিসাবে দুশো বছর হলো রাসমঞ্চটির।

কার্তিকের শিশির ভেজা দিনগুলোতে শুরু হয় রাস উৎসব। সেই কোন সুপ্রাচীন কালে কার্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে কৃষ্ণ, রাধা ও গোপিনীদের অপার্থিব লীলাকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয় রাসোৎসব। তাকে অনুসরণ করে বাংলার নবদ্বীপ, মায়াপুর, খড়দহ, এদের পাশাপাশি কলসুরও পরম শ্রদ্ধার সাথে পালন করে চলেছে উৎসবকে। স্থায়ীভাবে নির্মিত বৃন্দাবন ঘরে প্রদর্শিত কৃষ্ণ, রাধা, গোপিনীদের মৃন্ময় শিল্পে রূপায়িত লীলাক্রীড়ার অপরূপ রূপ দুচোখ ভরে দেখার মত। বয়সে নবীন হয়েও অনেক উৎসব কুলীন প্রচারগুণে, কিন্তু প্রাচীন হয়েও প্রচার না পেয়ে কলসুরের বৈষ্ণবীয় ঐতিহ্য রয়ে গেছে সকলের অজ্ঞাতে।

নানা পসরা নিয়ে দোকানীরা আসে। স্থানীয় জনের অংশ গ্রহণের সাথে আমোদ-প্রমোদের জন্য কোলকাতা থেকেও আসে যাত্রা দল। এক খবর, পুরাতন খাতা-পত্তর ঘেঁটে দেখা গেল ১৩৫৯ সালে কোলকাতার সুবিখ্যাত নট্ট কোম্পানি যাত্রাভিনয় করতে আসে কলসুরের রাসোৎসবে, তখন তাদের দক্ষিণা ছিল সাতশো টাকা। সেই নট্ট কোম্পানির ১৩৯৩ সালের 'রেট' পঞ্চাশ হাজার টাকা। শুধু কলসুর নয় আশ পাশের বহু গ্রামের মানুষের কাছে রাস উৎসব সবচেয়ে আকর্ষণীয় উৎসব। যাত্রী সমাগমে উপছে পড়ে উৎসব প্রাঙ্গণ। কয়েকদিনের জন্য কলসুর উচ্ছল হয়ে ওঠে। অবশ্য গ্রাম বলতে যে রূপটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে তার খোঁজ পাওয়া কঠিন। পুরাতন ইমারতের পাশাপাশি আধুনিক কায়দায় তৈরি হয়েছে বাড়িঘর।

বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার সময়ে রয়েছে এক টুকরো মধুর কথা। দূর-দূরান্তর থেকে এমনকি যশোহর-খুলনা থেকে এসেছিলেন ভক্তবৃন্দ। এক মাস ধরে চলা উৎসব ক্ষেত্র পরিণত হয় তীর্থে। বিনা ভোজনে সেদিন কলসুরের মাটি থেকে কাউকে ফিরে যেতে দেওয়া হয়নি। আপ্যায়ন করেছিলেন সকলে মিলেমিশে, দয়ারাম মণ্ডল দিয়েছিলেন নেতৃত্ব। নররূপে নারায়ণ চিন্তা করে এক

মাস ব্যাপী তাঁর অকল্পনীয় অতিথি সেবা কল্পনা শোনালেও বাস্তবে সত্য—বলেছিলেন গ্রামের প্রৌঢ় প্রয়াত নগেন্দ্র নাথ মণ্ডল। নিত্য উপাসিত ভগবান রাধাকৃষ্ণ মন্দির চত্বরে সেদিনের সব কথাই বাঁধা রয়েছে। পুরানো দিনের লেখাতে দেখতে পাই—

"পদ্মা যমুনা সহাস সলিলা
গ্রাম কলসুর
যুগল মুরতি তাহে অপরূপ ভাতি
নয়ন মধুর।"

ফিরে তাকাই অন্য দিকে। বারো মাসে তেরো পার্বণের মতো রথযাত্রা, শ্যামা পূজা, দক্ষিণ পাড়ায় মায়ের পূজা, লৌকিক দেবী ওলাই চণ্ডীর পূজা ও মেলা কত বছরের প্রাচীন তার হিসাব মেলানো কঠিন। কিছুটা বিবর্ণ হ'লেও কলসুরের জন-জীবনে এগুলি প্রাণ শক্তির কাজ করছে।

কলসুরের কাছে মগরায় খালটিতে পাওয়া গেছে কিছু প্রাচীন গৌরব চিহ্ন। ভারত সরকারের ভূতত্ত্ববিভাগের কর্মীবৃন্দ কাজ করার কালে পেয়েছেন নানা ধরণের পাত্র ও ধাতব বস্তু। নিদর্শনগুলি পাল-সেন সময়কালেরও হতে পারে। পদ্মার সাথে যোগ ছিল এ স্থানের। মাত্র কয়েক বছর আগেও এখানকার স্রোত দেখার মত হলেও আজ শুষ্ক।

আমরা ফিরে তাকাই কলসুরের আর এক প্রাচীন উৎসবের দিকে। যার গৌরব ধারা আজও প্রবহমান। সে উৎসব প্রথম সূচিত হয়েছিল রাজসাহী জেলার তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণের উদ্যোগে, ব্যয় হয়েছিল ৯ লক্ষ টাকা। দুর্গোৎসবের জাঁক জমকে মুগ্ধ হয়ে সম্রাট শাহজাহান আর্থিক সাহায্য দেন বাংলার ব্রাহ্মণদের, যাতে আরো বহু স্থানে এ উৎসব অনুষ্ঠিত হতে পারে। মুসলমান সম্রাট হিন্দুর উৎসবে সাহায্য ভাবতে গিয়ে আস্বাদ পাই এক মধুর স্বাদের। কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় হিন্দু বিদ্বেষী বলে ইতিহাস খ্যাত ঔরঙ্গজেবের বাধাদানের ফলে। বড়িষার সার্বণ চৌধুরীদের পুজা ১০১৭ বঙ্গাব্দে অনুষ্ঠিত হলেও দুর্গোৎসবের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমল থেকে। কৃষ্ণচন্দ্র সিংহাসনে বসেন ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে, তাঁরই আগ্রহে দুর্গা পুজা রাজপ্রাসাদের বাইরে এসে জন মাঝে জনপ্রিয় হয়। বয়সের হিসাবে কলসুরের পূজা প্রায় কৃষ্ণনগরের সমসাময়িক।

দুশো পঞ্চাশ বছর ধরে কলসুরের পূজা প্রাঙ্গণ মুখরিত। অনেক বনেদী বংশের মত এখানকার মণ্ডলেরা সর্ব্ব প্রথম শুরু করেন এ উৎসব। কালের চাহিদা রূপ নিয়েছে সর্বজনীনতায়। অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও একটা কথা না বলে পারছিনা। মণ্ডল বাবুরা যখন তিন শরিকে বিভক্ত হন প্রত্যেক ভাগে একশো তেষট্টি গোলা করে ধান ভাগে পড়েছিলো। আজকের দিনে সে পরিমাণের কথা ভাবতে গেলে ভাবনাও ঠাঁই পাবে না। আধুনিক কায়দায় কোন প্যান্ডেল তলে নয়, দেবী অধিষ্ঠিতা হন সেই সনাতন দুর্গা মন্ডপে।

১১৯৫ সালের কথা। দয়ারাম মন্ডলের উদ্যোগে নির্মিত হয় এ দুর্গা মন্ডপ বা গোঁসাই ঘর। এখনও সুন্দরভাবে বেঁচে রয়েছে। মাঝে মধ্যে সংস্কার হয়েছে। অনেক গ্রামের প্রাচীন মন্ডপের ইটগুলো দাঁত বার করে হাসছে কিম্বা লতা গুল্ম আচ্ছাদনে ঢাকা প'ড়ে চরম ঔদাসীন্যতারই প্রতীক হয়ে উঠেছে সেগুলি; কিন্তু অপরূপ না হলেও দুশো বছরের বয়সের কলসুর মন্ডপটির নির্মাণ প্রয়াসে পূর্বসূরীদের আন্তরিকতায় মুগ্ধ হতে হয়।

বাংলার বহু প্রাচীন দুর্গোৎসব ভাগের মা গঙ্গা না পাওয়ার ফলে দায়সারা পর্যায়ে পৌঁচেছে। কথা কটি অন্তত কলসুরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আজও ধর্মীয় নিয়ম নিষ্ঠার মধ্যে শুরু হয় উৎসব, শেষ হয় সীমন্তিনীদের উলুধ্বনির মধ্যে। পদ্মায় সে রূপ আর নেই। তবুও এখনও পড়ন্ত সূর্যের আলোয় তার বুকে দেবী বিসর্জন হয়। আগে বিসর্জন দিনে শত ব্রাহ্মণকে ভুরিভোজে আমন্ত্রণ করা হোত। এখন আর হয় না। বৈভব-বিত্ত কমে এসেছে কিন্তু আন্তরিকতায় ঘাটতি পড়েনি।

সময়ের বিচারে অনেক কিছু হারিয়ে গেছে। হারায়নি নিষ্ঠা, ধারাবাহিকতা, বাংলার প্রাচীন দুর্গোৎসবগুলির সাথে কলসুর আড়াইশো বছর ধরে নিজেকে যুক্ত করে রেখেছে, এটা বাংলা ও বাঙালির সংস্কৃতি জীবনে কম গৌরবের নয়।



পন্ডিতপোলে পন্ডিত-কবি

কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিদ্রায় শায়িত রয়েছেন কবি শাহাদাৎ হোসেন। না, রোগ শয্যায় প্রিয় নামে কবিকে ডাকবার জন্য তাঁর শিয়রের কাছে কেউ ছিলেন না।

হয়তো সত্যদ্রষ্টা কবি এ সত্য আগেই বুঝতে পেরেছিলেন তাই এই অভিমান আগেই বাজিয়ে রেখেছিলেন তাঁর কবিতায়—

আমাকে ডেকো না কেহ, চেয়ো নাকো আর
এ আমি সে আমি নহি ছন্দ মালাকার
দীপ জ্যোতি নিভে গেছে সঙ্গীত নীরব
সাঙ্গ হয়ে গেছে মোর জীবন উৎসব।

গভীর লজ্জার হলেও একথা নির্মম সত্য—হাসপাতালে তাঁর মরদেহ যখন ডোমের হাতে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে তখন কতিপয় সাহিত্যক ছুটে যান সেখানে। তাঁদের প্রচেষ্টায় গোবরা গোরস্তানে ১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন হলো কবি শাহাদাৎ হোসেনের। জানাজা নামাজের শরীক হলেন কাজী আব্দুল ওদুদ জনাব আয়নুল হক খাঁ, জনাব মইনুদ্দিন হোসায়েন, জনাব আফজানুল হক, ডাঃ আবুল আহসান, জনাব তায়েবুল, জনাব খায়রুল আনস খাঁ, জনাব আবদুর রহমান প্রমুখ সাহিত্যরসিক এবং গুণীজন।

*　　　*　　　*

কোথা সে বঙ্গ ধাত্রী-ধরণী প্রতিমা রূপশ্রীর
ধূ-ধূ-ধূ-ধূ মাঠ তেপান্তরের ফেটে আছে চৌচির

*　　　*　　　*

পল্লীর বুকে শ্মশান জেগেছে কবরের পিরামিড
সোনার বাংলা ভস্মের ভিতে শব সাধনার পীঠ।

*　　　*　　　*

১৩৫০ সাল। দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া গ্রাস করে ফেলেছে সোনার বাংলাকে। সেই দুর্ভিক্ষগ্রস্থ বাংলার প্রতিফলন

পড়লো কবির 'সুধীবরণ' কবিতায়। কোলকাতার ইসলামীয় কলেজে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ৭ম অধিবেশনের কবি পড়ে শোনালেন কবিতাটি। মুগ্ধ হলেন সমবেত সাহিত্য পিপাসু শ্রোতৃমণ্ডলী। অবশ্য কবি হিসাবে শাহাদাতের জয়যাত্রার সূচনা হয়েছে আগেই। ১৯১৫ সালে প্রখ্যাত কবি ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরীর উদ্যোগে বসিরহাটে অনুষ্ঠিত হয় বাণী সম্মিলনীর সাহিত্য সম্মেলন। সেখানে পঠিত কবিতা শুনে মুগ্ধ হন সকলে। কবিকে পুরস্কৃত করা হয় সে সভাতে। কবিতাটি প্রকাশিত হয় সম্মিলনীর বিবরণী পত্রে। "এই হলো শাহাদাৎ হোসেনের প্রথম প্রকাশিত রচনা।" শুধু তাই নয় "তাঁর কবিতার ভাষা, ভাব, ছন্দ, রূপক, অলঙ্কারও তিনি পান" ভুজঙ্গ বাবুর সঙ্গে নিবিড় সংশ্রব থেকে।

১৩০০ সালের শ্রাবণ মাসে কবি জন্মগ্রহণ করেন দেগঙ্গারই পণ্ডিতপোলে গ্রামে। শিশুকালে বাড়িরই পাঠশালাতে শুরু হয় তাঁর শিক্ষা। কিন্তু গুরুমশাইয়ের কড়া শাসন তাঁর মনকে করে তোলে বিদ্রোহ। তিনি বন্ধ করে দেন পাঠশালায় যাওয়া। পিতা জনাব বাহারউদ্দিন পুত্রকে পরে ভর্তি করে দেন হাড়োয়ার জুনিয়ার হাই স্কুলে। এখানে অল্প কয়েক মাস পড়াশুনার পর কয়েকটি স্কুল পরিবর্তন করে সবশেষে ভর্তি হন হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে। সেখানে তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন।

ছোট বেলা থেকেই তাঁর আবৃত্তি করার দক্ষতা ছিলো অসীম। কবি মাইকেল মধুসূদনের কাব্য তাঁর সব-সময়ের সাথী। শাহাদাৎ আবৃত্তি করা শুরু করলে সবাই অবাক হয়ে চেয়ে থাকতো তাঁর মুখের দিকে। এ সময় অনেকেই তাঁকে ডাকতো "কবি-পণ্ডিত" নামে। তাঁর অসাধারণ সাহিত্য প্রতিভার জন্য কবিকে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা বোর্ডের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বাংলা-ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কবিতার সংকলন "রূপছন্দা" এবং নাটক "মসনদের মোহ" পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন।

কবির সাথে পরিচয় ঘটেছিলো বিশ্বকবির ও কথাশিল্পীর। 'মাসিক সওগাত' পত্রিকার সাথে তিনি তখন জড়িয়ে। লেখা সংগ্রহের সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সংস্পর্শে এসেছিলেন ভাবুক কবি। ১৩২৫ সালের যথাক্রমে পৌষ ও ফাল্গুন

মাসের 'সওগাতে'র পৃষ্ঠা ওলটালে দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পথের সাথী' গান ও ফাল্গুন সংখ্যায় শরৎচন্দ্রের "কুড়ানো গল্প।"

শাহাদাৎ শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়, তাঁর আরও পরিচয় ঘটেছিল অভিনেতা রূপে। এক সময় তার অভিনয়ে মুগ্ধ হন নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ীও। তিনি কবিকে নিয়ে যান তাঁর সাথে অভিনয় করার উদ্দেশ্যে।

তাঁর দেশ প্রেমের নজীরও উল্লেখ করার মত। সারা দেশ তখন ইংরাজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছে। চারদিকে অনুষ্ঠিত হচ্ছে সভা সমিতি। ১৯৩১ সাল। কোলকাতার মীর্জাপুর পার্কের একটি সভাতে কবি ইংরাজদের বিরুদ্ধে দিলেন জ্বালাময়ী বক্তৃতা। তাঁকে গ্রেফতার করলো ইংরাজ সরকার। তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন কবি।

ভাষাচার্য ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ'র জন্মভূমি পেয়ারা গ্রাম থেকে কবির বাড়ী ৩০ মিনিটের মত পথ। ভাষাচার্য কবিকে নিয়ে যান বঙ্গীয় মুসলমান সমিতির গ্রন্থাগারে গ্রন্থাগারিকের পদ দিয়ে। কবি নিজেকে কোথাও বেশী দিন আবদ্ধ রাখতে পারেননি।

সবচেয়ে দুঃখের কবি জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে 'পণ্ডিত পোল' গ্রামেই। কিন্তু পারিনি তাঁর পূর্ণাঙ্গ জীবনী গ্রন্থ রচনা করতে। এক সময়ের পূর্ব-পাকিস্তান ঢাকা থেকে ১৯৬৫'র মে মাসে প্রকাশিত দেওয়ান আব্দুল হামিদ রচিত "শাহাদাৎ হোসেন" পুস্তকটিই সাহায্য করেছে বর্ত্তমান রচনায়।

'কবি শাহাদাৎ হোসেন রচিত সাহিত্য তালিকায় রয়েছে—

কাব্য—কল্প কথা, মৃদঙ্গ, চিত্রপট, রূপছন্দা।

নাটক—সরফরাজ খাঁ, আনারকলি, মসনদের মোহ।

উপন্যাস—মরুর কুসুম, পারের পথে, হিরণ রেখা, সতী মহিমা, কাঁটাফুল, যুগের আলো, রিক্তা, সোনার কাঁকন, খেয়াতরী, স্বামীর ভুল, ঘরের লক্ষ্মী।

গল্প—রূপায়ণ।

শুনেছি, একসময় জনপ্রিয়তার সর্বোচ্চ শিখরে ওঠা বিখ্যাত হিন্দী ছায়াচিত্র 'আনারকলির মূল বিষয় গৃহীত হয়েছিল কবির রচিত নাটক 'আনারকলি' থেকে।

ছোটদের বই—মোহন ভোগ, ছেলেদের গল্প, বালিকাজীবন, গুলবদন, জাহানারা, সুরুচী পাঠ প্রভৃতি।

ভারত স্বাধীন হওয়ার পর কবি নিজ গ্রাম পন্ডিত পোল ছেড়ে চলে যান পাকিস্তানের ঢাকাতে। চাকরী পান ঢাকা বেতার কেন্দ্রে। বেতারের বাংলা অনুষ্ঠান পত্রিকা 'এলান'-এর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ৪ঠা মে '৫১ থেকে ২৬শে মে, ১৯৫২ পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন এ পদে। শুধু তাই নয়, ঢাকা বেতার কেন্দ্রে ছোটদের আসরের পরিচালকও ছিলেন কবি। ছোটদের মনোরঞ্জন করার দায়িত্ব তাঁর ছিল ১৯৪৮'র ২৬শে মে থেকে ১৯৫৩'র ৩১শে মার্চ পর্যন্ত।

এর পর বেতার কেন্দ্র থেকে কবির চাকুরী চলে যায়। পাকিস্তান সরকার কবিকে বরখাস্ত করেন। কবির জীবনে নেমে আসে চরম দুঃসময়। দারিদ্রের চরম পীড়ন সহ্য করতে না পেরে কবি চলে আসেন আপন জন্মভূমি পন্ডিতপোলে। কবি ছিলেন পাণাসক্ত। হয়তো পুত্র-কন্যা হীন কবি ব্যাথার উত্তাপকে ভুলতে আশ্রয় নিয়েছিলেন সরাবের বিস্মৃতিতে

ব্যাথার দারু শরাব পিও, ইহাই জীবন চিরন্তন

* * *

য' দিন বাঁচ শরাব পিও, সত্যিকারের এই জীবন

(রুবাইয়াৎ ই ওমর খৈয়ামঃ নজরুল ইসলাম অনুদিত)

দিনের পর দিন কবির শরীর অবনতির দিকে যেতে থাকে। কবিকে কাহিল করে ফেলে হাঁপানী রোগ। কবি ভর্তি হন কোলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। সেখানেই কবি ১৯৫৩-র ৩০শে ডিসেম্বর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

কবির মৃত্যুতে বাংলাদেশে ঢাকা মিউজিয়মের অধিকর্তা ডঃ এনামুল হক বলেছেন "বাংলাদেশের কবি সাহিত্যিকদের ভাগ্যে বরাবর যাহা ঘটিয়াছে শাহাদাৎ হোসেনের বেলায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয়, সাহিত্যিক ও জাতীয় শিক্ষকের সম্মানে ভুষিত অবনী সাহা'র কবি শাহাদাতের অবহেলিত মৃত্যু প্রসঙ্গে আক্ষেপ বাণী "কবি শাহাদাতের মৃত্যু মধুসূদনের মৃত্যু দৃশ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কবি খ্যাতির চরম শিখরে আরোহন করেও কঠোর দারিদ্র্য ও অবহেলার মধ্যে মৃত্যুকে কাছে ডেকে নিয়েছিলেন মধু-কবি। কিন্তু শুধু কি বাংলার কবি মধুসূদন? বিশ্বের কবি সাহিত্যিকদের

মধ্যে অনেক নক্ষত্রেরই শেষ পতন এমনি হৃদয় বিদায়ক। যক্ষার কীট বাসা বেঁধেছিলো পশ্চিমের তরুণ রোমান্টিক কবি কিট্‌স আর বাংলার কিশোর কবি সুকান্তের বুকে। অযথা আত্মপীড়নের মধ্য দিয়ে অন্তিমলগ্নকে বড় তাড়াতাড়ি আমন্ত্রণ করে এনেছিলেন প্রাবন্ধিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার অসকার ওয়াইল্ড।

কবি শাহাদাৎ হোসেন সেই অবাঞ্ছিত মৃত্যু মিছিলে আর একটি সংযোযন। আর সে দারিদ্র্যের মধ্যে ঘটলেও তা ছিল মহান মৃত্যু।"

পল্লী বাংলার মরমীয়া কবি জসীমউদ্দিন শাহাদাৎ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদনে বলেছিলেন—"কবি শাহাদাৎ হোসেন ছিলেন বাঁশরীয়া তাই জীবনব্যাপী তিনি শুধু বাঁশী বাঁজাইয়া গিয়াছেন।"



হালো-কালো ও সেনাপতি মানসিংহ

সে কথা বেশি দিনের নয়, গ্রামের একদিক দিয়ে বইতো পদ্মা অপরদিকে ছিলো বা বর্তমানেও আছে বিদ্যাধরী। ছ'শো বছরেরও আগেকার কথা, সম্ভবতঃ শাজীরাই প্রথম এখানে বন কেটে বসত শুরু করেন। এর পর যশোর থেকে আসেন রায় পরিবার। তাঁদের পরিবারের একজন ছিলেন রামকান্ত রায়। রাজ-রাজেন্দ্র বাহাদুর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র নদীয়ার সিংহাসনে বসেন ১৭২৮ খৃস্টাব্দে। রামকান্ত মহারাজের কাছ থেকে উপাধি পান রাজা ও ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তি হিসাবে বাইশ খানা গ্রামের ১৪৬ নম্বর তৌজির বিভিন্ন অংশ। পুরাতন দিনের নানা কথায় অলঙ্কৃত এ গ্রামের নাম সোহাই। এ গ্রামেরই মত আর এক প্রাচীন গ্রাম রয়েছে—অদূরে দত্তপুকুর। এই তৌজির মধ্যেই হালো-কালো সুবিশাল দীঘিটি। এর টলটলে জলে ভাসছে মোঘল যুগের কথা, এর জলেই ভাসছে মোঘল সেনাপতি মানসিংহের ছবি। এখানে ইতিহাস ও লোককথা একাকার হয়ে গেছে।

কাহিনী বলে—সুন্দরবনের বাঘ রূপে পরিচিত প্রতাপাদিত্য এক সময় নিজেকে ঘোষণা করেন স্বাধীন রাজা বলে। মোঘল সম্রাট আকবরের প্রয়োজন হয় তাঁকে জব্দ করার। প্রয়োজন হয় সমর-কুশলী সেনাপতির। ডাক পড়ে মানসিংহের। কারণ মানসিংহ এতই দক্ষ ও সমর কুশলী ছিলেন যে ইতিহাসবিদ্ বলেন—"মানসিংহ যদি মোঘলদের পক্ষে অস্ত্র ধারণ না করে রাজপুতদের পক্ষ অবলম্বন করতেন তাহলে ভারতবর্ষে মোঘল সাম্রাজ্য স্থাপিত হতে পারতো কিনা সন্দেহ।"

মানসিংহকে বাংলার সুবেদার পদে নিযুক্ত করেন সম্রাট আকবর। সে সময়টা হবে ১৬০৩—৪ খৃস্টাব্দের মধ্যে। কারণ সম্রাট বুঝেছিলেন প্রতাপাদিত্যের শক্তিকে খর্ব করতে মানসিংহই উপযুক্ত ব্যক্তি। যশোর পৌঁছানোর আগে যে সকল স্থানে ছাউনি ফেলেছিলেন মানসিংহ তার মধ্যে দেগঙ্গার সোহাই ছিল অন্যতম।

এখান থেকেই তিনি ও তাঁর সেনাবাহিনী আগিয়ে গিয়েছিলেন পদ্মা বরাবর ও অতিক্রম করেছিলেন সিমুলিয়া, কল্লসুর প্রভৃতি গ্রাম।

এই ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে পদ্মার তীর বরাবর সিমলে বা সিমুলিয়ার কাছে বেলপুর, বেলেডাঙ্গা ও বোড়ামারী গ্রামে "মগ" পদবীধারী অধিবাসীদের দেখে অবাক হয়েছিলাম, জিজ্ঞাসা করেছিলাম এঁদের অনেকেরই। এ রকম পদবী কেন? কারণ সম্পর্কে তাঁরা যে কথা শুনিয়েছিলেন তাহলো—তাদের একজন পূর্ব পুরুষ ধুলো-কাদা মাখা অবস্থায় খাজনা দিতে যান জমিদারের কাছারিতে। জমিদার তাঁর কিম্ভুতকিমাকার চেহারা দেখে তুলনা করেন 'মগ'দের সাথে। সেই থেকে এঁরা নাকি 'মগ' পদবী ব্যবহার করছেন। তবুও একটা জিজ্ঞাসা জাগে মনে মনে। একদা এ সকল এলাকা ছিল সুন্দরবনের অন্তর্ভুক্ত। 'মগ'দের ভয়ে যাত্রীরা নদীর ওপর দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পেতো, প্রজারা বাস করতো সশঙ্ক চিত্তে। 'মগ'দের হাত থেকে বাঁচিয়ে প্রজাদের মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনেন দেগঙ্গার এক রাজা—নাম তাঁর রাম রায়—একথারও প্রমাণ আছে ঐতিহাসিক গ্রন্থে। বর্তমানের 'মগে'রা অতীতের সেই 'মগ'দের বিচ্ছিন্ন অংশ কিনা—এর উত্তর আজ নীরব হলেও মনে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

কিন্তু যে উত্তর আজও সরব তাহলো মানসিংহ তাঁর সেনাবাহিনী নিয়ে সিমলে পার হয়ে স্বচ্ছন্দ গতিতে আগিয়ে যান কল্লসুরের দিকে। সম্ভবতঃ ক্লান্তির কারণে সেনাদলের প্রয়োজন হয় বিশ্রামের এবং সেজন্য দীর্ঘদিন তাঁরা অবস্থান করেছিলেন সোহাই গ্রামে। এখানে তাঁকে স্বাগত জানান দেগঙ্গার রাজা কিঙ্কর সেন। এ সময় মোঘল সৈন্যেরা পানীয় জলের প্রয়োজনে খনন করেন হালো-কালো দীঘি দুটি। সুবিশাল দীঘি দুটিকে এখনও দাঁড়িয়ে দেখার মত। শত্রুপক্ষ যাতে বিষ মিশিয়ে সেনাদের ক্ষতি করতে না পারে তার জন্য চারপাশে নিযুক্ত ছিল জোর পাহারা। দীঘি দুটি অসংস্কার হয়ে পড়েছিল বহুদিন। জলের ওপর জমে ছিল পুরু 'দাম' বা জলজ তৃণ। দামএতই পুরু হয়ে উঠেছিলো যে গ্রামবাসীরা স্বচ্ছন্দে যাতায়াত করতে পারতো তার ওপর দিয়ে। দীঘির পাড় উঁচু ছিল ৫০, ৬০ ফুট। গ্রামে ঘোরার সময় সব সময়ের সঙ্গী নবীন ঘোষ, অশোক মৈতে জানালো ওরা শুনেছে অবিশ্বাস্য রকমের এ পাড় এক সময় দেখতে ছিল খানিকটা দুর্গের মত। নীচের

দিকে তাকাতেই ভয় করতো। পাড়ের ওপর বিচরণকালে একবার একটা গাভী নিচেয় যায় পড়ে, গড়াতে গড়াতে গাভীটি যখন দামের ওপর গিয়ে পড়ে তখন দেখা যায় সে মৃত। এ তো সেদিনের কথা। এর উঁচু অংশে দাঁড়িয়ে দেখা যেতো দূরের গ্রামগুলো। আশ পাশ ছিলো নিবিড় জঙ্গলে পরিপূর্ণ। বন কেটে বসত করার সময় সাক্ষাৎ মেলে বিশাল বিশাল আকারের ডাঁড়াশ সাপ, বুনো শূয়োর ও বাঘের। নরখাদক বাঘের হিংস্র আক্রমণে আহত দীদার কেল্লা, হাজু বিশ্বাস, প্রভাস বিশ্বাস দেহে থাবার দাগ নিয়ে এখনও বসবাস করছেন গ্রামে। প্রবীণ দীদার কেল্লার বয়স ৮০ বছরের বেশী। তিনি তো বাঘের সাথে আধ ঘণ্টার মত যুদ্ধই করেছিলেন। তাঁর কেল্লা পদবীও অর্থবহ। হালো-কালো আগের মত নেই নেই করেও ৬০ বিঘা তার বর্তমান পরিমান। সংস্কারকালে দেখা গেছে আশ্চর্য রকমের পাতলা ইঁটে তৈরী ঘাট। ঘাটের ধাপের প্রশস্থতা এক অবিশ্বাস্য ব্যাপার। এগুলি নেমে গেছে ওপর থেকে জলাশয়ের বহুদূর পর্যন্ত।

হালো-কালো নাম কেন হলো এ নিয়েও শুনেছিলাম এক রমণীয় ব্যাখ্যা। দীঘি দুটি আগে ছিল বিরাট ক্যানেলের মত। উত্তর দিক দিয়ে কাকচক্ষুর মত ধলো বা পরিষ্কার বা ভালো জল প্রবেশ করতো এর একটিতে। ভালো কথার বিকৃত উচ্চারণ হয়তো হালো; আবার দক্ষিণ দিক দিয়ে আসতো ঘোলা জল। স্বাভাবিক কারণে জলটা দেখাতো কালো— তাই অপরটি পরিচিত হয়ে ওঠে কালো নামে। আজ এ ব্যাখ্যা ঠিক কি ঠিক নয় সঠিক ভাবে সে কথা আজ বলা কঠিন। কারণ নামের আড়ালে কবে কোন মুহূর্তে সত্য সূত্র ডুবে গেছে জলাশয়ের জলে তা কে জানে? তবে যে সঠিক কথা শুনে আমরা গর্ব বোধ করি, গর্ব বোধ করে বাঙালি সমাজ তাহলো হালো— কালো'র গভীর তল থেকে পাওয়া গেছে ইতিহাসের নানা মূল্যবান নিদর্শন যার মধ্যে রয়েছে প্রস্তরে নির্মিত দেব-দেবীর মূর্তি, ঘট ও ভাঙ্গা পাত্রের অংশ, ভগবান বিষ্ণুর ভগ্ন পদ, শিব মূর্তি প্রভৃতি। আশ্চর্য সব নিদর্শন এখানে এলো কি করে? কেউ বলেন চিহ্নগুলি মোগল যুগে মানসিংহ যখন এখানে অবস্থান করেছিলেন সেই সময়ের। সোহাই শিবিরে অবস্থিত হিন্দু সেনারা দেব-দেবীর মূর্তিগুলিকে পূজো করত বলে বিশ্বাস। আর পরিত্যক্ত পাত্রগুলি ছিলো তাদের ব্যবহৃত সম্পদ। এ প্রসঙ্গে অন্য অভিমতও

পেয়েছিলাম গবেষকের কাছে। অনুমানের ইতিহাস বলে নিদর্শনগুলি রাজা বল্লাল সেনের সময়ের (১১৫৮-১১৭৯ খৃঃ পর্যন্ত) এবং এগুলি ছিল তৎকালীন সভ্যতার আশ্চর্য সব উপকরণ। তবে যে সময়েরই হোক না কেন প্রাচীনত্বের বিচারে চিহ্নগুলির মূল্য অসীম।

বিভিন্ন সময়ে এখানকার জমিদারদের তালিকায় দেখা যায় বেশ কিছু বঙ্গখ্যাত ব্যক্তির নাম। ১৪৬ নং তৌজির মধ্যে ছিলেন চাটুজ্জ্যেরা। এঁদের কাছ থেকে বেশ কিছু অংশ ক্রয় করেন ঢাকার ভাগ্যকুলের কুন্ডুরা। এক সময় এখানকার জমিদার ছিলেন মণীষী রাজা রামমোহন রায়, পরে দায়িত্ব পান তাঁর নিকট আত্মীয় ধরণী মোহন রায়।

এখনও উল্লেখ করা হয়নি হালো-কালো ব্যতীত এখানকার আরো কয়েকটি জলাশয়ের কথা। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের লাল বাঁধ, কৃষ্ণ বাঁধ, যমুনা বাঁধ, আর বর্দ্ধমানের কৃষ্ণ সায়র, রাণী সায়রের কথা তুলে ধরি জলাশয়ের কথা উঠলে। এগুলির পশ্চাতে নানা কাহিনী টলমল করলেও মূল কারণ ছিলো জলকষ্ট নিবারণ।

রাজা-মহারাজারা জলাশয়গুলি এখানে খনন করেন নি সত্য— কিন্তু এগুলিও যে এক সময় জলকষ্ট নিবারণের জন্য খনন করা হয়েছিল—এর কোন প্রমাণের প্রয়োজন হয় না। কত যুগ অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু জলাশয়গুলি নিয়ে প্রবাদ ছাড়া এখনও বিস্মৃত হন নি পল্লীর মানুষজন। মুখে মুখে এখনও ঘোরে—

"হালো-কালো, ডিমশা
মধু-মুরলী, কন্দরশা
জল খাবি তো চৌরঙ্গী যা।"

হালো-কালো ও ডিমশা সোহাই গ্রামে। ডিমশা নাম হয়েছিলো দীনশা নামে একজন ফকির সাহেবের নাম থেকে। গত বছরই ডিমশা জলাশয়ের পাড়েই দেখা গেছে ইঁটের তৈরী কবর। সম্ভবতঃ এটি ফকির দীনশার সমাধি স্থান। দু-ভাইয়ের নামে চিহ্নিত সুবিশাল জলাশয় মধু-মুরলী আজো রয়েছে বারাসাতের কাজীপাড়ার কাছে। কন্দরশা দেগঙ্গারই অপর গ্রাম আরজুল্লাপুরে। চৌরঙ্গী নামীয় জলাশয়টির জলে এখনও রোদ খেলা করে গাঙ্গীরগাছীতে। সেনানায়ক মানসিংহ খনিত বলে কথিত হালো কালোর বিস্তৃত ব্যাখ্যাতো আগেই রেখেছি। আবার ফিরে আসি মানসিংহ প্রসঙ্গে।

গৌড়বঙ্গ রাস্তা হাবড়া ও বাদুড়িয়ার সাথে সীমা নির্দ্ধারণ করেছে দেগঙ্গার। যশোর খুলনা সুন্দরবন নিয়ে রচিত ইতিহাস বলে—মানসিংহের সেনাবাহিনীকে সিমলের বা সিমুলিয়ার মাঝখান দিয়ে পদ্মা পার হতে হয়েছিলো। রওনা দেন কলসুরের পথে। তাঁরা অতিক্রম করেন কলসুরের পদ্মা। সে সময় পদ্মা ছিল বেগবতী। পদ্মা অতিক্রম করার আগেই মানসিংহ অবস্থান করেছিলেন সোহাইতে। সম্ভবতঃ সে কারণেই কোনো কোনো গ্রন্থে উল্লেখ আছে "সোহাই মানসিংহ" বলে। এখানে অবস্থান কালে কারো সাহস হয়নি তাঁকে বাধা দেওয়ার। বরং দ্বিগঙ্গার রাজা কিঙ্কর সেন তাঁকে সাহায্য করেন, জানান স্বাগত। এর আগেই প্রতাপাদিত্যের কর্মচারী ভবানন্দ মজুমদার তাঁকে পথ দেখিয়ে আনেন। একথা লেখা আছে কমল চৌধুরীর 'উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে।

আগে পাছে দু' পাশে দু সারি লস্কর
চলিলেন মানসিংহ যশোর নগর ॥
মজুমদার সংগে নিলা ঘোড়া চাপাইয়া।
কাছে কাছে অশেষ বিশেষ জিজ্ঞাসিয়া ॥

মানসিংহকে যাঁরা সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে আরো রয়েছেন বারাসাতের রাজা, কুশদহের জমিদার যাঁর এলাকা ছিল গোবরডাঙ্গা থেকে রাণাঘাট পর্য্যন্ত, দেগঙ্গার রাজা কিঙ্কর সেনের নাম তো আগেই উল্লেখ করেছি। অপ্রতিরোধ্য গতিতে মোগল সেনাবাহিনী দেগঙ্গার গ্রামগুলিকে দলিত করে অতিক্রম করে পদ্মা নদী, ওঠে গৌড়বঙ্গ রাস্তায়। বাদুড়িয়ার ওপর দিয়ে আগিয়ে যায় বসিরহাট, টাকী, হাসনাবাদের দিকে, পার হতে হয় কালিন্দী, যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হন, হন বন্দী। দেগঙ্গার মাটি বন্দী করে রাখে মদগর্বী মোগল সেনার অবস্থান ও দর্পিত বাহিনীর পদধ্বনির শব্দ।



তান্ত্রিকেরা আর বসেন না পঞ্চমুন্ডির আসনে

যেখানেই মানুষ বসবাস করেছেন সেখানেই গড়ে তুলেছেন উপাসনা স্থল। উপাস্য দেবতাকেই অন্ধকার মুহর্তে আঁকড়ে ধরে তাঁরা আলো দেখতে চান। পুজিত দেব-দেবীর মধ্যে মানুষের যেন বিশেষ দূর্বলতা রয়েগেছে কালী করালবদনার প্রতি। না, বিশাল বা সৌন্দর্য মন্ডিত মন্দির অভ্যন্তরে নয়। সাদা মাঠা টিনের তৈরী গৃহে নরমালা শোভিতা ও পুজিতা হচ্ছেন আজিজনগরের মাটিতে অনেক কাল আগে থেকেই।

আজিজনগরের সাথে আরো দুটি গ্রাম আমুলিয়া, চাকলার কালী বিগ্রহ শতাব্দী উত্তীর্ণ করলো তার প্রতিষ্ঠার সময় কাল। আমুলিয়ার কালী বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমন্ত সাধুর ছিল অলৌকিক ক্ষমতা। সাতশো ঘর শিষ্য ছিল তাঁর। মন্ত্রশক্তি বলে মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলেছেন শ্রীমন্ত সাধু। মুর্তি বিনষ্ট হয়ে গেছে। পুজো হয় পটে। মন্দির গৃহের অবস্থাও করুণ। তবে অনিন্দ্য সুন্দর দেহ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চাকলার মন্দির। তিনশো বছর আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো চাকলার দেবালয়। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্রও রয়েছে মন্দির সুপরিচালনার জন্য।

অনেক কথায় সিক্ত এখানকার কালী-কাহিনী। তার মধ্যে চাকলা ও আজিজনগরের দেবীর নিকট ভয়ঙ্কর মানসিকের কথা শুনে আজো শিহরিত হয়ে উঠি। ডাকাতেরা তাদের নৈশ অভিযানে বার হওয়ার আগে মানসিক করতো দেবীর চরণ ছুঁয়ে। সফল হয়ে ফিরে এলে সঙ্গে নিয়ে আসতো মানসিকের নৈবেদ্য জীবন্ত মানুষ। গভীর নিশীথে নরবলীর উষ্ণ রক্তে পরিতৃপ্ত করা হোত করাল বদনা কালীর ভয়ঙ্করী মুর্তিকে। এ গল্প শুনি ডাকাতিতে সফল হয়ে ফিরে আসার পর তার মানত করার রীতি-নীতি নিয়ে।

কিন্তু ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই মানত করার এক অদ্ভুত কাহিনী শুনেছিলাম পাহাড়ে বসে।

উত্তর প্রদেশের ঐতিহাসিক চুণার দুর্গে যাওয়ার পথে গিয়েছিলাম বিন্ধ্যাচল পর্বতের ওপর অবস্থিত ডাকাতে কালী দর্শনে। সেখানে রক্ত নয়না কালীর সম্মুখে দাঁড়িয়ে পূজারীর মুখে শুনেছিলাম ডাকাতদের মানত করার লোমহর্ষক রীতি। ডাকাতেরা পরদ্রব্য লুণ্ঠন করতে যাওয়ার পূর্বে জীবন্ত মানুষের রক্তে ভিজিয়ে দিতো দেবীর সর্বাঙ্গ। যদি কিছু সময়ের মধ্যে সে রক্ত অঙ্গে শুকিয়ে যায় তাহলে বুঝে নিতে হবে দেবী রসনা দ্বারা সানন্দে গ্রহণ করেছেন তাদের অর্ঘ্য ; ডাকাতেরা ধরেই নিতো সেদিনের অভিযান কোনো প্রকারেই বিফল হবে না। অন্যদিকে যদি কোনো কারণে দেবী অঙ্গে লেপন করা রক্ত না শুকাতো তাহ'লে ডাকাতেরা বুঝতো হয়তো কাজে তাদের কোনো ত্রুটি হয়েছে কিম্বা দেবী তাদের প্রতি যে কোনো কারণেই হোক সুপ্রসন্না নন। তারা সেদিনের মত বিরত থাকতো অভিযান থেকে।

যাহোক আবার ফিরে আসি আগের কথায়। একথা সত্য আনুমানিক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থাপিত রক্ত নয়না ঘিরে আজিজনগর হয়ে উঠেছিলো এক ছোট্ট পীঠস্থান। তার চারপাশ ঘিরে ছিল নদীর জলধারা।

আজিজনগরে কালীপুজোর রাত্রে এখনও সজীব রয়েছে এক পুরাতন ঐতিহ্যের ধারা। ঠিক রাত বারটায় বলির শেষে শুরু হয় আলো পাকাটি জ্বালা উৎসব। অন্ধকারের বুক চিরে বয়ে যায় আলোর বন্যা। সকল সম্প্রদায়ের মানুষের পাকাটি দান ও অংশ গ্রহণ এ উৎসবের আর এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক।

কালী-গৃহের পশ্চিম পার্শ্বে ছিল একটি সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গটি ছিল ইটে তৈরী। পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে চলে গেছে এটি। কেউ কোনো দিন সাহস করেনি এর ভিতরে প্রবেশ করতে। কেন এটি নির্মিত হয়েছিলো আজো তা রহস্যাবৃত। বর্তমানে মাটীতে ভর্তি হয়ে গেছে সুড়ঙ্গটি। তবে বেশ কিছু কাল আগে পরীক্ষার কারণে অনেকেই গর্তের মুখে ছেড়ে দিয়েছেন ইটের টুকরো। গুড়্গুড়িয়ে চলার শব্দ পেয়েছেন, পাননি থামার শব্দ শুনতে। সুড়ঙ্গটির কথা ভাবলে আজো রোমাঞ্চিত হতে হয়।

আজিজনগরে স্থাপিত পঞ্চমুন্ডির আসন ঘিরে রয়ে গেছে উল্লেখ করার মত এক মহিমাময় দিক। করালবদনার পুজো যন্ত্রতন্ত্র দেখা গেছে, দেখা যাইনি পঞ্চমুন্ডির আসনকে। বড় কঠিন স্থান। আজিজনগরের গ্রামে কালী বিগ্রহের নিকট আসনটি অবস্থিত হওয়ায় এক বিশেষ ইঙ্গিতেও বহন করছে।

এক সময় শক্তি সংগ্রহের আশায় কাপালিক ও তান্ত্রিকেরা বেছে নেন এ কঠিন পথ। কালী ভক্ত সাধক রামপ্রসাদও মায়ের সম্মুখে সাধনা করতেন পঞ্চমুন্ডির আসনে বসে। নরমুণ্ড, বাঘ, কুকুর, হরিণ, ছাগল বা বেঁজি প্রভৃতি মুন্ডের ওপর তৈরী হতো এ আসন। মধ্যযুগে একদা যে আজিজনগরে আসনে বসে তান্ত্রিকেরা পুণ্যলাভ করতেন সে আসন আজ শূন্য। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সে আসনের অস্তিত্ব। তান্ত্রিকেরাও আর বসেন না এখানে কিন্তু সাধকের তপস্যা ধন্য সেই পঞ্চমুন্ডি গ্রামবাসীর মনে এখনও অসীম শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে রয়েছে। যে বট গাছটির তলে আসনটি প্রতিষ্ঠিত তার সঠিক বয়সের হদিসও মেলে না। মূল বটগাছটি নিঃশেষ হয়ে গেছে অনেক কাল আগে। তার ডাল-পালাই এখন বৃক্ষরূপ নিয়ে বৃহৎ হয়ে উঠেছে। কতদিন, কত রাত্রি, কত মাস, কত বছর পার হয়ে গেছে কিন্তু সেই গাছ ও পঞ্চমুন্ডির মৃত্তিকা এখনও ভক্তহৃদয়ে এক অব্যক্ত আনন্দের সঞ্চার করে চলেছে।



হাজরা রাজার মঠ

সুপ্রাচীন কাল থেকে সকল দেশেই নদীর তীর বরাবর গড়ে উঠেছিল সভ্যতা ও সংস্কৃতির রূপরেখা। সকল শ্রেণীর মানুষের বসতি ও জীবনধারা গড়ে উঠেছিল নদীর তীরকে আশ্রয় করেই। আমাদের বঙ্গভূমিতে পদ্মার তীর এমনই এক গড়ে ওঠা সভ্যতার সন্ধান দিয়েছে। সেই সভ্যতার স্বাক্ষর হিসাবে আজও দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি প্রাসাদ কিম্বা মঠ। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই 'রাম হাজরার বাড়ী' বলে কথিত এই ধ্বংস স্তূপটি একটি গরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। আগামীদিনের যথার্থ অনুসন্ধানই এই লেখকের বিশ্বাসের প্রমাণ দেবে।

বেড়াচাঁপা-কলসুর মাটির রাস্তা ধরে কিংবা বাদুড়িয়া-হাবড়ার পাকা সড়ক ধরে কলসুরে বাস থেকে নেমে হাঁটা পথে পোঁছানো যায় দক্ষিণ কলসুরের সেই বিস্মৃত রাজপীঠে। পথে নেমে 'রাম হাজরার মঠের' সন্ধান জানতে চাইলে গ্রামবাসীদের অনেকেই হয়তো অবাক হয়ে আপনার দিকে তাকাবেন কিন্তু তাঁদের কাছেই সঠিক নিশানা পেয়ে যাবেন 'হাজরা রাজার বাড়ীর' পথের। সময়ের শক্তির কাছে পরাজিত রাজপীঠের সেই ধ্বংসাবশেষটি বছরের অধিকাংশ সময়েই ঘন সবুজ আগাছা আর লতাগুল্ম আবৃত থাকে। ফাল্গুন-চৈত্র মাসের 'দারুন দহন বেলা'য় গ্রামবাসীরা জ্বালানীর প্রয়োজনে কেটে পরিষ্কার করে নিয়ে যায় সেগুলি। সবুজের আবরণ বিহীন সেই ধ্বংসস্তূপকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট একখানি উলঙ্গ পাহাড়।

রাজবাড়ীর ইটগুলো ৬" র মতো লম্বা, প্রস্থে ৫" এবং ২" পুরু। ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে সংগৃহীত হয়েছে মৃৎপাত্র, মাটির প্রদীপ প্রভৃতি। কিন্তু বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ইটগুলির গায়ে খোদিত রয়েছে মানুষ, ফুল, মন্দির প্রভৃতি সুদৃশ্য কারুকার্য। ঢিপিটির সামান্য কয়েকফুট খননের ফলে সন্ধান পাওয়া গেছে

সুন্দরভাবে সাজানো মসৃণ ইট ও প্রাচীরের। প্রাচীরটি নেমে গেছে আরো গভীর মৃত্তিকা-অভ্যন্তরে।

রাজবাড়ীর মূল ভূখন্ডের অদূরেই রয়েছে 'বিচার সভা'। মূল রাজবাড়ী থেকে মাত্র কয়েক গজ দূরে অবস্থিত 'বিচার সভায়' আজ আর কোন বিচার প্রার্থী আসে না বটে কিন্তু এক সময় অসংখ্য মানুষের সমাগমে তাদের আনন্দ বেদনার তাপ-উত্তাপে গর্বিত ছিল ঐ 'বিচার সভা'। 'বিচার সভায়' সিংহাসনে সমাসীন রাজা শুনতেন বাদী-বিবাদীর আবেদন অভিযোগ। দান করতেন বিচার, পুরুষানুক্রমে শুনে আসা এ কাহিনী গ্রামের সাধারণ মানুষ অতি যত্নে আগলে রেখেছে স্মৃতির মণিকোঠায়। যদি উৎসুক হন আপনাকেও তারা আগ্রহের সঙ্গে শোনাবে বহুকাল ধরে চলে আসা সেই হারিয়ে যাওয়া দিনের বর্ণাঢ্য কাহিনী।

এই 'বিচার সভার' কাহিনী হয়তো অনেককেই মনে করিয়ে দেবে কৈশোরে পড়া উজ্জয়িনীর সেই রাখাল বালকের কাহিনী, যে রাখাল বালক এক প্রান্তর মধ্যস্থিত ঢিপির উপর বসে রাজোচিত আচরণে অবলীলাক্রমে আশ্চর্য দক্ষতায় সঠিক বিচার দান করতো। পরে সেই ঢিপির অভ্যন্তর থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল মহান সম্রাট বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ পুতুল সমন্বিত বিচার সিংহাসন। কি জানি উজ্জয়িনীর বিক্রমাদিত্যের সেই বিচার সিংহাসনের মতো তেমন কিছু আবিষ্কৃত হয়ে কলসুরকেও গৌরবাসনে বসানোর অপেক্ষায় দিনগুনছে কিনা।

অনেকে আবার ঢিপিটিকে 'মঠ'ও বলে থাকেন। 'মঠ' শব্দটিতো সন্ন্যাসীদের আশ্রম অথবা মন্দিরের অর্থ নির্দেশ করে। সেদিক থেকে ধ্বংসস্তূপের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা 'মঠ' শব্দটি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করছে বলেই আমার বিশ্বাস।

যার নাম বিশেষভাবে অন্বিত রয়েছে এই ধ্বংসস্তূপের সাথে সেই 'রাম হাজরার' কথা পাওয়া যায় দূর কাল থেকে প্রচলিত কিংবদন্তীতে। সাড়ে ছ'শো বছরের অধিককাল সময়ে দেউলিয়ার রাজা বা শাসনকর্তা ছিলেন চন্দ্রকেতু। বিভিন্ন সময়ে রাজার সহায়কদের মধ্যে রাম হাজরা নামে জনৈক রাজপুরুষের সন্ধান মেলে। ধ্বংসস্তূপটি আজ অন্ধকারের মধ্যে নিমজ্জিত, রাম হাজরার পরবর্তী কাহিনীও ছিল বিষণ্ণ। ধোঁয়াটে অবস্থার মধ্যে এ সম্ভবনার কথাই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে

হাজরা রাজার সময়ের সাথে মিল রয়েছে সমকালীন দেউলিয়ার রাজার।

এখনো সংবাদ হয়ে উঠতে পারেনি এই আবিস্কার। এই ঢিপিটির তিনদিক ঘিরেই চলছে চাষ-আবাদ। পাশের বটগাছটিও অনেককাল আগের। যথেষ্ট উঁচু ঢিপিটি যদিও আজ সেটি অবলুপ্তির শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে। সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়ার আগেই আশু প্রয়োজন যথোচিত খনন কার্যের। খনন কার্য শুরু হলেই আবিষ্কৃত হবে রাজার প্রাসাদ কিংবা মঠ অথবা বাংলার অতীত সময়কালের সৌন্দর্য্যময় এক অজানিত প্রত্ন-সম্পদ।



ঃ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ ঋণ ঃ

যশোহর খুলনার ইতিহাস (১ম ও ২য়)	সতীশ চন্দ্র মিত্র
উত্তর চব্বিশ পরগণার ইতিবৃত্ত	কমল চৌধুরী
কলসুরের ব্রাত্য সমাজ ও পুঁথি	ডঃ গৌরীশঙ্কর দে
ভারতীয় শিল্পধারা প্রাচ্য ভারত ও বৃহত্তর ভারত	দেবপ্রসাদ ঘোষ
বাংলা পীর সাহিত্যের কথা	ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস
লৌকিক দেবতা	গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু
গঙ্গা যুগে যুগে (প্রবন্ধ)	ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
বাংলা স্থান নাম	সুকুমার সেন
কলিকাতা সেকালের ও একালের	হরিসাধন মুখোপাধ্যায় সম্পাদনা—ডঃ নিশীথ রঞ্জন রায়
পশ্চিমবঙ্গের নবীন জেলা প্রাচীন ঐতিহ্য (প্রবন্ধ)	কৃষ্ণ দেবনাথ
বিলুপ্ত রাজধানী	উৎপল চক্রবর্তী
বাংলাদেশের প্রত্ন-সম্পদ	আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া
পাণিহাটির বৈষ্ণব তীর্থ—রাঘব ভবন	মাণিক্য বন্দ্যোপাধ্যায়
বাংলার উৎসব	তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
হীরক জয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ (১৩২৫—১৩৮৫)	রাস্ট্রীয় জেলা গ্রন্থাগার, টাকী

"ইতিহাসে দেগঙ্গা" রচয়িতার অন্যান্য গ্রন্থ

গড় চন্দ্রকেতুর কথা—সম্পাদনা	দশ টাকা
অতীত আলোকে চন্দ্রকেতুগড়	তিন টাকা
চন্দ্রকেতুগড়	পঁচিশ টাকা

(প্রতিটি পুস্তকই আলোকচিত্র সমৃদ্ধ)